ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের টেক্সটাইল ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর,২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগারি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-১২০৭।

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১ (প্রথম পত্র)
বিষয় কোড-৭৫১৩, দশম শ্রেণি

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১ম	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ	১-১৫
২	২য়	চিংড়ি পরিচিতি, জীববিদ্যা ও চাষ ব্যবস্থাপনা	১৬-২৮
৩	৩য়	চাষযোগ্য মাছ সম্পর্কে ধারণা	২৯-৪৪
৪	৪র্থ	মাছচাষে প্রতিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব	৪৫-৫৯
৫	৫ম	মাছচাষে পুকুরের ধরন ও পুকুর খনন	৬০-৭০
৬	৬ষ্ঠ	রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা	৭১-৭৮
৭	৭ম	মিশ্রচাষে পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা	৭৯-৮৫
৮	৮ম	মিশ্রচাষে পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	৮৬-৯০
৯	৯ম	চাষযোগ্য মাছের খাদ্য ও পুষ্টি	৯১-১০২
১০	১০ম	মৌসুমি পুকুরে মাছচাষ	১০৩-১১৪
১১	১১শ	সমন্বিত মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা	১১৫-১২৮
১২	১২শ	চাষযোগ্য মাছের সাধারণ রোগ, রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার বা চিকিৎসা	১২৯-১৪৮
১৩	১৩শ	ব্যবহারিক	১৪৯-১৭৬

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১ (দ্বিতীয় পত্র)
বিষয় কোড-৭৫২৩, দশম শ্রেণি

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১ম	মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনা	১৭৮-১৮৫
২	২য়	থাই পাঙ্গাশ ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি	১৮৬-১৯৩
৩	৩য়	থাই কৈ মাছ চাষ পদ্ধতি	১৯৪-২০০
৪	৪র্থ	ভিয়েতনাম কৈ মাছের চাষ প্রযুক্তি	২০১-২০৮
৫	৫ম	শিং-কার্প মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি	২০৯-২১৪
৬	৬ষ্ঠ	মাগুর মাছের একক চাষ ব্যবস্থাপনা	২১৫-২১৮
৭	৭ম	কাঁকড়া (মাড ক্রাব) পালন পদ্ধতি	২১৯-২২৪
৮	৮ম	খাঁচায় মাছচাষ	২২৫-২৩০
০৯	৯ম	পেনে মাছচাষ	২৩১-২৩৫
১০	১০ম	প্লাবন ভূমিতে মাছচাষ	২৩৬-২৪১
১১	১১শ	অ্যাকোয়েরিয়ামে বাহারি মাছ পালন ও পরিচর্যা	২৪২-২৪৫
১২	১২শ	মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	২৪৬-২৬৪
১৩	১৩শ	মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	২৬৫-২৬৯
১৪	১৪শ	মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি তৈরি ও সংরক্ষণ	২৭০-২৮০
১৫	১৫শ	মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা	২৮১-২৮৪
১৬	১৬শ	জীব বৈচিত্র্য, মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন	২৮৫-২৯১
১৭	১৭শ	মাছ চাষকালে উদ্ভূত সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান	২৯২-২৯৬
১৮	১৮শ	ব্যবহারিক	২৯৭-৩১২
১৯	১৯শ	তথ্যপঞ্জি	৩১৩-৩১৪

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং- ১

১ম পত্র

নবম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

মাছ

মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা অভ্যন্তরীণ ফুলকার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় এবং পাখনার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। মাছ কর্ডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপ-পর্বের অসটিক্থিস শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

মাছের বৈশিষ্ট্য

মাছের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হলো-

- মাছ শীতল রক্তবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে মাছ তার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে;
- মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়;
- মাছের জীবন ধারণের মাধ্যম হলো পানি;
- পাখনার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে মাছ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

মাৎস্য ও মাৎস্য সম্পদ

মানুষের খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য পানিতে বসবাসকারী সকল জীবকুল এবং উদ্ভিদকুল যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে ফিশারিজের ভাষায় তাকে মাৎস্য বলে। যেমন- মাছ, সাপ, ব্যাঙ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কুঁচে, শৈবাল ইত্যাদি। আর এসকল প্রাণী ও উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালন বা বংশবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, সহনশীল আহরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনকে মাৎস্যচাষ বলে।

পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ, যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে তা মাৎস্য সম্পদ হিসেবে পরিচিত। যেমন- মাছ, সাপ, ব্যাঙ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শৈবাল ইত্যাদি। মাৎস্য সম্পদভুক্ত এসব প্রাণী ও উদ্ভিদ মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাছচাষ

কোন একক আয়তনের জলাশয়ে স্বাভাবিকভাবে বা প্রাকৃতিক উপায়ে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদিত হয় বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মাছ উৎপাদন করার কৌশলকে মাছচাষ বলে। ধরা যাক, ১ বিঘা আয়তনের জলাশয়ে স্বাভাবিকভাবে বছরে ২০০ কেজি মাছ উৎপাদন হয়। কিন্তু ঐ একই আয়তনের জলাশয়ে উপযোগী ও উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করে যদি ৮০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা হয় তবে তাকে মাছচাষ বলে। এসব কৌশলের মধ্যে জলজ আগাছা ও রাক্ষুসে মাছ অপসারণ, উন্নত মানের পোনা মজুদ, সঠিকভাবে সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, রোগ-বালাই দমন, ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাছ চাষের ইতিহাস

মাছচাষের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কখন, কোথায়, কীভাবে ও কাদের মাধ্যমে প্রথম মাছচাষ শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তবুও যতটুকু জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯৮ অব্দে চীনে প্রথম মাছচাষ শুরু হয়েছিল। বিখ্যাত চৌ রাজবংশের (Chou Dynasty) প্রতিষ্ঠাতা Wen Fang চীন

দেশের হোনান প্রদেশে প্রথম মাছচাষ শুরু করেন। বলা বাহুল্য চীন দেশের মানুষ Wen Fang ও তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকেই মাছচাষের ওপর বিভিন্ন কলাকৌশল ও শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে মাছচাষ পদ্ধতির বিস্তার লাভ করে।

পরবর্তীতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে ফান লাই (Fan Lai) নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ মাছ চাষের ওপর Classic Book of Fish Culture নামে একটি বই রচনা করেন। যতদূর জানা যায়, এ বইটিই মাছ চাষের ওপর সর্বপ্রথম দলিল। এ বইতে উল্লেখিত তথ্যানুসারে প্রাচীন চীনারা প্রাকৃতিক জলাশয়ে জাল, বাঁশের চাটাই বা বানা দিয়ে মাছের ডিম ও পোনা সংগ্রহ করত। সে সময় থেকেই মূলত চীন দেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে মাছচাষ এবং মাছের ডিম সংগ্রহ, ডিম থেকে পোনা উৎপাদন ও বিভিন্ন স্থানে তা বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে। আফ্রিকাতে তেলাপিয়া মাছের চাষাবাদ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকেই। চীন ও আফ্রিকার অনেক পরে ভারতবর্ষে মাছচাষ শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে। তখন মন্দিরের বিভিন্ন কাজে পানি ব্যবহৃত হতো। মন্দিরের কাজে ব্যবহৃত পুকুরের পানিতে মাছ ছাড়া হতো। চালুকল্য বংশের রাজা সোমেশ্বর ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিশ্বকোষে মৎস্য বিনোদ অধ্যায়ে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন।

এ উপমহাদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ শুরু হয় উনিশ শতকের শুরুতে। বাংলাদেশে মাছচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয় ষাটের দশকে। বিগত ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম সফলভাবে মাছের প্রণোদিত প্রজনন সম্পন্ন করা হয়। তবে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছচাষ সম্প্রসারণের ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক কালের।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য খাতের ভূমিকা

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মৎস্যসম্পদ থেকে এ দেশের প্রায় ১২ লক্ষ লোকের সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থান হয়। এর পাশাপাশি প্রায় ১.২ কোটি লোক মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে খণ্ডকালীন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ লোক জীবিকা অর্জনের জন্য মৎস্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্যসম্পদ সংশিস্নষ্ট কর্মক্ষেত্রসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

১. নদী ও খাড়ি অঞ্চলে মৎস্য আহরণ : দেশের অসংখ্য নদ-নদী ও খাড়ি অঞ্চলে প্রায় ৪ লক্ষ মৎস্যজীবী ইলিশ ও অন্যান্য মাছ আহরণে নিয়োজিত বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১০-১৫ ভাগ আসে ইলিশ থেকে। ইলিশ মাছের বর্তমান প্রাপ্যতার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬৪ শতাংশ ইলিশ সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা হতে এবং বাকি ৩৬ শতাংশ ইলিশ বিভিন্ন নদ-নদী থেকে আহরিত হয়।

২. সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় মৎস্য আহরণ : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। এ বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আধা-লবণাক্ত পানির নদী, খাড়ি ও খাল বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব এলাকায় সারা বছর ধরে প্রায় লক্ষাধিক জেলে মৎস্য ও মাৎস্য সম্পদ আহরণের সাথে জড়িত।

৩. হাওর ও প্লাবনভূমি অঞ্চলে মৎস্য আহরণ : দেশের হাওর ও প্লাবনভূমি এলাকায় প্রায় ৫০-৬০ হাজার মৎস্যজীবী বছরের প্রায় অর্ধেক সময় বিভিন্নভাবে মাছ আহরণের সাথে জড়িত থাকে। উল্লেখ্য যে, দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই হচ্ছে হাওর ও প্লাবনভূমি।

৪. উপকূলীয় চিংড়ি চাষ : দেশের উপকূলীয় এলাকায় ছোট বড় প্রায় ২০-২৫ হাজার চিংড়ি ঘের রয়েছে যা চিংড়ি চাষ এলাকা নামে পরিচিত। এসব ঘেরে আনুমানিক ১.৫ লক্ষ কর্মী সারা বছরের জন্য কর্মে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

৫. মৎস্যচাষ ও মৎস্য প্রজনন : দেশে প্রায় ১৯ লক্ষ পুকুর-দিঘি রয়েছে। এসব পুকুর-দিঘিতে লক্ষ-লক্ষ লোক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছচাষ করছে। এতে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে এবং বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দেশে মাছচাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবার জীবিকা নির্বাহ করছে। এ ছাড়াও দেশে প্রায় দুই হাজারের বেশি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে এবং এসব প্রজনন কেন্দ্রে সারা বছর প্রায় লক্ষাধিক কর্মী নিয়োজিত থাকে।

৬. সমুদ্র উপকূলীয় মৎস্য আহরণ : আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রায় সবটাই উপকূলীয় অগভীর সাগরে ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে হয়ে থাকে। এ কাজে আনুমানিক ৩ লক্ষ জেলে সারা বছর মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে।

৭. গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ : অতি সম্প্রতি গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের প্রক্রিয়া চলছে। এ লক্ষে নতুন নতুন ফিশিং ভ্যাসেল ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। অতি সম্প্রতি মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমরা গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মালিকানা অর্জন করেছি। বিশাল এ সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণ, মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মে সরকারি ও বেসরকারি আরও ১০ থেকে ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। ভবিষ্যতে মৎস্যচাষ বাড়ার সাথে সাথে এ সেক্টরে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণে মৎস্য খাতের ভূমিকা

জাতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের খাদ্য তালিকায় ভাতের পরেই মাছের স্থান। সারা বিশ্বে মাছ মানুষের প্রধান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটায়। আমিষ ছাড়াও মাছে অন্যান্য খাদ্য উপাদানও রয়েছে। শিশুদের এবং সন্তানসম্ভবা মহিলাদের জন্য মাছ একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। নিচে মাছের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ক. আমিষের উৎস হিসেবে মাছ

আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ বা মৎস্য সম্পদ। প্রয়োজনীয় আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ এ সম্পদ থেকে পেয়ে থাকি। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সুস্থ-সবলভাবে বেঁচে থাকা, দেহের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধনের জন্য প্রতিদিন নুন্যতম ৫৬ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা আমাদের খাদ্য তালিকায় উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত উৎস মিলে গড়ে মাত্র ৫২ গ্রাম আমিষ পেয়ে থাকি (বিবিএস, ২০১৪-১৫)। এছাড়াও মাছের দেহে রয়েছে মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ১০টি অ্যামাইনো এসিড। উদ্ভিজ্জ আমিষে শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় সব অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান থাকে না বা থাকলেও কিছু কিছু উপাদান খুবই কম পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। মাছের প্রাণিজ আমিষ উদ্ভিজ্জ আমিষের চেয়ে সহজে হজমযোগ্য। মাছের আমিষ ৮৫-৯৫ শতাংশ হজমযোগ্য। ফলে দিন দিন সচেতন মানুষ গরু, খাসি বা মুরগির মাংসের চেয়ে খাদ্য তালিকায় মাছকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তাই সুস্থ-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে

দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমিষের উৎস হিসেবে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণে মাছ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. লিপিডের উৎস হিসেবে মাছ

লিপিডের উৎস হিসেবে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মাছ ছাড়াও গরু বা খাসির মাংস থেকে আমরা লিপিড বা চর্বি পেয়ে থাকি। গরু বা খাসির মাংস উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত হওয়ায় হৃদরোগ বা স্ট্রোক-এর ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে শরীরে কোলেস্টেরল তো জমেই না, বরং শরীরে জমাকৃত খারাপ কোলেস্টেরল হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে ইলিশ, টুনা, ম্যাকরেল প্রভৃতি মাছের তেল রক্তের কোলেস্টেরল হ্রাসে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও মাছের দেহে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড নামক এক ধরনের অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। এ ফ্যাটি এসিড রক্তের অনুচক্রিকাকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়, ফলে রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড হৃদরোগ, স্ট্রোক, মানসিক হতাশা, আর্থ্রাইটিস রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড রক্তে কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা হ্রাস করার মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা হ্রাস করে।

গ. ভিটামিনের উৎস হিসেবে মাছ

মলা, ঢেলা, দারকিনা, কাচকি, পুঁটি প্রভৃতি ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। বাংলাদেশে দৈনিক ১০০ জন শিশু কেবল ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত কারণে অন্ধ হয়ে যায়। খাদ্য তালিকায় ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ মাছ গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করে আমরা এ সমস্যা থেকে সহজেই পরিত্রাণ পেতে পারি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৪ থেকে ৬ বছর বয়সের একটি শিশুকে যদি দৈনিক মাত্র ২৩ গ্রাম মলা মাছ খাওয়ানো হয় তাহলে তার শরীরের ভিটামিন 'এ' এর প্রয়োজন মিটে যায় এবং সে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে রেহাই পায়। মাছের যকৃৎ ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'ডি'-তে সমৃদ্ধ; যা হাড়, দাঁত, চর্ম ও চোখের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। মাছে প্রচুর ভিটামিন 'বি', বিশেষ করে ভিটামিন 'বি৬' ও নিয়াসিন রয়েছে। এগুলো চর্ম ও স্নায়বিক রোগের জন্য বিশেষ উপকারী। সুতরাং পরিবারের ভিটামিনের অভাব পূরণে মাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. খনিজ লবণের উৎস হিসেবে মাছ

মাছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ যেমন- লৌহ, তামা, দস্তা, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের শতকরা ৭০ ভাগ মা ও শিশু রক্তশূন্যতাজনিত রোগে ভোগে। এর অন্যতম কারণ খাবারে প্রয়োজনীয় লৌহের অভাব। জিওল মাছ হিসেবে পরিচিত শিং, মাগুর, কৈ প্রভৃতি মাছ সন্তানসম্ভবা বা প্রসোবোত্তর মায়ের রক্ত স্বল্পতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব মাছ দেহে দ্রুত রক্তকণিকা উৎপাদনে সহায়তা করে। তাই পুষ্টির জন্য সন্তানসম্ভবা মা এবং বাচ্চাকে দুধদানকারী মায়েদের জন্য ছোট মাছ আদর্শ খাদ্য। আবহমান কাল থেকে শিং, মাগুরের ঝোল রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়া মাছ থেকে প্রাপ্ত লৌহ উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে প্রাপ্ত লৌহ অপেক্ষা উন্নত। ক্যালসিয়ামের অভাবে বাচ্চাদের শরীরের হাড় সুগঠিত হয় না। মাছের কাঁটা ক্যালসিয়াম ও ফসফরসের একটি ভালো উৎস। ছোট মাছ কাঁটাসহ খাওয়া যায় বিধায় এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায়। পরিবারের সদস্যদের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের চাহিদা পূরণে ছোট মাছ তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক কোনো না কোনো ধরনের আয়োডিনের অভাবজনিত রোগে ভোগে। খাবারে আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগ হয়। উত্তরবঙ্গে এ হার অনেক বেশি। কেবল তাই নয়, আয়োডিনের অভাবে মূক-বধিরসহ শারীরিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হতে পারে। সামুদ্রিক মাছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে

বিধায় সামুদ্রিক মাছ আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ থেকে পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে পারে। এ ছাড়াও সামুদ্রিক মাছের ফ্লোরাইড দাঁতের ক্ষয়রোধ করতে বিশেষভাবে কার্যকর। তাই নিয়মিতভাবে ও পরিমিত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ গ্রহণ করলে পুষ্টি সমস্যা দূর হতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জাতীয় উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয়েছে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য তার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থানে তৈরি পোশাক অর্থাৎ মোট রপ্তানির প্রায় ৬১.৩৯ শতাংশ। পাট ও পাটজাত দ্রব্য মোট রপ্তানির প্রায় ১৩.৪৫ শতাংশ অর্জন করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির প্রায় ৯.১২ শতাংশ অর্জন করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

কিন্তু সত্যিকার অর্থে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরেই মৎস্য পণ্যের স্থান হওয়া উচিত। কারণ তৈরি পোশাক থেকে যে আয় হয় তার সিংহভাগই তৈরি পোশাকের কাঁচামাল আমদানিতে পূর্বেই ব্যয় হয়ে যায়। বিগত ২০১২ ও ২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কি পরিমাণ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে এবং এ খাত থেকে কত টাকা আয় হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১ : বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণ : টন
মূল্য : কোটি টাকা

অর্থ বছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবণাক্ত মাছ		কচ্ছপ, কাঁকড়া এবং ইল		হাঙ্গরের পাখনা ও পটকা		অন্যান্য		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
২০১২-১৩	৫০৩৩৩	৩৩৭৬.২	-	-	১১৪৩৫	৩১৬.৩৬	১২৭৮	৩৬.০৩	-	-	৭৪২৮	১৬৯.৪৯	১	০.০৯	২৫৯৯	১৩.৯৩	৮৪৯০৫	৪৩১২.৬১
২০১৩-১৪	৪৭৬৩৫	৪১১৮.৮	-	-	১১৬৭৭	৩৩৭.১১	২৬৩৪	২৯.৬৭	২৬১	২১.৬৫	৭৭০৭	১৬৪.৭৫	-	-	২৩৯৩	১৫.৮৯	৭৭৩২৮	৪৭৭৬.৯২

বিভিন্ন প্রকার মাছের পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি সচেতনার ক্ষেত্রে এখনও আমাদের মাছের পুষ্টিগুণ বিষয়ে অনেক কিছু জানার আছে। জাতিগতভাবে বংশ পরম্পরায় আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সকল প্রজাতির মাছ খেতেন, শুধুমাত্র সেই প্রজাতির মাছই আমরা খেয়ে অভ্যস্ত বা খেতে পছন্দ করি। এ কারণে বাজারে ঐসকল প্রজাতির মাছের চাহিদা ও দাম দুটোই বাড়ছে। অথচ দ্রুত বর্ধনশীল, বাজারে সহজলভ্য, পুষ্টিগুণে ভরপুর সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, বিগহেড, পাঙ্গাশ, তেলাপিয়া প্রভৃতির বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু পুষ্টিগত দিক বিবেচনা করলে দামী মাছ বলে খ্যাত ঐসব মাছের চেয়ে উল্লেখিত প্রজাতির মাছসমূহের পুষ্টিগুণ কোন অংশেই কম নয়, বরং সমতুল্য যা নিচের সারণি-২ এ দেখানো হলো-

সারণি-২ : কতিপয় দেশী ও বিদেশী প্রজাতির মাছের পুষ্টি উপাদান (আমিষ)

দেশী মাছ	আমিষ (প্রতি ১০০ গ্রামে)	বিদেশী মাছ	আমিষ (প্রতি ১০০ গ্রামে)
শিং	২৩.০০	সিলভার কার্প	২০.০০
মাগুর	২৩.১০	বিগহেড কার্প	২০.০০
কৈ	১৪.৮০	গ্রাসকার্প	১৯.৫০
পাবদা	১৯.২০	পাংগাস	১৪.১০

এ ছাড়াও দামী মাছ বলে খ্যাত রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, ইত্যাদি মাছের চেয়ে বাজারে সচরাচর পাওয়া যায়, যেমন- পুঁটি, খলিসা, মলা, ঢেলা ইত্যাদি ছোট মাছের পুষ্টিগুণ কোনো অংশেই বড় মাছের চেয়ে কম নয়। বরং ছোট মাছ কাঁটাসহ খাওয়া যায় বলে পুষ্টিগত দিক থেকে বড় মাছের চেয়ে ভালো। নিচে সারণি-৩ এ বিভিন্ন প্রকার মাছের পুষ্টিগুণের একটি তালিকা দেয়া হলো–

সারণি-৩ : বিভিন্ন প্রকার মাছের পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

মাছের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	ফসফরাস (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন বি$_1$ (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন বি$_2$ (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিঃ গ্রাম)
রুই	৭৬.৭	১৬.৬	১.৪	৪.৪	০.৯	৬৫০	২২৩	১.০	০.১৫	০.০৭	২২
কাতলা	৭৬.৭	১৬.৫	২.৪	২.৯	১.৫	৫৩০	২১৪	০.৯	০.১৫	০.০৪	২০
মৃগেল	৭৫.০	১৮.৫	২.০	৩.০	১.৫	৩৫০	৩৮২	১.১	০.১৪	০.০৭	১৭
কালিবাউশ	৮১.০	১৪.৭	১.০	২.০	১.৩	৩২০	৩৮২	০.৮	০.১৩	০.০৯	১১
গ্রাসকার্প	৭৬.১	১৯.৫	১.১	২.১	১.২	৩৩৫	৩৮২	১.১	০.১৫	০.০৫	১৯
ব্ল্যাককার্প	৭৬.৭	১৮.৫	১.১	২.৫	১.২	৩৩৫	৩৮২	১.১	০.১৬	০.০৮	১৫
সিলভার কার্প	৭৪.৫	২০.০	১.১	৩.২	১.২	৩৫০	৩৮২	১.১	০.১৯	০.০৭	১২
বিগহেড	৭৪.৪	২০.০	১.২	৩.২	১.২	৪৭০	২৪২	১.২	০.১৪	০.০৪	১৫
মিরর কার্প	৭৭.২	১৬.৬	২.৬	২.৭	০.৯	৬৯০	২৪০	১.১	০.১৭	০.০৩	১৫
কমন কার্প	৭৭.২	১৬.৬	২.৬	২.৭	০.৯	৫১৪	৩৮২	১.১	০.১৮	০.০১	১৭
থাই সরপুঁটি	৭৫.৯	১৯.০	২.০	১.৯	১.২	৩৫০	৩৯০	১.০	০.১৮	০.০৫	১৬
পাঙ্গাশ	৭২.৩	১৪.১	১০.৮	১.৮	১.০	১৮০	২৫০	০.৫	০.১৫	০.০৯	১৭
তেলাপিয়া	৭৯.৮	১৫.৫	১.৬	১.৯	১.২	৩৩৫	৩৮২	১.১	০.১৪	০.০৭	১১
নাইলোটিকা	৭৯.৮	১৫.৫	১.৬	১.৯	১.২	৩৩৫	৩৮২	১.২	০.১৫	০.০৮	১৪
আফ্রিকান মাগুর	৭১.২	২৩.১	১.০	৩.৫	১.২	১৭২	৩০০	১.০	০.২০	০.০৬	২০
হাইব্রিড মাগুর	৭১.৩	২৩.১	১.০	৩.৫	১.১	১৭৩	৩০২	০.৭	০.১৫	০.০৯	১৯
দেশী মাগুর	৭০.২	২৩.১	২.০	৩.৪	১.৩	১৭২	৩০০	০.৭	০.১২	০.০৭	১৭
শিং	৭২.০	২৩.০	০.৬	২.৯	১.৫	৬৭০	৬৫০	৩.৯	০.১৯	০.০২	২০

মাছের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	ফসফরাস (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন বি$_1$ (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন বি$_2$ (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিঃ গ্রাম)
কই	৭০.০	১৪.৮	৮.৮	৪.৪	২.০	৪১০	৪০০	১.৪	০.২০	০.০৪	২০
শোল	৭৮.০	১৬.২	২.৩	২.২	১.৩	১৪০	২৯৮	০.৫	০.১৩	০.০৯	৩২
গজার	৭৩.৪	২১.০	২.২	২.২	১.২	৩৬০	১৯৮	০.৫	০.১৭	০.০৭	৯
বোয়াল	৭৩.০	১৫.৪	২.৭	৭.৬	১.৩	১৬০	৪৯০	০.৬	০.১৯	০.০২	১১
আইড়	৭৮.১	১৫.৯	১.৩	৩.৫	১.২	৩৮০	৩৬১	০.৭	০.২০	০.০৫	৯
চিতল	৭৫.৮	১৮.৬	২.৩	২.১	১.২	১৮০	২৮৮	৩.০	০.২১	০.০৯	১১
ফলি	৭৩.০	১৯.৮	১.০	৩.৭	১.০	৫৯০	২৮৮	১.৭	০.১২	০.০৮	১০
টাকি	৭৩.৭	২১.০	২.২	২.১	২.৫	৫১০	৩৫০	০.৯	০.১২	০.০৬	৬
পাবদা	৭৩.০	১৯.২	২.১	৪.৬	১.০	৩১০	৩১২	১.৩	০.২৫	০.০৯	৫
টেংরা	৭৩.০	১৯.২	৫.৮	৪.০	১.০	২৭৮	১৮২	০.২	০.২১	০.০৫	৫
চাপিলা	৭৩.৯	১৯.০	২.০	৪.১	১.০	৫১০	৩৫০	০.৯	০.২০	০.০৭	৭
বেলে	৭৯.৯	১৪.৫	০.৫	৪.০	১.১	৩৭০	৩৩০	১.০	০.২০	০.০৩	৯
বাইম	৭৪.৮	১৬.১	০.৯	৬.৯	১.৩	৩৩০	৩১৫	০.৮	০.১২	০.০৯	৫
বাটা	৭৭.৬	১৪.৩	২.৪৮	৩.৬	২.০	৭৯০	২০০	১.০৯	০.১৪	০.০৫	১৭
কাজলি	৭৬.০	১৮.২	৪.৪	৩.১	১.৪	১৭৫	৩৫০	০.৯	০.১৫	০.০৪	১৯
গুলসা	৭১.৬	১৯.২	৫.৮	২.৩	১.১	২৭৮	১৮২	০.২	০.১৭	০.০৩	২০
মেনি	৭৪.৬	১৪.০	৫.৩	৪.২	১.১	৩৯০	২৯৮	০.৮	০.১৩	০.০৭	১৬
খলিসা	৭৫.০	১৬.১	৩.৯	৩.১	১.৯	৪৬০	৪০০	০.৯	০.১২	০.০৮	১৫
চেলা	৭৭.৫	১৪.৬	৪.৩	১.৫	২.১	৫৯০	৩৬১	২.০	০.১১	০.০৯	১৮
পুঁটি	৭৫.০	১৯.০	২.০	২.১	১.৯	১৫০	৩৯০	০.৩	০.১৩	০.০৭	১৪
চান্দা	৭৫.৫	১৮.৮	০.৩	৩.৭	১.৭	১৮০	২৭৫	১.০	০.১১	০.০৯	১৮
বাচা	৬৮.৮	১৮.১	৫.৬	৬.১	১.৪	৫২০	৩৬০	০.৭	০.১২	০.০৮	১৩
মহাশোল	৭০.৩	২৫.২	২.৩	১.০	১.২	২৩০	২৯০	৩.৮	০.১২	০.০৮	১২
ইলিশ	৫৩.৭	২১.৮	১৯.৪	২.১	২.২	১৮০	৩৫০	২.১	০.১৪	০.০৬	২০
গড় পুষ্টি উপাদান	৭৪.৩২	১৮.২৫	২.৯৭	৩.২	১.৩৬	৩৬৫.২৬	৩৩০.৩	১.১৩	০.১৬	০.০৬	১৪.৯৫

উৎস : মাৎস্য ও মাৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা- বিষ্ণুদাস, ১৯৯৭

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস

আমাদের দেশ বিপুল জলসম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দিঘি, ডোবা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও নদ-নদী। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে মৎস্য উৎপাদের ক্ষেত্রে বিশ্বে ৪র্থ এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকৃতি অনুসারে দেশে বিদ্যমান জল সম্পদকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ, এবং
২. সামুদ্রিক জলসম্পদ।

১. অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ

আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। চীন এবং ভারতের পরেই আমাদের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের অবস্থান। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৫.৭৬ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জল সম্পদকে আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, এবং খ. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়।

ক. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় আবহমান কাল থেকেই বিভিন্ন প্রকার মৎস্য প্রজাতিতে সমৃদ্ধ। আমাদের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে রয়েছে ২৬০ প্রজাতির দেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি। অতীতে এসব উৎস হতে দেশের মোট আহরিত মাছের অধিকাংশ পাওয়া যেত। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়কে আবার নদী ও খাড়ি অঞ্চল, হাওর ও বিল, প্লাবনভূমি এবং কাপ্তাই হ্রদ ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

নদী ও খাড়ি অঞ্চল : অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে একটি বড় অংশ হলো নদ-নদী, মোহনা ও খাড়ি অঞ্চল। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনাসহ অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। সংখ্যার দিক থেকে দেশের মোট ২৩০টি নদ-নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার। এসব নদ-নদীর মোহনা, খাড়ি অঞ্চল ও সুন্দরবনসহ এলাকার মোট আয়তন প্রায় ২৬.৩১ লক্ষ হেক্টর।

হাওর ও বিল : হাওর হচ্ছে নিচু জলাভূমি, যেখানে বর্ষাকালে ৬ থেকে ৭ মাস পানি থাকে। প্রতিটি হাওড়েই বেশ কিছু বিল এবং খাল থাকে। বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকায় সর্বাধিক হাওর এবং বিলের অবস্থান। এসব হাওর এবং বিল মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। শুষ্ক মৌসুমে বিল ও হাওর এলাকায় প্লাবনভূমির মাছ এসে জমা হয়। ফলে এখন এসব জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়।

প্লাবনভূমি : বাংলাদেশের কোনো কোনো বিস্তৃত এলাকা বছরে ৪ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত কমবেশি প্লাবিত থাকে। এ সকল প্লাবিত এলাকা প্লাবনভূমি নামে পরিচিত। দেশে প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। এসব প্লাবনভূমি মৎস্য প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লাবনভূমিতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণ রুই জাতীয় মাছের পোনার পাশাপাশি কই, শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ প্রাকৃতিক উপায়েই জন্মায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে অধিক ফসলের আশায় ধানক্ষেতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় ও অন্যান্য মাছের ডিম ও ডিম পোনার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। দেশে

বর্তমানে প্লাবনভূমিতে মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে মাত্র ২৮৯ কেজি। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ এবং নাটোর জেলার বেশ কিছু এলাকায় বর্ষাপ্লাবিত নিচু ধানী জমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্লাবনভূমিতে মাছচাষের ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

কাপ্তাই হ্রদ : কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়, যা মাছচাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে সৃষ্ট কাপ্তাই হ্রদ, যার আয়তন প্রায় ৬৮,৩০০ হেক্টর। কর্ণফুলী নদীর উপর ১৯৬১ সালে কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দেওয়ার ফলে এ হ্রদের সৃষ্টি হয়। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা মিলে কাপ্তাই হ্রদের অবস্থান। পাহাড়ী উপত্যকা নিমজ্জিত হয়ে এ হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে এ হ্রদের তলদেশ বেশ অসমান। এ হ্রদের সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৫ মিটার এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ৯ মিটার। জৈবিক উৎপাদনে সমৃদ্ধ বিধায় এ হ্রদ মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তবে হ্রদের তলদেশ বেশ অসমান এবং তলদেশে বড় বড় কাঠের গুড়ি থাকায় হ্রদের মাছ আহরণ বেশ কঠিন। বেড়জাল, ফাঁসজাল এবং বড়শি দিয়ে কাপ্তাই হ্রদ থেকে মাছ আহরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এ হ্রদ হতে বাৎসরিক মাছ আহরণের পরিমাণ প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার মেট্রিক টন।

খ. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়

মৎস্য চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে এসব বদ্ধ জলাশয় ব্যবহৃত হয়। হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের দিক থেকে এসব জলাশয় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল। তবে এখন পর্যন্ত সব বদ্ধ জলাশয় আধুনিক উপায়ে মাছচাষের আওতায় আসেনি। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়কে নিম্নবর্ণিতভাবে ভাগ করা যায়। যথা- পুকুর-দিঘি, বাঁওড় ও উপকূলীয় চিংড়ি খামার, ইত্যাদি।

পুকুর-দিঘি : দেশে প্রায় ১৯ লক্ষ পুকুর-দিঘি রয়েছে, যার আয়তন ৩.০ লক্ষ হেক্টরের কিছু বেশি। দেশের পুকুর-দিঘির অধিকাংশই গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য খনন করা হয়। এছাড়া গ্রামীণ লোকজনের বসবাসের প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি ও রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি কাটার ফলে অনেক পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এসব পুকুর বা জলাশয়ে পরিকল্পিত উপায়ে মাছচাষ হচ্ছে। আবার পুকুরে মাছচাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় সম্প্রতি নতুন নতুন অনেক পুকুর খনন করা হচ্ছে। ফলে দেশে বর্তমানে পুকুর ও দিঘির সংখ্যা ও আয়তন ১৯৮৪ সালে জরিপকৃত হিসাবের চেয়ে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে পুকুর-দিঘি হতে মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ২৮৩৯ কেজি।

বাঁওড় : প্রবহমান নদী অনেক সময় নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে মূল গতিপথ পরিবর্তন করে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। এসব রূপান্তরিত বদ্ধ জলাশয়কে বাঁওড় বলে। এদের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত বলে, এদেরকে অশ্ব-খুরাকৃতি জলাশয় বা ইংরেজিতে অক্সবো লেক (Ox-bow lake) বলে। বাঁওড় সৃষ্টির একটি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ব-দ্বীপ অববাহিকার নদীসমূহ সময়ের কাল প্রবাহে পলিতে ভরাট হয়ে আসে এবং পরবর্তীতে কোন প্লাবনে ক্ষীণ ধারার নদীগুলো তার মূল গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বা প্লাবনে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলেও পূর্ববর্তী গতি ধারার গভীরতম অংশের বাঁকগুলো বদ্ধ জলাশয় হিসেবে থেকে যায়। পরবর্তীতে এ ধরনের জলাশয়গুলো বর্তমানে বাঁওড় নামে পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর ফরিদপুর, যশোর এবং কুষ্টিয়া জেলায় ছোট বড় নানা আকারের প্রায়

৬০০টি বাঁওড় আছে। এসব বাঁওড়ের আয়তন প্রায় সাড়ে ৫ হাজার হেক্টর। যশোর জেলার বাঁওড়ে হেক্টরপ্রতি মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৯০০ কেজি।

উপকূলীয় চিংড়ি খামার : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় জেলাগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকায় আধা-লবণাক্ত পানি জোয়ার-ভাটায় ওঠানামা করে। দক্ষিণাঞ্চলের এসব জমিতে জোয়ারের পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষ করা হয়। উপকূলীয় এলাকার চিংড়ি খামারে এভাবে লবণাক্ত পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষকে ঘেরে চিংড়ি চাষ বলে। জোয়ারের সময় লবণাক্ত পানি যাতে ধানক্ষেতে প্রবেশ করে ধান চাষের ক্ষতি করতে না পারে এজন্য উপকূলীয় নদীর পাড় ঘেষে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ নির্মাণ করেছে। এসব বাঁধকে বেড়ি বাঁধ (Polder) বলে। বাঁধে স্থাপিত স্লুইচগেটের সাহায্যে চিংড়ি চাষের জমিতে জোয়ারের সময় লোনা পানি ঢুকিয়ে বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় চিংড়ি খামারের আয়তন প্রায় ২.১৮ লক্ষ হেক্টর। দেশের মৎস্য সম্পদ হতে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে চিংড়ি থেকে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪৭৭৭ কোটি টাকা আয় হয় এবং এর মধ্যে শুধু চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ৪১১৯ কোটি টাকা।

২. সামুদ্রিক জলসম্পদ

আমাদের সামুদ্রিক জলসম্পদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর ৪৮০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপকূল বরাবর মহীসোপানের দিকে ২০০ নটিক্যাল মাইল এলাকাকে একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা বলা হয়। যার আয়তন ১.৬৪ বর্গ কিলোমিটার। বিশাল এ সমুদ্র এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ২৫ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ১২ প্রজাতির শিরোপদী বা সেফালোপোডা, ৩০১ প্রজাতির শামুক-ঝিনুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির তিমি, ডলফিন, তারামাছ, স্পঞ্জ, কচ্ছপ, শৈবাল, প্রবাল ইত্যাদি বিদ্যমান। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ দেশের মোট মৎস্য সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। দেশের বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২০ শতাংশ আসে সামুদ্রিক আহরণ থেকে।

মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণসমূহ ও এর সমাধান

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ নানা কারণে হ্রাস পাচ্ছে। আগে নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণ মাছের বিচরণ ছিল। বিভিন্ন মৌসুমে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে মাছের বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত এলাকায় মাছের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমনকি অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু প্রজাতি বিপদাপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণসমূহকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. প্রাকৃতিক কারণ ও
খ. মানব-সৃষ্ট কারণ।

ক. প্রাকৃতিক কারণ

যেসব প্রাকৃতিক কারণে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, নদী ভরাট, পলি জমা, মাছের রোগ-বালাই, অতিরিক্ত জলজ আগাছার জন্ম, বিস্তার ও পচন ইত্যাদি অন্যতম। নিচে এসব কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. নদী ভরাট : প্রাকৃতিক কারণে নদী ভাঙনের ফলে প্রতি বছরই বসতবাড়ি ও আবাদি ভূমি একদিকে যেমন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, অন্যদিক তেমনি নদী ভরাটের ফলে মৎস্যকুলও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা নদী ভরাটের ফলে মৎস্য উৎপাদনের সহায়ক পানির গভীরতা, স্রোত, বিচরণ এলাকা কমে এবং মৎস্যকুলের প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে মাছের বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

২. পলি জমা : বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নদী ভাঙন, ভূমি ক্ষয় হয়ে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পলি পানি বাহিত হয়ে উজান থেকে ভাটিতে নদ-নদী, খাল-বিলে জমা হয়। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে দেশের বাইরে থেকে লক্ষ কোটি টন পলি, বালি, নুড়ি প্রভৃতি স্রোতের টানে ভেসে আসে এবং সাগরে নিপতিত হওয়ার পূর্বেই নদ-নদীর তলদেশে জমা হচ্ছে। এভাবে পলি জমার ফলে নদ-নদীতে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং নদীর মুখ বা খাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র কমে আসছে। এ ছাড়াও নদী বা খালে মাছের পরিভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে আগে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজননের জন্য যে অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল কালক্রমে তা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এতে মাছের বংশবিস্তার ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

৩. মাছের রোগ-বালাই : রোগ-বালাইয়ের কারণেও মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ-বালাইয়ের কারণে মাছের ব্যাপক মড়কের ফলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। যেমন- ক্ষত রোগের কারণে বিগত কয়েক বছর পূর্বে দেশে কোটি কোটি টাকার মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

৪. অতিরিক্ত জলজ আগাছার জন্ম, বিস্তার ও পচন : অনেক সময় অতিরিক্ত জলজ আগাছা মৎস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। আবার এগুলো পচে গিয়ে পানি দূষণের মাধ্যমেও মাছের ক্ষতি করে থাকে।

খ. মানব-সৃষ্ট কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণসমূহ ছাড়া মানব-সৃষ্ট নানাবিধ কারণে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসে মানব-সৃষ্ট কারণ সমূহ হলো-

১. অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ;
২. নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড;
৩. কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার;
৪. জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা;
৫. অতি আহরণ ও
৬. পানি দূষণ ইত্যাদি।

১. অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ : ভূ-প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের নদ-নদী প্রতি বছর বন্যা কবলিত হয়। বন্যার ফলে ক্ষেতের ফসলসহ মানুষের আবাসস্থল প্লাবিত হয়। ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। মানুষের কষ্ট ও ক্ষতি লাঘবের জন্য এদেশে ষাটের দশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করা হয়। জোয়ার-ভাটা হয় এবং বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারে, এমন সব নদ-নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হয় যাতে বন্যা বা জোয়ারের পানি বাঁধের ভিতরের জমির ফসল ও মানুষের ঘর-বাড়ির ক্ষতি করতে না পারে। এভাবে বাঁধ নির্মাণের ফলে আপাতদৃষ্টিতে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে, চাষির বাড়ি-ঘর বন্যা-প্লাবন হতে রক্ষা পেয়েছে এবং মানুষের কষ্ট কমেছে। তবে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জোয়ারের বা বন্যার পানিতে অধিকাংশ মাছ প্রজনন করে। এছাড়া প্রজননের জন্য ছোট বড়

প্রায় সব মাছই এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে। প্রজননের জন্য মাছ সাধারণত সদ্য প্লাবিত অগভীর অঞ্চলে পরিভ্রমণ বা গমনাগমন করে। যেখানে মাছের ডিম বা রেণু ছোট ছোট ঘাস পাতায় লেগে থাকে এবং খাদ্য খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এভাবে অগভীর অঞ্চলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে মাছ পুনরায় নদ-নদীর গভীর অংশে বসবাসের জন্য ফিরে আসে। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরির ফলে প্রজনন উপযোগী অগভীর অংশ বিচ্ছিন্ন থেকে যাওয়ায় মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নদ-নদীতে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

২. নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড : নগরায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে বহু জলাভূমি ভরাট করে বাড়িঘর নির্মিত হচ্ছে। ফলে মাছ উৎপাদনযোগ্য জলাভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইহাও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৩. কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার : ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য সবুজ বিপ্লব বা অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিবিড় করা হয়। কৃষির অংশ হিসেবে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য ষাটের দশক থেকেই জোর সম্প্রসারণ তৎপরতা চালানো হয়। অধিক ফসলের আশায় চাষিরাও যথেচ্ছভাবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কীটনাশক ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে চাষির উৎপাদন ও আয় বেড়েছে। কিন্তু এসব কীটনাশকের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফসলের উপকার করে এবং ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করে এমন সব পোকা-মাকড় ধ্বংস হচ্ছে। কীটনাশকের মিশ্রণ তৈরি করার সময় ব্যবহৃত স্প্রে-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাল-বিল, নদী-নালায় ধোয়ার ফলে অথবা বৃষ্টির পানিতে ক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশকের কিছু অংশ দ্রবীভূত হয়ে খালে-বিলে বা জলাশয়ে পড়ে। ফলে মাছের ডিম, পোনা বা ছোট মাছ সরাসরি মারা যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার অনেক সময় কীটনাশকের অবশেষ পানিতে ধুয়ে খালে বিলে যাওয়ার ফলে অনেক প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসসহ মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলে সহসাই মাছ রোগক্রান্ত হচ্ছে। এসব কারণে দেশে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৪. জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা : উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষের জন্য কৃষককে অতিরিক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। যেখানে সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ নেই সেখানে কৃষককে পুকুর বা জলাশয় থেকে ক্ষেতে পানি সেচ দিতে হয়। এভাবে বিল-ঝিল হতে ক্রমাগত সেচের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের ফলে এক সময় পানি কমতে কমতে শেষে মাছের বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এক সময় চাষি বা এলাকার লোকজন জলাশয়ের অবশিষ্ট পানি সেচে সম্পূর্ণ মাছ ধরে ফেলে। ফলে ছোট-বড়, ডিমওয়ালা কোনো মাছই চাষির হাত হতে রক্ষা পায় না। তাই পরের বছর ঐসব জলাশয়ে বংশ বিস্তারের জন্য আর কোনো মাছই অবশিষ্ট থাকে না। এভাবে ছোট ছোট বিল, খাল, ডোবা প্রভৃতি সেচের মাধ্যমে শুকিয়ে মাছ আহরণের ফলে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

৫. অতি আহরণ : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সর্বদাই প্রাপ্য মাছের তুলনায় চাহিদা অনেক বাড়ছে। ফলে বেশি চাহিদা মেটানোর জন্য মৎস্যজীবীরা আরও বেশি সময়, যন্ত্রপাতি ও লোকবল নিয়োজিত করে মাছ আহরণে সচেষ্ট হয়। এভাবে নদ-নদী, খাল-বিলে অতি আহরণজনিত কারণে পরের বছর প্রজননের জন্য আর মা মাছ থাকছে না বা কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি বছর বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে যে পরিমাণ পোনা উৎপাদিত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মাছ আহরণ করা হচ্ছে। আবার অনেক সময় মৎস্যজীবীরা তাদের স্বাভাবিক সরঞ্জাম দিয়ে কম মাছ পাওয়ার কারণে এমন সব সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করছে যার ফলে ছোট ছোট পোনা মাছও মৎস্যজীবীদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এভাবে অতি আহরণজনিত কারণে এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ার কারণে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হচ্ছে।

৬. পানি দূষণ : মৎস্য সম্পদহ্রাসের মানব-সৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে পানি দূষণ অন্যতম। আমাদের দেশের শিল্প নগরীগুলোর অধিকাংশই নদ-নদীর পাড়ে অবস্থিত। এসব শিল্প-কারখানার বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় নদ-নদীতে ফেলার ফলে মারাত্মকভাবে পানি দূষিত হচ্ছে। এতে অনেক সময় কোনো কোনো নদীতে মাছের ব্যাপক মড়ক পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বড় বড় নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় জমাকৃত বর্জ্য কোনোরূপ পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি নদীতে ফেলা হয়। যেমন- বুড়িগঙ্গা নদীর কথা বলা যেতে পারে। এখানে পানি দূষন এমন এক মাত্রায় পৌঁছেছে যে, সেখানে মাছ তো দূরের কথা যে কোন প্রাণীর বাঁচা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এছাড়া জাহাজ হতে প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে তৈলজাতীয় পদার্থ পানিতে মিশে যায়, যা জলীয় পরিবেশকে মারাত্বকভাবে দূষিত করছে। আবার অনেক সময় বিদেশ থেকে বড় বড় জাহাজগুলো ওভার হোলিং (Over holling) করার জন্য আমাদের জলসীমায় প্রবেশ করে। এসব জাহাজের তৈলাক্ত পদার্থসহ ময়লা-আবর্জনা আমাদের জলসীমায় ফেলে দিয়ে জাহাজ পরিষ্কার করে নিয়ে যায়। এতেও আমাদের জলজ পরিবেশ মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে নদ-নদী ক্রমান্বয়ে মৎস্যশূন্য হয়ে পড়ছে।

মৎস্য সম্পদহ্রাসের প্রতিকারের উপায়সমূহ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদহ্রাসের প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে–

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে বন্যা বা জোয়ারের পানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না করে আংশিক বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। যাতে কিছু পরিমাণ মাছ প্রজননের জন্য খাল-বিলে প্রবেশ করতে পারে এবং বিলের সদ্য প্লাবিত এলাকায় প্রজনন ঘটিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে;
- বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সাথে ফিশপাস বা ফিশ ফ্রেন্ডলি স্ট্রাকচার তৈরি করা যেতে পারে। এতে প্রজননযোগ্য মাছ নদী থেকে বিলে এবং বিল থেকে নদীতে সুষ্ঠুভাবে পরিভ্রমণ ও প্রজনন করতে পারবে;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভিতর স্লুইস গেট দিয়ে প্রয়োজন মতো পানি ঢুকিয়ে সমন্বিত পদ্ধতিতে ধান ও মাছচাষ করা যেতে পারে;
- কৃষি জমিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থাপনা হলো সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management)-এর মাধ্যমে রোগ-বালাই প্রতিরোধ বা দমনের ব্যবস্থা করা;
- সেচের জন্য পানি ব্যবহারে সংযমী হওয়া। মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয় এমন স্থান হতে পানি সেচ নিষিদ্ধ করা। সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা;
- অতি আহরণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানো। অতি আহরণ রোধকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে মেনে চলা;
- দূষণ প্রতিরোধকল্পে পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা;
- শিল্প স্থাপনের পূর্বেই বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা শিল্প স্থাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক করা;
- অপরিশোধিত পয়ঃ কোনো অবস্থাতেই মুক্ত জলাশয়ে যেন না যায় তার ব্যবস্থা করা;
- মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য মৎস্য বিভাগীয় অবকাঠামো ও জনশক্তি বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা;
- মৎস্য সম্পদহ্রাসের কোনো কারণ চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বয় সাধনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশে মৎস্য চাষের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ভৌগোলিকভাবেই এ দেশ জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ। জলজ সম্পদকে কাজে লাগানোর মতো আমাদের দেশে রয়েছে বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। দেশের উর্বর মাটি, মানুষ ও জলজ সম্পদ এ তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে রূপান্তরিত করা যেতে পারে সম্পদশালী জনশক্তিতে। তবে উন্নয়নের এ ধারাকে সচল রাখতে হলে সর্বাগ্রে জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আমরা জানি প্রতি একক আয়তন ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে প্রতি একক আয়তন জলাভূমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। আর এ জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার কথা এলে প্রথমেই আসে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা। মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা দুই ধরনের। যথা-

১. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা;
২. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা।

১. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা : এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। মুক্ত জলাশয়ে উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ, মাছের আবাসস্থলের উন্নয়ন, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, ফিশপাস বা ফিশ ফ্রেন্ডলি স্ট্রাকচার তৈরিকরণ, খাঁচায় বা পেনে মাছ চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অতি সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যার সুফল আসতে শুরু করেছে।

২. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা : আমাদের দেশের অল্প সংখ্যক পুকুর-দিঘিতে উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে পুকুর-দিঘিতে হেক্টরপ্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন ২৮৩৯ কেজি। প্রতি বর্গমাইলে এত পুকুর পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই যা আমাদের দেশে রয়েছে। অর্থাৎ পুকুর থেকে মাছচাষের যে বিপুল সম্ভাবনা আমাদের দেশে রয়েছে তার একটি বড় অংশ এখন পর্যন্ত অব্যবহৃত রয়েছে। সুতরাং আমাদের দেশে মাছচাষে আরও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে মাছচাষে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে হলে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং মাছচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করে মানুষকে মাছচাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি সহায়তায় ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, সুলভ মূল্যে সুষম সম্পূরক খাদ্য উপকরণ সরবরাহকরণসহ মৎস্য চাষের জন্য যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে পারলে এ সেক্টরের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমাদের প্রয়োজনীয় প্রানিজ আমিষের শতকরা কত ভাগ মৎস্য সম্পদ থেকে পাওয়া যায়?
২. ছোট মাছে কোন ভিটামিন বেশি পাওয়া যায়?
৩. কোন মাছে ভিটামিন এ বেশি পাওয়া যায়?
৪. মলা মাছে কোন ভিটামিন থাকে?
৫. কোন মাছ খেলে আয়োডিনের অভাব দূর হয়?
৬. রুই মাছে প্রতি ১০০ গ্রামে কী পরিমাণ আমিষ পাওয়া যায়?
৭. পাঙ্গাশ মাছে প্রতি ১০০ গ্রামে কী পরিমাণ চর্বি পাওয়া যায়?
৮. শিং মাছে প্রতি ১০০ গ্রামে কী পরিমাণ লৌহ পাওয়া যায়?
৯. পুষ্টি বিজ্ঞানীদের সুপারিশ অনুয়ায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন কী পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন?
১০. আমাদের দেশে মৎস্য সম্পদের ওপর সার্বক্ষণিক নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কত?
১১. জাতীয় আয়ের কত শতাংশ মৎস্য সম্পদ থেকে আসে?
১২. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মোট কত প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়?
১৩. আমাদের দেশে প্লাবনভূমির পরিমাণ কত?
১৪. ২০১৩-১৪ সালে মৎস্য সম্পদ রপ্তানি করে কত টাকা অর্জিত হয়েছে?
১৫. আমাদের সামুদ্রিক জলসম্পদে মোট কত প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়?
১৬. ২০১৩-১৪ সালে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে মৎস্য চাষের অবদান কত ভাগ ছিল?
১৭. বিশ্বে মাছ চাষের উপর রচিত প্রথম বইয়ের নাম কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী মাছের তিনটি পুষ্টিগুণ উল্লেখ কর।
২. আমাদের জলসম্পদকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. আমাদের সামুদ্রিক জলসম্পদ কী কী মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ?
৪. মৎস্য সম্পদ.হ্রাসের চারটি মানবসৃষ্ট কারণের নাম উল্লেখ কর।
৫. মৎস্য সম্পদ.হ্রাসের দুটি প্রতিকার উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা আলোচনা কর।
২. দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা বর্ণনা কর।
৩. দেশের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।
৪. মৎস্য সম্পদ.হ্রাসের কারণ এবং প্রতিকারসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিংড়ি পরিচিতি, জীববিদ্যা ও চাষ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী সম্পদ। রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে পাট ও পোশাক শিল্পের পরেই চিংড়ির স্থান। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চিংড়ি রপ্তানি থেকে বছরে প্রায় ৪১১৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। যা রপ্তানি আয়ের প্রায় ১২-১৫ শতাংশ। রপ্তানিযোগ্য চিংড়ির পুরোটাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবাধ উৎসের উৎপাদন অথবা আহরণ। তবে প্রকৃতপক্ষে চিংড়ি চাষ এখনো বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে ওঠেনি। চাষ ব্যবস্থায় যা হচ্ছে তা হলো প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত পোনা 'ঘের'-এ আবদ্ধ করে সাময়িক লালন-পালন মাত্র। প্রাকৃতিক পোনা ঘেরে আটকিয়ে যে চাষ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বর্জিত বলে এর উৎপাদনও হতাশাব্যঞ্জক। এ অবস্থায় হেক্টরপ্রতি চিংড়ির গড় উৎপাদন মাত্র ৬০০ কেজি। অথচ আমাদের দেশের অনুরূপ অন্য অনেক দেশেই হেক্টরপ্রতি ন্যূনতম উৎপাদন ১০০০ কেজি। তাই আমাদের দেশেও হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

চিংড়ির বৈজ্ঞানিক পরিচিতি

চিংড়ি আর্থোপোডা বা সন্ধিপদী পর্বের অন্তর্ভুক্ত ক্রাস্টাসিয়া শ্রেণির ডেকাপোডা বর্গের প্রাণী। Arthro অর্থ যুক্ত এবং Poda অর্থ পা। অর্থাৎ এ পর্বের প্রাণীদের 'যুক্ত পা' বিদ্যমান। এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়, লম্বাকৃতি, প্রতিসম ও খণ্ডিত। দেহ মস্তক ও উদর, এ দুই অংশে বিভক্ত। চিংড়ির মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় না বলে মাথা ও বুককে একসঙ্গে নাম দেয়া হয়েছে শিরোবক্ষ (Cephalothorax)। উদর (Abdomen) ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে সরু হয়ে লেজ (Telson)- এর সাথে মিশেছে। শিরোবক্ষে ১৩টি এবং উদরে ৬টি উপাঙ্গ রয়েছে। চিংড়ির দেহ কাইটিন নামক খোলস দিয়ে আবৃত যা ক্যালসিয়াম উপাদান দিয়ে গঠিত। মস্তকের এ কাইটিন আবরণ সম্মুখ ভাগে দেখতে করাতের মতো যা রোস্ট্রাম (Rostrum) নামে পরিচিত। চিংড়ির খোলস দেহের প্রতি অংশকে ঘিরে রাখে এবং একটি খোলস অপর খোলসের মাঝে সন্ধিল পদার্থ (Arthrodial membrane) দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে। যার ফলে খোসাগুলি সহজে নড়াচড়া এবং প্রয়োজনে লম্বা হয়ে যেতে পারে। খোসাগুলি গোল আকৃতির। খোসার উপরের অংশকে টারগাইট (Tergite) এবং নিচের অংশকে স্টারনাইট (Sternite) বলে। টারগাইটের পাশের ঝুলন্ত অংশকে প্লিউরন (Pleuron) বলে। চিংড়ির খোলসের আবার অনেকগুলো স্তর রয়েছে। উপরের স্তর শক্ত এবং কোষবিহীন। নিচের স্তরে গ্রন্থি কোষ রয়েছে।

চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস : আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে। যথা-স্বাদু পানিতে চাষযোগ্য চিংড়ি- গলদা চিংড়ি এবং লোনা বা আধালোনা পানিতে চাষযোগ্য চিংড়ি- বাগদা চিংড়ি। নিচে দুই ধরনের চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো :

১. গলদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস

Phylum - Arthropoda
Class - Crustacea
Order - Decapoda
Family - Palaemonidea
Genus - Macrobrachium
Species - M. rosenbergii

২. বাগদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস

Phylum-Arthropoda
Class - Crustacea
Order - Decapoda
Family- Penaeidae
Genus - Penaeus
Species - P. indicus

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ির শ্রেণিবিভাগ : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়িকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- পিনাইড (Penaeid) গ্রুপ এবং নন-পিনাইড (Non-penaeid) গ্রুপ। বাগদা, চাপড়া ইত্যাদি মূল্যবান সামুদ্রিক চিংড়িসমূহ পিনাইড গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে গলদা, ছটকা, ডিমুয়া ইত্যাদি স্বাদু বা ঈষৎ লবণাক্ত পানির চিংড়ি নন পিনাইড গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। নিচে পিনাইড এবং নন-পিনাইড চিংড়ির পার্থক্য দেয়া হলো–

পিনাইড	নন- পিনাইড
১. দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের খোলস (Pleura) শুধুমাত্র তৃতীয় খণ্ডকের প্লিউরাকে আংশিক আবৃত করে।	১. দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের খোলস বা প্লিউরা শুধুমাত্র ১ম এবং ৩য় খণ্ডকের প্লিউরাকে আংশিক আবৃত করে।
২. পিনাইড চিংড়ির প্রথম তিনটি বক্ষ উপাঙ্গ বা ভ্রমণপদ চিলেটে (Chelete) রূপান্তরিত হয়।	২. পিনাইড বহির্ভূত চিংড়ির প্রথম দুইটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে পরিণত হয়।
৩. সঙ্গমকালে শুক্রকীট স্থানান্তরের জন্য পিনাইড পুরুষ চিংড়ি পেটাসমা (Petasma) এবং স্ত্রী চিংড়িতে থেলিকাম (Thelycum) নামক অঙ্গ থাকে।	৩. পুরুষ বা স্ত্রী চিংড়ির দেহে এ জাতীয় কোনো অঙ্গ দেখা যায় না।
৪. স্ত্রী পিনাইড চিংড়ি ডিমগুলো সরাসরি পানিতে ছাড়ে।	৪. স্ত্রী চিংড়ি ডিমগুলো গুচ্ছাকারে সন্তরণ পদগুলোর (Pleopods) মধ্যবর্তী স্থানে বহন করে এবং ডিমগুলো না ফোটা পর্যন্ত যত্ন নেয়।

শ্রিম্প (Shrimp) এবং প্রন (Prawn)-এর মধ্যে পার্থক্য

ইংরেজিতে চিংড়ি Shrimp এবং Prawn এ দুই নামে পরিচিত। ১৯৬৫ সালে FAO আয়োজিত এক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, লোনা পানির চিংড়িকে Shrimp এবং মিঠা পানির চিংড়িকে Prawn বলা যেতে পারে। গলদা চিংড়িকে সাধারণত Giant Fresh Water Prawn এবং বাগদা চিংড়িকে Giant Tiger Shrimp বলা হয়। নিচে গলদা চিংড়ি এবং বাগদা চিংড়ির পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করা হলো–

গলদা চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি
১. গলদা চিংড়ির ৩টি ফ্ল্যাজেলা বিদ্যমান থাকে।	১. বাগদা চিংড়ির ২টি ফ্ল্যাজেলা বিদ্যমান থাকে।
২. এদের ক্ষেত্রে প্রথম দুই জোড়া পায়ে চিমটা দেখা যায়। তৃতীয় জোড়া পায়ে চিমটা থাকেনা। উদর তীক্ষ্ণ বা তীব্রভাবে বাঁকানো। তৃতীয় পায়ে ৪ থেকে ৬টি পর্যন্ত সন্ধি (Joint) বিদ্যমান থাকে।	২. প্রথম তিন জোড়া পায়ের অগ্রভাগে চিমটাজাতীয় অংশ বিদ্যমান। উদরের অংশ তীব্রভাবে বাঁকানো নয়। তৃতীয় পায়ে ৭টি সন্ধি (Joint) বিদ্যমান।
৩. পুরুষ চিংড়ির বেলায় দ্বিতীয় জোড়া পায়ের গোড়ানালীর কাছে পুং জননেন্দ্রীয় বিদ্যমান। তবে স্ত্রী চিংড়ির বেলায় এ ধরনের তেমন কোন স্পষ্ট প্রজনন অঙ্গ দেখা যায় না।	৩. পুরুষ চিংড়ির বেলায় প্রথম জোড়া পা সাঁতারের পায়ের উৎপত্তি স্থানে ও স্ত্রী চিংড়ির ৫ম পায়ের গোড়ার দিকে জননেন্দ্রীয় থাকে।
৪. স্ত্রী চিংড়ি পায়ের মাঝে গুচ্ছাকারে ডিম বহন করে। প্রজনন বেলায় এরা মোহনায় ডিম পাড়ে।	৪. এরা দেহের বহিরাংশে ডিম বহন করে না। প্রজনন কালে ডিম নিষিক্ত (Fertilization) হওয়ার পরে সাগরে ত্যাগ করে।
৫. গলদা চিংড়ির আবাসস্থল সাধারণত মিঠা পানি।	৫. বাগদা চিংড়ির আবাসস্থল সাধারণত লোনা পানি।
৬. এদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে মিঠা পানিতে। তবে ডিম পাড়ার সময় আবার উপকূলীয় আধালোনা পানিতে ফিরে যায়।	৬. এদের দৈহিক বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় সমুদ্রে বা লবণাক্ত পানিতে।

স্বাদু পানিতে চাষযোগ্য কতিপয় চিংড়ির বাংলা এবং বৈজ্ঞানিক নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

বাংলা নাম/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গলদা চিংড়ি	*Macrobrachium rosenbergii*
ছটকা চিংড়ি	*Macrobrachium malcolmsonii*
ডিমুয়া চিংড়ি	*Macrobrachium villosimanus*
কাইরা চিংড়ি	*Macrobrachium dayanus*
ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি	*Macrobrachium birmanicus*

লোনা পানিতে চাষযোগ্য কতিপয় চিংড়ির বাংলা এবং বৈজ্ঞানিক নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

বাংলা নাম/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
বাগদা চিংড়ি	*Penaeus monodon*
চাপদা চিংড়ি	*Penaeus indicus*
হরিণা চিংড়ি	*Metapenaeus monoceros*
বাগতারা চিংড়ি	*Penaeus semisulcatus*
ডোরাকাটা চিংড়ি	*Penaeus japonicus*

নিচে একটি গলদা চিংড়ি এবং একটি বাগদা চিংড়ি দেখানো হলো।

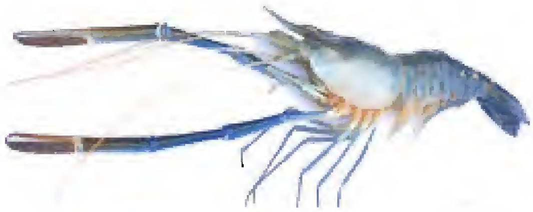

চিত্র-১ : গলদা চিংড়ি

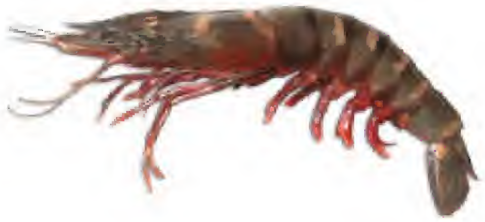

চিত্র-২ : বাগদা চিংড়ি

চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান বা বিচরণ

কতিপয় মিঠাপানির চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান বা বিচরণ এলাকা নিচে দেয়া হলো–

বাংলা নাম/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গলদা চিংড়ি (Fresh water giant prawn)	বাংলাদেশের দাউদকান্দি, বাগেরহাট, চাঁদপুর, চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন লেক, নদী ও মোহনায় এবং এশিয়ার ইন্দো-চায়নায় এরা সর্বোচ্চ বিচরণ করে।
ছটকা চিংড়ি (Monsoon river prawn)	বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, দাউদকান্দি, নরসিংদী, রংপুর, ফরিদপুর, ফেনী, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে এ চিংড়ি পাওয়া যায়। বর্ষাকালে উত্তর ভারতে এ চিংড়ি প্রচুর পাওয়া যায়।
ডিমুয়া চিংড়ি (Dimua river prawn)	বাংলাদেশের দাউদকান্দি, বাগেরহাট, চাঁদপুরের ডাকাতিয়া, মেঘনা এবং কর্ণফুলী ও হালদা নদীতে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বার্মায় এ চিংড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।
ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি (Birma river prawn)	ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের অন্যত্র কম বেশি এ চিংড়ি পাওয়া যায়।
কাইরা চিংড়ি (Kaira river prawn)	বাংলাদেশের সব নদীতে কমবেশি এ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। তবে বর্ষাকালে রাজশাহীতে এদের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি। পূর্ব ভারত এবং পাকিস্তানেও এ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়।

লোনা বা আধা-লোনা পানিতে পাওয়া যায় এমন কতিপয় চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান বা বিচরণ এলাকা নিচে দেয়া হলো :

স্থানীয় বা ইংরেজি নাম	প্রাপ্তিস্থান বা বিচরণ এলাকা
বাগদা চিংড়ি (Giant tiger prawn)	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বাগেরহাট, পটুয়াখালী, খুলনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরে, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, ভারতের উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকা এদের বিচরণক্ষেত্র ।
চাপদা চিংড়ি (Indian white shrimp)	বাগেরহাট, চালনা, খুলনা, পশুর নদ, পটুয়াখালী, খেপুপাড়া, কক্সবাজার, বঙ্গোপসাগর, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে এ ধরনের চিংড়ি বিচরণ করে।
হরিনা চিংড়ি (Ginger shrimp)	বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এবং চালনার মোহনা অঞ্চল। পশুর নদের নিম্ন মোহনা, চট্টগ্রাম, বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ভারতের সমগ্র সমুদ্রোপকূলে এ চিংড়ির বিচরণ ক্ষেত্র দেখা যায়।
বাগতারা চিংড়ি (Tiger prawn)	বাংলাদেশের সুন্দর বনের মোহনাঞ্চল, পটুয়াখালী ও খেপুপাড়া, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউগিনি, ফিলিপাইন, উত্তর জাপান এবং ভারতের পূর্ব উপকূলে এ চিংড়ি প্রচুর পাওয়া যায়।
ডোরাকাটা চিংড়ি (Japanese king)	বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে, আফ্রিকা, জাপান, ভারতের চেন্নাই এবং মুম্বাই-এর সমুদ্র উপকূলে এ চিংড়ি পাওয়া যায়।

চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই কৃষিনির্ভর। বিশেষ করে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক অবদান রাখছে। আমাদের রয়েছে ৪৮০ কি.মি. বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চল, যার প্রায় সবটায় চিংড়ি এবং উপকূলীয় মাছ চাষের জন্য উপযোগী। আমাদের দেশে প্রধানত: দুই প্রজাতির চিংড়ি চাষ হয়, যথা- বাগদা ও গলদা চিংড়ি। দেশে উৎপন্ন বাগদা চিংড়ির প্রায় সবটাই বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। এতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়ে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ সালে যেখানে এর পরিমাণ ছিল ১,১০৬.৩৯ কোটি টাকা। বর্তমানে ২০১৩-১৪ সালে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে মোট আয় হয়েছে ৪৭৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধুমাত্র চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪১১৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ রপ্তানি আয়ে চিংড়ির অবদান প্রায় ৯০%। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে একদিকে যেমন গলদা ও বাগদা চিংড়ির খামার ও হ্যাচারি স্থাপন, উৎপাদিত চিংড়ি পরিবহন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, চিংড়ি চাষ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অপর দিকে চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত নানাবিধ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করা দরকার। আমাদের দেশে প্রায় ৩ লক্ষ

হেক্টরেরও বেশি চিংড়ি চাষ উপযোগী এলাকা রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ১,১৫০০০ হেক্টরে বর্তমানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। যেখানে বর্তমানে হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ৬০০ কেজি। এ উৎপাদন হার বিশ্বের প্রধান প্রধান চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন হারের তুলনায় অনেক কম। তবে চাষ ব্যবস্থাপনা ও ঘের কাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এ উৎপাদন হার সহজেই দ্বিগুণ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বিগত কয়েক দশক যাবৎ ঘেরে চিংড়ি চাষ উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে এবং বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকৃত পক্ষে, মৎস্য বা চিংড়ি সম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বর্তমানে মৎস্য খাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে স্বীকৃত। গার্মেন্টস খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে থাকলেও শ্রম ব্যতীত রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯৮% অর্থ বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে পূর্বেই ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে মৎস্য খাত হতে রপ্তানি আয়ের মাত্র ৫% অর্থ বিভিন্ন মালামাল আমদানীতে ব্যয় হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্যখাতের অবদান গার্মেন্টস খাতের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই সীমিত সম্পদের এ দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশসম্মত চিংড়ি চাষের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা গেলে এ খাত আমাদের জাতীয় উন্নয়নে আগামীতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

চিংড়ি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ, উপকরণের প্রাপ্যতা, খামারী কিংবা চিংড়ি চাষির আর্থিক সংগতি, চিংড়ি চাষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চাষ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। যেমন-

১. সনাতন চিংড়ি চাষ পদ্ধতি;
২. সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি
৩. উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি;
৪. আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি ও
৫. নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি।

নিচে চিংড়ি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো-

১. সনাতন চিংড়ি চাষ পদ্ধতি : অল্প ব্যয়ে জলাশয়ের প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর ভিত্তি করে যে পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয় তাকে সনাতন চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে কম অথবা বেশি ঘনত্বে চিংড়ির পোনা বা পিএল মজুদ করা হয়। পুকুরে বা ঘেরে রাক্ষুসে বা অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা হয় না। পুকুরে বাহির থেকে কোন খাবার ও সার দেয়া হয় না। এ পদ্ধতিতে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন অনেক কম।

২. সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বা ঘেরের আয়তনের ক্ষেত্রে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আয়তনের ক্ষেত্রে এটা কয়েক শতাংশ থেকে শুরু করে কয়েক একর পর্যন্ত হতে পারে। এ চিংড়ি চাষ কার্যক্রম গতানুগতিক, অর্থাৎ চুন, সার, গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক নয়। রোগ-বালাই প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

৩. উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে জলাশয়ের আয়তন তুলনামূলক কম বা ছোট এবং সাধারণভাবে যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। চিংড়ি পোনা মজুদ কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত, খাদ্য কিংবা সার

হিসেবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে চালের কুঁড়া, খৈল ইত্যাদি মিশিয়ে বল বানিয়ে প্রয়োগ এবং সার হিসেবে ইউরিয়া, টিএসপি, গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

৪. আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি : এ ধরনের চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে জলাশয়ের আয়তন তুলনামূলক ছোট, পাড় বন্যামুক্ত এবং পুকুর পাড়ে সমস্যা সৃষ্টিকারী কোনো গাছপালা সচরাচর থাকে না। বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে পোনা মজুদ, নির্ধারিত মাত্রায় চুন, জৈব এবং অজৈব সার প্রয়োগ, সব রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার ব্যবস্থাকরণ এবং শতাংশপ্রতি মজুদ ঘনত্ব অনেক বেশি। এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ এবং রোগ বালাই দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৫. নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি : এ ধরনের চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বাধিক সুযোগ ব্যবহার করা হয়। অল্প জায়গায়, কম সময়ে অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা হলো- জলাশয় সম্পূর্ণভাবে চিংড়ি চাষির নিয়ন্ত্রণে থাকে, আয়তন তুলনামূলক ছোট (১-২ একর), একক পরিমাণ জলাশয়ে চিংড়ির পোনা মজুদের হার তুলনামূলক অনেক বেশি, উন্নত মানের সুষম পিলেট খাদ্য প্রয়োগ, নিয়মিত পানি পরিবর্তন ও অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বায়ু সঞ্চালনের আধুনিক ব্যবস্থাকরণ। নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি।

ঘেরে চিংড়ি চাষ

ঘের বলতে বুঝায় এমন এক খণ্ড জমি যার ভেতর খাল কেটে চারদিকে বাঁধ দিয়ে চিংড়ি ও ধান চাষ করা হয়।

চিত্র-৩ : ঘেরে চিংড়ি চাষ

জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে আধা লবণাক্ত পানি যেখানে ওঠানামা করে এমন জমিতে জোয়ারের পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষ করা হয়। এভাবে লবণাক্ত পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষকে ঘেরে চিংড়ি চাষ বলে। জোয়ারের সময় লবণাক্ত পানি যাতে ধানক্ষেতে প্রবেশ করে ধান চাষের ক্ষতি না করতে পারে এ জন্য উপকূলীয় নদীর পাড় ঘেঁষে পানি উন্নয়ন বোর্ড অনেক জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করেছে। এসব বাঁধকে বেড়ি বাঁধ (Polder) বলে। বাঁধে স্থাপিত স্লুইস গেটের সাহায্যে চিংড়ি চাষের জমিতে জোয়ারের সময় লোনা পানি ঢুকিয়ে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়।

ঘেরে চিংড়ি, মাছ ও ধান চাষ : এ পদ্ধতিতে জোয়ারের পানি ঘেরে ঢুকিয়ে এবং একই সাথে চিংড়ি ও মাছের পোনা প্রবেশ করানো হয়। এ পদ্ধতিতে শীতকালে ঘেরের ভিতরে চিংড়ি চাষ করা হয় এবং বর্ষাকালের আগে চিংড়ি আহরণ করে একই ঘেরে ধান ও অন্যান্য মাছ চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বর্ষার শুরুতেই সম্পূর্ণ মাছ ধরে নেয়া হয় এবং পাম্পের সাহায্যে ঘেরের পানি গভীর খালে জমা করা হয়। এভাবে লবণাক্ততা কমিয়ে আনা হয় এবং পানি কমিয়ে রোপা আমন ধান চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ঘেরে চিংড়ি, মাছ ও ধান পর্যায়ক্রমে চাষ করা হয়।

চিংড়ি ঘেরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা : চিংড়ি চাষের সময়কাল সাধারণত ১২০-২৪০ দিন। এ সময়ে গড়ে দৈনিক ৪০০-৫০০ গ্রাম/শতাংশ হারে শামুকের মাংস প্রয়োগ করা হয়। খোলস পরিবর্তনের ৫-৬ দিন পর এবং অমাবস্যা/ পূর্ণিমার ৫-৬ দিন পর চিংড়ি বেশি খাদ্য খায়। তাই তখন চাষিরা বেশি মাত্রায় শামুকের মাংস ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে পানির গুণাগুণের ওপর মাঝে মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পানির তাপমাত্রা কমে গেলে শামুকের মাংস দেয়া হয় না এবং তখন দৈনিক ১৪০ গ্রাম/শতাংশ হারে ভাঙ্গা গম এবং ১৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে চালের কুঁড়া দেয়া হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা : অতিরিক্ত খাদ্য ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ খালের তলায় জমা হওয়ার কারণে ৩০-৫০ দিনের মধ্যেই পানির রং কালচে বা তামাটে হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় ঘেরে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়ে করা যেতে পারে।

চিংড়ি আহরণ : চিংড়ি ছাড়ার ১০০-১১৫ দিনের মধ্যেই আংশিক চিংড়ি আহরণ করা হয়। সাধারণভাবে ৫-১০ গ্রেড মাপের চিংড়ি আহরণ করা হয় (১ গ্রেড = ১ পাউন্ড)। অনাহারিত ৩০ গ্রেডের চিংড়ি পরবর্তী বছরের জন্য ঘেরেই রেখে দেয়া হয় যা পরবর্তী বছর বাজারজাতকরণ করা হয়। তখন তাদের গড় ওজন পাওয়া যায় ১০০-১২০ গ্রাম।

চিংড়ির খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : চিংড়ি সাধারণত পানির তলদেশে মাটির উপরে বসবাস করে। তাই সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণী জাতীয় জীবিত বা মৃত যেসব খাবার পাওয়া যায় চিংড়ি খাদ্য হিসেবে সেগুলো গ্রহণ করে থাকে। তবে এদের প্রধান খাদ্য হলো শৈবাল, মস, জলজ আগাছা, ছোট ছোট পোকামাকড় ইত্যাদি। এছাড়া চিংড়ি অনেক সময় পচা লতাপাতা, বালিকণা ইত্যাদিও উদরস্থ করে থাকে। এক কথায় এদেরকে সর্বভুক (Omnivorous) প্রাণী বলা যায়। যেহেতু এরা মূলত রাতেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তাই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চিংড়িকে রাতে খাদ্য প্রদান করা হয়।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এরা প্রথমে অ্যান্টিনা বা শুঁড়ের সাহায্যে খাদ্যের অবস্থান অনুভব করে। চিলেট বা সাঁড়াশিযুক্ত পা দ্বারা খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করে এবং পরে তা মুখে প্রবেশ করায়। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র চিমটাযুক্ত পা দ্বারা যেসব খাদ্যকণা চিংড়ি ধরতে পারে সেগুলোই সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাই খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তবে শ্বসন কার্যের সময় প্ল্যাংকটন জাতীয় প্রাকৃতিক খাদ্যকণা গ্রহণ করে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করার সময় চিংড়ি মুখ দিয়ে অনবরত প্রচুর পরিমাণে পানি গ্রহণ করে থাকে এবং ফুলকা দিয়ে বের করে দেয়। এ সময় মুখের ভিতরের বিশেষ ধরনের কলা কৌশলের দ্বারা পানিতে বিদ্যমান অণুজীব খাদ্যকণা হিসেবে খাদ্যনালীতে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং পরিশ্রুত পানি ফুলকার উপর দিয়ে প্রবাহকালে ফুলকার বিশেষ ধরনের কোষ দ্বারা পানি থেকে অক্সিজেন গৃহীত হয়। এ জন্য উর্বর পুকুরে অনেক সময় সম্পূরক খাবার প্রয়োগ না করেও নিয়মিত সার

প্রয়োগ করলে চিংড়ির খাদ্যের অভাব হয় না। চিংড়ি সাধারণত দিনের বেলায় আড়ালে বিশ্রাম করে এবং রাতে খাদ্যের অন্বেষণে চরে বেড়ায়। তাই দিনের চেয়ে রাতেই বেশি খাদ্য খায়। শুধু খাদ্য গ্রহণই নয় জীবনের অধিকাংশ কাজ, যেমন- খোলস ছাড়া, প্রজনন ও ডিমপাড়া এবং ডিমফোটা ইত্যাদি সব কাজই এরা রাতে সম্পন্ন করে থাকে। তাই এদেরকে নিশাচর (Nocturnal) প্রাণী বলা হয়ে থাকে।

চিংড়ির আশ্রয়স্থল : চিংড়ি যখন খোলস পাল্টায় তখন অত্যন্ত দুর্বল থাকে। এ সময়ে আশ্রয়স্থল না পেলে অনেক ক্ষেত্রে অন্য প্রাণী এমনকি সবল চিংড়ি দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে। এ থেকে রক্ষাকল্পে যেসব জলাশয়ের তলদেশে কোনো উদ্ভিদ নেই সেখানে বিষাক্ত নয় এমন কিছু গাছের ডালপালা যেমন- খেজুর, তাল বা নারিকেল পাতা হেক্টরপ্রতি ২০০-২২৫টি বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখা যেতে পারে। পুঁতে রাখা এসব ডালপালা শুধু আশ্রয়স্থল হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এসব ডালপালায় শেওলাজাতীয় যেসব খাদ্য জন্মায় চিংড়ি সেগুলো খুঁটে খুঁটে খেতে পছন্দ করে। চিংড়ির আশ্রয়স্থলের জন্য এসব ডালপালা এবং উদ্ভিদসহ আরো অনেক কিছু যেমন- ফাঁপা ইট, প্লাস্টিকের হোসপাইপের টুকরো, ফ্রেমে বাধা নাইলন চটজালের খণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় পানির নিচে ভূমি সমান্তরাল করে নাইলনের জাল ছোট ছোট মাচার মতো করে দিলে চিংড়ির আশ্রয়স্থল এবং বিচরণ এলাকা অনেক বেড়ে যায়। আবার অনেকে প্রতি ৫ বর্গ মিটারে এক গুচ্ছ বাঁশের কঞ্চি ও প্রতি ১০ বর্গ মিটারে একটি নারিকেল বা খেজুর গাছের ডাল চিংড়ির নিরাপদ এবং আরামদায়ক আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

চিংড়ি চাষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া : চিংড়ি চাষ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় আর্থ-সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি করে চলেছে। চিংড়ি চাষ, ধান চাষ ও লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার নিয়ে প্রায়ই কলহ-বিবাদ দেখা দেয়। চিংড়ি চাষে জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধান চাষ সন্তোষজনক হয় না। অনেক ক্ষেত্রে চিংড়ি খামারের মালিক বহিরাগত হয়ে থাকেন। তাই চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিবাচক দিকসমূহ মূলত দুইটি।

প্রথমতঃ চিংড়ি চাষের মাধ্যমে দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং এর জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় কোনোরূপ খরচ নেই বললেই চলে। অপরটি হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে বিদেশে রপ্তানি পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর নেতিবাচক দিকসমূহ হলো–

১. চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় বনজ সম্পদ বিলীন হচ্ছে;
২. গো-চারণ ভূমি হ্রাস পাচ্ছে;
৩. বেড়ি বাঁধ নির্মাণের ফলে জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ধানের উৎপাদন কমে যাচ্ছে;
৪. হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল প্রভৃতি পালনে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে;
৫. গরিব জনসাধারণের জন্য ঘরের ছাউনির কাঁচামালের সমস্যা দেখা দিয়েছে;
৬. শাক-সবজির সংকট ও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে;
৭. সরকারি খাস খালে চিংড়ি চাষের ফলে সাধারণ মৎস্যজীবীদের আয় কমে গেছে;
৮. ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ও
৯. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধিসহ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে।

এ অভিযোগসমূহ ক্ষেত্রবিশেষে সঠিক হলেও সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। তাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এ শিল্পের যথাযথ প্রসারের জন্য সঠিক দিক নিদের্শনা দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. উপকূলবর্তী এলাকা জরিপ এবং চিংড়ি চাষযোগ্য এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং চিংড়ি চাষ এলাকাগুলো চিংড়ি এলাকা বলে ঘোষণা দেয়া। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উপকূলীয় ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের নিমিত্ত একটি সুচিন্তিত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২. সরকারি মালিকানাধীন উপকূলীয় জমি এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দিতে হবে যারা নিজেরাই চিংড়ি চাষে নিয়োজিত হবে। ধনী ও শৌখিন চাষিদের বা প্রভাবশালী এবং রাজনীতিবিদদের চিংড়ি চাষ থেকে বিরত রাখা।

৩. চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন ও প্রাকৃতিক উৎসের চিংড়ি পোনা সংরক্ষণ করা।
৪. চিংড়িসহ বহু সামুদ্রিক প্রাণীর লার্ভা এবং পোনা নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ব্যবহার করে। তাই পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে ম্যানগ্রোভ অঞ্চল নষ্ট না করে আরো বৃদ্ধি করা দরকার।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চাষ এলাকার ব্যাপক সম্প্রসারণ না ঘটিয়ে চিংড়ি চাষে লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই আমরা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো।

চিংড়ির রোগ ও প্রতিকার : জীবমাত্রই নানা প্রকার রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। চিংড়ি এর ব্যতিক্রম নয়। চিংড়ির আবাসস্থল তথা পরিবেশের মধ্যেই রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী, অন্যান্য জীবাণু আর রাক্ষুসে মাছের দল। পরিবেশের যে কোনো পরিবর্তনের ফলে বা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে কখনো কখনো জলজ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে চিংড়ির দেহে পরিবেশগতভাবে নানা ধরনের চাপ পড়ে এবং রোগজীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে চিংড়িতে নানা ধরণের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। পরিবেশগত যেসব কারণে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে নিচে তা বর্ণনা করা হলো–

১. পুষ্টিহীনতার কারণে বা খাদ্যের অভাবে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়লে;
২. প্রাকৃতিক পরিবেশে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে এবং পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে (৩২°সে. এর উপরে);
৩. পানি দূষিত হয়ে গেলে কিংবা পানির রং এর দ্রুত পরিবর্তন ঘটলে;
৪. পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পাওয়া গেলে;
৫. মাটিতে এসিড সালফেটের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে;
৬. পুকুরের মাটি কালো হয়ে গেলে এবং মাটিতে পচা ডিমের মতো দুর্গন্ধ প্রতিয়মান হলে অর্থাৎ পচা অংশ থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গত হলে;
৭. অতি বৃষ্টিজনিত কারণে পানির লবণাক্ততা আকস্মিকভাবে কমে গেলে;
৮. পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

রোগাক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণসমূহ

নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ দেখে চিংড়ি রোগাক্রান্ত কিনা তা শনাক্ত করা যেতে পারে–

১. চিংড়ির খোলস বা শিরোবক্ষ অঞ্চলের কেরাপেসে কালো রং দেখা দেয়;
২. বহিঃকঙ্কাল হালকা সাদা বর্ণ ধারণ করে;
৩. চিংড়ির চলন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অলসভাবে চলাফেরা করে;
৪. পুকুর পাড়ের কিনারার দিকে ভেসে থাকতে দেখা যায়;
৫. চিংড়ির ফুলকা বাদামি বর্ণ ধারণ করে;
৬. রোগাক্রান্ত চিংড়ি এলোমেলো বা অনিয়মিতভাবে সাঁতার কাটতে থাকে;
৭. রোগাক্রান্ত চিংড়ির দেহে আঙ্গুলের চাপ দিলে কিছুটা বসে যায়। সুস্থ সবল চিংড়িতে এমন গর্ত হয় না;
৮. খাদ্যনালী কেটে দেখলে কোন খাদ্যকণা দেখা যায় না;
৯. রোগাক্রান্ত চিংড়ির চোখের বর্ণ সাদা হয়।

চিংড়ি রোগের প্রকারভেদ ও তাহার প্রতিকার : চিংড়ি রোগে আক্রান্ত হলে রোগ প্রতিকারের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিচে আক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণ, চিংড়ির কয়েকটি রোগ এবং তার প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করা হলো–

রোগের নাম	আক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণ	রোগের প্রতিকার
ভাইরাস জাতীয় রোগ	- এ রোগ মূলত বড় চিংড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায়। - বেশি আক্রমণের ফলে দেহের অন্ননালীর পচন বা ক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। - আক্রান্ত চিংড়ি নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়।	- এ রোগের কোনো প্রতিকার নেই।
ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ	- এ রোগে আক্রান্তচিংড়ির কানকো কমলা অথবা হালকা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। - আক্রান্ত চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খাওয়া বন্ধ করে দেয়।	- দ্রুত পানি পরিবর্তন করতে হবে। - অথবা ১০ পিপিএম মাত্রায় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করলে এ রোগ সেরে যায়।
ছত্রাকজনিত রোগ	- আক্রান্ত চিংড়ির কানকো ও ঘাড় কালো হয়ে যায়। - খোলসে কালো দাগ পড়ে এবং খোলস ভেঙে পড়ে। - বুকে শ্যাওলা জমে এবং শরীর সাদাটে বা লালচে দেখায়। - মাংসে পচন ধরে এবং পা ভেঙে যায়। - আক্রান্ত চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চলার গতি কমে যায়।	- দ্রুত পানি পরিবর্তন করতে হবে। - আক্রান্ত চিংড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।

রোগের নাম	আক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণ	রোগের প্রতিকার
ব্ল্যাকগিল রোগ	- কানকোতে কালো দাগ পড়ে এবং শ্যাওলা জমে থাকে। - কানকো কালো হয়ে যায়। - কানকো কমলা অথবা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। - আক্রান্ত চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে মারা যায়।	- দ্রুত পানি পরিবর্তন করতে হবে। - আক্রান্তচিংড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে। - খাবার সরবরাহ কিছু দিন বন্ধ রাখতে হবে।
খোলস নরম হওয়া রোগ	- খোলসে বাদামি দাগ পড়ে খোলস নরম হয়ে যায়। - খোলসে চাপ দিলে পানি পড়ে। - খোলসের নিচে মাংসে পচন ধরে নরম হয়ে যায়। মাংস খোলস হতে আলাদা হয়ে যায়।	- দ্রুত পানি পরিবর্তন করতে হবে। - পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। - চিংড়ি ধরে সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে হবে। - আক্রান্ত চিংড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে। - প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ০.৫০ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রয়োগ করা হলে এ রোগ ভালো হয়ে যায়।
গ্যাসফুলা রোগ	- আক্রান্ত চিংড়ি ভেসে বেড়ায়। - কানকুয়াতে গ্যাস জমে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়।	- আক্রান্ত চিংড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।
খোলস পাতলা রোগ	- এ রোগে আক্রান্ত চিংড়ির খোলস ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং হালকা বাদামি রং ধারণ করে।	- সময় মতো ও পরিমিত পানি পরিবর্তন। - পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ এবং উপযুক্ত
	- আক্রান্ত চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দিনের বেলায় পাড় ঘেঁষে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়।	পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োগে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

এছাড়া পুষ্টিহীনতার কারণে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পুষ্টিহীনতার কারণে পা লম্বা হয়ে যায়। এ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে দ্রুত পানি পরিবর্তনের পর পরিমিত সার প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রপ্তানি আয়ের কত শতাংশ চিংড়ি সম্পদ থেকে আসে?
২. ঘেরে হেক্টরপ্রতি চিংড়ির উৎপাদন কত?
৩. চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী?
৪. আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৫. স্বাদু পানিতে চাষযোগ্য একটি চিংড়ির নাম লেখ।
৬. লোনা পানিতে চাষযোগ্য একটি চিংড়ির নাম লেখ।
৭. অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে চাষ করা হয় এমন দুটি চিংড়ির নাম লেখ।
৮. চিংড়ি চাষ হয় এমন প্রধান প্রধান জেলার নাম লেখ।
৯. নিবিড় চাষ বলতে কি বুঝায়?
১০. ঘের কাকে বলে?
১১. মোল্টিং কাকে বলে?
১২. চিংড়ি কেন মোল্টিং করে বা খোলস পাল্টায়?
১৩. চিংড়ির পুকুরে কেন আশ্রয়স্থল স্থাপন করা হয়?
১৪. চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন ২টি বস্তুর নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গলদা এবং বাগদা চিংড়ির মধ্যে দুইটি পার্থক্য লিখ।
২. গলদা চিংড়ি এবং বাগদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
৩. গলদা চিংড়ির চারটি রোগের নাম উল্লেখ কর।
৪. শ্রিম্প এবং প্রনের মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. রোগাক্রান্ত চিংড়ির দুইটি লক্ষণ বর্ণনা কর।
৬. চিংড়িকে কেন নিশাচর প্রাণী বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. আধা নিবিড় পদ্ধতিতে কীভাবে চিংড়ি চাষ করা হয় তা বর্ণনা কর।
৩. চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস বর্ণনা কর।
৪. চিংড়ির আশ্রয়স্থলের গুরুত্ব কী ?
৫. চিংড়ি চাষের নেতিবাচক দিকসমূহ উল্লেখ কর এবং কীভাবে উক্ত সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে তা আলোচনা কর।
৬. পরিবেশগত কী কী কারণে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে?
৭. চিংড়ির তিনটি রোগের নাম, আক্রান্ত চিংড়ির লক্ষণ এবং রোগের প্রতিকার বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

চাষযোগ্য মাছ সম্পর্কে ধারণা

আমাদের দেশে স্বাদু পানিতে ২৬০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। যার সবগুলোই বদ্ধ জলাশয়ে চাষ করা যায় না। আবার চাষ করলেও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায় না। যেহেতু একটা জলাশয়ে নির্ধারিত কতিপয় প্রজাতির মাছচাষ করা যায় এবং সব প্রজাতির মাছচাষ করা যায় না, তাই যে প্রজাতির মাছচাষ করা হবে তার জীবন-বৃত্তান্ত না জানলে সঠিকভাবে মাছের পরিচর্যা করা যায় না, যেমন- যে মাছের যে রকম খাদ্যাভ্যাস তাকে সে ধরনের খাদ্য না দিয়ে অন্য খাদ্য দিলে ঐ খাদ্য ঐ মাছের কোনো কাজে লাগে না, পক্ষান্তরে মৎস্যচাষির ব্যয় বাড়ে। আবার সকল মাছের শারীরিক গঠনও এক রকম নয়। যেমন- কোনো মাছের শরীর আঁইশ দ্বারা আবৃত (কার্প জাতীয়), আবার কোনো মাছের শরীরে কোনো আঁইশ নাও থাকতে পারে (ক্যাট ফিশ)। কোনো কোনো মাছ নরম হাড় বিশিষ্ট (যেমন- হাঙ্গর)। আবার কোনো কোনো মাছ শক্ত হাড় বিশিষ্ট (যেমন- রুই মাছ)। মিঠাপানিতে চাষযোগ্য সব মাছই শক্ত কাঁটাযুক্ত। তাই মৎস্যচাষি বা মৎস্য সেক্টরে জ্ঞান আহরণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার্থে নিচে কতিপয় প্রধান প্রধান চাষযোগ্য দেশী-বিদেশী মাছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাদের কার্যাবলিসহ জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো–

মাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ : মাছের দেহকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
ক. মাথা- মুখ থেকে কানকো পর্যন্ত বিস্তৃত;
খ. ধড়- কানকোর পিছন থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত;
গ. লেজ- পায়ুছিদ্র থেকে পিছনের অংশ।

মাথা : মাছের মাথা শরীরের প্রধানতম অঙ্গ। দুই পাশে চাপা দেহ বিশিষ্ট (Laterally flattend) অধিকাংশ মাছের মাথা ত্রিকোণাকৃতির। মাছের মাথার সম্মুখভাগে মুখছিদ্র বা মুখ, মুখের ঠিক পিছনে নাসারন্ধ্র অবস্থিত। সাধারণত মাছের দুটি নাসারন্ধ্র থাকে। এ নাসারন্ধ্রের সাহায্যে মাছ ঘ্রাণ নেয়, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় না।

চোখ : মাথার দুই পাশে দুটি গোলাকার চোখ বিদ্যমান থাকে। তবে মাছের চোখে কোনো পর্দা নেই ফলে মাছ কখনই চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে পারে না। তবে চোখের উপর স্বচ্ছ আবরণ দ্বারা আবৃত থাকায় পানির কোন ভাসমান কণা চোখের ক্ষতি করতে পারে না।

কানকো : মাছের মাথার দু'পাশে ফুলকার উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতির পাতলা শক্ত দুটি ঢাকনা থাকে। এ অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঢাকনাকে অপারকুলাম বা কানকো বলে। কানকোর নিচে নরম পর্দা লাগানো থাকে যা ফুলকা প্রকোষ্ঠকে ভালোভাবে বন্ধ করতে সাহায্যে করে। জীব বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ পর্দাকে Branchiostegal membrane বলে। কানকোর সাহায্যে মাছ ইচ্ছেমতো ফুলকা প্রকোষ্ঠ খুলতে ও বন্ধ করতে পারে। এছাড়াও মুখ দ্বারা গৃহীত অতিরিক্ত পানি এ পথে বের করে দিতে পারে।

ফুলকা : আকৃতিগত দিক থেকে ফুলকা দেখতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং অধিক ঘন দাঁত বিশিষ্ট চিরুনির মতো। এটা মাছের মাথার দুই পাশে কানকোর নিচে অবস্থান করে। এ অংশকে ফুলকা প্রকোষ্ঠ বলে। সাধারণত অধিকাংশ মাছের প্রতি পাশে চারটি করে মোট আটটি ফুলকা দণ্ড থাকে। মাছের প্রজাতি ভেদে ফুলকাদণ্ডের সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফুলকা দেখতে টকটকে লাল রঙের হয়। আর এ ফুলকা দেখে খুব সহজেই মাছ তাজা কিংবা বাসি বা পচা তা বুঝা যায়। ফুলকা দ্বারা মাছ পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। মাছ মুখ দিয়ে

পানি নিয়ে ফুলকার ভিতর দিয়ে কানকো পথে বের করে দেয়। ফুলকার গঠন প্রকৃতি অনুসারে ফুলকা থেকে পানি বের হতে পারে কিন্তু খাদ্যকণা ফুলকায় আটকে যায়। এভাবে কোনো কোনো প্রজাতির মাছ পানিতে ভাসমান খাদ্যকণা ফুলকার সাহায্যে ছেঁকে খেতে পারে। যেমন- সিলভার কার্প, কাতলা ইত্যাদি ।

শুঁড় : কিছু কিছু মাছের মুখে ঠোঁটের উপরে ও নিচে কোমল সুতার ন্যায় জোড় সংখ্যক লম্বা, নলাকৃতি যে অঙ্গ দেখা যায় তাকে শুঁড় বা বার্বেল বলে। শিং, মাগুর, ট্যাংরা, বোয়াল, প্রভৃতি মাছের মুখে শুঁড় রয়েছে। ইংরেজিতে আঁইশ বিহীন, শুঁড় ও তিন কাঁটা বিশিষ্ট মাছকে Cat Fish বলে। শুঁড় মাছের খাবার খুঁজতে ও কোন বস্তুর অবস্থান ও প্রকৃতি জানতে সহায়তা করে।

আঁইশ : অধিকাংশ মাছের দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত। আঁইশ মাছকে বিভিন্ন রকম রোগজীবাণু ও পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা করে। আঁইশের উপরে এক ধরণের পিচ্ছিল পদার্থ বিদ্যমান থাকে যাকে মিউকাস বলে। এ পিচ্ছিল আবরণ মাছের শরীরের রোগ বালাই ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় আঁইশ দেখে মাছের বয়স নির্ণয় করা হয়।

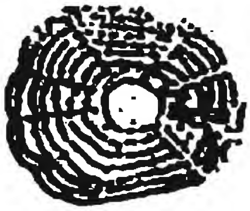
চিত্র-৪ : গোলাকার আঁইশ

মাছের আঁইশ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

ক. গোলাকার আঁইশ (Cycloid scale) : রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছে এ ধরনের আইশ দেখা যায়।

খ. চিরুনি আকৃতির আঁইশ (Ctenoid scale) : কই মাছে এ ধরনের আঁইশ দেখা যায়।

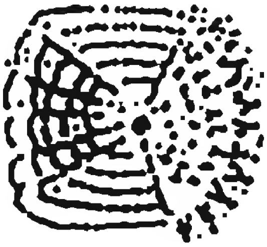
চিত্র-৫ : চিরুনি আকৃতির আঁইশ

পাখনা : মাছের চলাফেরা, গতিপথ পরিবর্তন, সাঁতার কাটা প্রভৃতি কার্যসম্পাদনের জন্য পাখনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো কোনো পাখনা জোড় যেমন- বক্ষ পাখনা এবং শ্রোণী পাখনা এবং পায়ু পাখনা। আবার কোনো কোনো পাখনা বিজোড় যেমন- পৃষ্ঠ পাখনা, পুচ্ছ পাখনা। মাছের পাখনা কাঁটাযুক্ত এবং পাতলা পর্দা দ্বারা কাঁটাগুলো আবৃত থাকে। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলোকে পাখনা রশ্মি বলে। বিভিন্ন পাখনায় মাছের প্রজাতিভেদে কাঁটার সংখ্যারও তারতম্য ঘটে। আবার প্রজাতিভেদে মাছের পাখনার আকার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যা বিশ্লেষণ করে মাছের প্রজাতি শনাক্ত করা যায়।

পাখনার অবস্থান অনুযায়ী এগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যায়। যেমন-

ক. পৃষ্ঠ পাখনা,
খ. বক্ষ পাখনা,
গ. শ্রোণী পাখনা,
ঘ. পায়ু পাখনা, ও
ঙ. পুচ্ছ পাখনা।

পার্শ্বরেখা : মাছের কানকো থেকে লেজ পর্যন্ত শরীরের দু'পাশে দুটি রেখা দেখা যায়। এ রেখাকে পার্শ্বরেখা

(Lateral line) বলে। কোনো কোনো মাছে রেখাটি আগাগোড়া স্পষ্ট দেখা যায়। আবার কোনো কোনো মাছের রেখার সম্পূর্ণ অংশ বুঝা যায়না। পার্শ্বরেখা মাছের জন্য অনুভূতি নিরূপণ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এ রেখা দ্বারা মাছ পানির নড়াচড়া, স্রোত, পানির চাপ ইত্যাদি বুঝতে পারে। এছাড়া রেখার উপরের আঁইশ গুণে মাছের প্রজাতি শনাক্ত করা যায়।

রেচন জনন ছিদ্র বা পায়ু : মাছের দেহ শেষ হয়ে লেজ শুরু হওয়ার সীমানায় একটি ছিদ্র বিদ্যমান। এ ছিদ্রের মাধ্যমে মাছ বিপাকীয় অবশিষ্টাংশ দেহের বাইরে নির্গত করে এবং প্রজনন কার্য পরিচালনা করে থাকে। এ কারণে এ ছিদ্র রেচন জনন ছিদ্র নামে পরিচিত।

মাছের শ্রেণিবিন্যাস

অধ্যাপক সিম্পসনের মতে, শ্রেণিবিন্যাস হচ্ছে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে কোনো প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠীকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে কত গুলো স্তরে সুস্থিতভাবে সাজানোর এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বিশ্বে প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। যার মধ্যে আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির স্বাদু পানির এবং ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকের আকার, আকৃতি, বর্ণ, বাসস্থান, প্রজনন স্বভাব, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস সবই আলাদা। এক প্রজাতির মাছের সঙ্গে অন্য প্রজাতির মিল নেই বললেই চলে। বিশাল এ পরিমণ্ডলের সবগুলো মৎস্য প্রজাতির জীবন বৃত্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জানা সম্ভব নয় বিধায় বৈজ্ঞানিকগণ নামকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে নামকরণের একটি পদ্ধতি বের করেন যা দ্বিপদী নামকরণ (Binomial System of Nomenclature) নামে পরিচিত। যেখানে প্রত্যেকটি জীবের তথা মাছের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের দুটি অংশ থাকবে। প্রথম অংশ 'গন' এবং দ্বিতীয় অংশ 'প্রজাতি'। নিচে কার্পজাতীয় মাছের প্রতিনিধি হিসেবে রুই এবং সিলভার কার্প মাছের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো–

রুই মাছের শ্রেণিবিন্যাস -

পর্ব (Phylum) : কর্ডাটা (Chordata)
শ্রেণি (Class) : অষ্টিকথিস্ (Osteichthys)
বর্গ (Order) : সাইপ্রিনিফরমেস (Cypriniformes)
গোত্র (Family) : সাইপ্রিনিডি (Cyprinidae)
গন (Genus) : লেবিও (Labeo)
প্রজাতি (Species) : লেবিও রোহিতা *(L. rohita)*

সিলভার কার্প মাছের শ্রেণিবিন্যাস -

Phylum - Chordata
Class - Osteichthys
Order - Cypriniformes
Family - Cyprinidae
Genus - Hypopthalmichthys
Species - *H. molitrix*

শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে যখন পদগুলোকে (Taxa) পর্ব থেকে প্রজাতি পর্যন্ত মানের নিম্নক্রমানুসারে স্তরবিন্যাস করা হয় তখন ক্রমশই নিচের দিকে প্রজাতি সংখ্যা কমতে থাকে বলে ডান দিকে চেপে লিখতে হয় ফলে অনেকটা উল্টো ছাতার মতো দেখায়।

শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য

মাছের সুষ্ঠু এবং নিয়মতান্ত্রিক পর্যালোচনার জন্য শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে–

ক. শনাক্তকরণ;
খ. যথোপযুক্ত শ্রেণিতে মাছের প্রজাতিকে বিন্যস্ত করা;
গ. নতুন নতুন তথ্য বা জ্ঞান আহরণ করা ও
ঘ. অন্যান্য প্রাণীর সাথে মাছের জাতিগত সম্পর্ক নির্দেশ করা।

শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মাবলি

শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেসব নিয়মাবলি পালন করতে হয় তা হলো-

- বৈজ্ঞানিক নাম লেখার ক্ষেত্রে ইটালিক (Italic) হরফে অর্থাৎ বাঁকা ছাঁচের অক্ষরে মুদ্রিত হতে হবে। অর্থাৎ লিখার সময় ডান দিকে কাত করে লিখতে হবে। যেমন- Labeo rohita
- ইটালিক হরফে বা কাত করে লেখা সম্ভব না হলে ‘গন’ এবং ‘প্রজাতি’ অংশের নিচে প্রত্যেকটি অক্ষর পর্যন্ত আলাদা আলাদা ভাবে দাগ টানতে হবে। যেমন- *Labeo* *Rohita*
(গন) (প্রজাতি)
-‘গণ’ অংশের প্রথম অক্ষর ইংরেজি বড় হাতের (Capital letter) এবং প্রজাতি অংশের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের (Small letter) লিখতে হবে। যেমন- Labeo rohita
(গন) (প্রজাতি)

কার্প জাতীয় মাছ : যেসব মাছের গলবিলীয় দাঁত বিদ্যমান থাকে এদেরকে কার্প জাতীয় মাছ বলে। তবে গলবিলীয় দাঁত বিদ্যমান না থাকলেও কার্পের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি বিদ্যমান থাকলেও তাকে কার্প বলা যেতে পারে। যেমন-

- এরা সকলেই Cypriniformes বর্গের অন্তর্ভুক্ত,
- এদের Weberian ossicles নামক এক ধরণের অঙ্গ বিদ্যমান থাকে যাহা অন্তঃকর্ণ ও পটকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে;
- এদের পটকা বা বায়ু থলির মধ্যমাংশ সংকীর্ণ হয়ে দুটি অংশে পরিণত হয়;
- পার্শ্বরেখা সোজা ও সম্পূর্ণ;
- এ জাতীয় মাছের মাথায় কোন আঁইশ নেই। তবে সমস্ত শরীর ছোট, বড় ও মাঝারী আকারের গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত থাকে;
- পাখনা রশ্মি কাঁটাযুক্ত;
- মাংসপেশী অভ্যন্তরীণ কাঁটাযুক্ত;
- এদের ডিম ধারণক্ষমতা তুলনামূলক বেশি এবং এরা পোনার কোন যত্ন নেয় না;
- প্রাপ্ত বয়স্ক মাছ তৃণভোজী বলে খাদ্য হিসেবে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ পছন্দ করে।

কার্পজাতীয় মাছকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মেজর কার্প এবং মাইনর কার্প। আমাদের দেশীয় রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, ইত্যাদি প্রজাতির মাছকে অথবা অনুরূপ জৈবিক স্বভাব বা দৈহিক গঠনের কয়েক প্রজাতির বিদেশী মাছ, যেমন- সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, কমন কার্প বা কার্পিও এবং বিগহেড ইত্যাদি মাছকে মেজর কার্প বলা হয়। অপর পক্ষে আকারে ছোট অনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট মাছ, যেমন- পুঁটি, বাটা ইত্যাদি মাছ মাইনর কার্প হিসেবে পরিচিত।

ইন্ডিয়ান মেজর কার্প এবং মাইনর কার্প : যেসব মাছের জন্মস্থান এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তাদেরকে ইন্ডিয়ান মেজর কার্প বলে। ইন্ডিয়ান মেজর কার্প হিসেবে পরিচিত মাছ হলো- রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস ইত্যাদি। আকারে ছোট অনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট মাছ যেমন- পুঁটি, বাটা ইত্যাদি মাছকে ইন্ডিয়ান মাইনর কার্প বলে।

চাষযোগ্য মাছের জীবন-বৃত্তান্ত

দেশের সব প্রজাতির মাছ বদ্ধ জলাশয়ে চাষ করা যায় না। আবার চাষ করলেও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায় না। তাই মৎস্য সেক্টরে জ্ঞান আহরণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার্থে নিচে কতিপয় প্রধান প্রধান চাষযোগ্য দেশী-বিদেশী মাছের জীবন-বৃত্তান্ত দেয়া হলো।

রুই

স্থানীয় নাম : রুই বা রুহিত

বৈজ্ঞানিক নাম : Labeo Rohita

প্রাকৃতিক আবাস : বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে রুই মাছ অতি জনপ্রিয় ও স্বাদে শ্রেষ্ঠ। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় এদের সাধারণ আবাসস্থল। বর্ষাকালে প্লাবনভূমিতে ও ধানক্ষেতে এদের দেখা যায়। বর্তমানে পুকুরে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে এ প্রজাতির মাছটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পুকুর অপেক্ষা ধানক্ষেতে এদের দৈহিক বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয়ে থাকে।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : রুই মাছের দেহের আকৃতি অনেকটা মাকুর মতো। দেহ লম্বা ও দুই পাশে চাপা । মাথা ও লেজ ক্রমশ সরু। দেহের তুলনায় মাথা ছোট। গোলাকার আঁইশ দ্বারা দেহ আবৃত। তবে এদের মাথায় কোনো আঁইশ নেই। এদের মুখ প্রান্তিক এবং ঠোঁট জোড়া মোটা, নিচের ঠোঁটটি বড় এবং উপরের ঠোঁট ছোট। ঠোঁটে কোনো দাঁত নেই, তবে উপরের ঠোঁটে এক জোড়া ছোট শুড় আছে। এদের পৃষ্ঠ পাখনা বেশ লম্বা এবং পাখনায় ১৫ থেকে ১৬টি পাখনা রশ্মি আছে। পাখনার রং লালচে কালো। পুচ্ছ পাখনা গভীরভাবে বিভক্ত। পিঠের নিচের দিকের রং বাদামি তবে উদর রূপালী সাদা। রুই মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩৯২ সে. মি. এবং ওজন ৪৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পরিবেশের কোনো তারতম্য না হলে পুকুরে এদের দৈহিক বৃদ্ধি দ্বিতীয় বছর সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

চিত্র-৬ : রুই মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : এদের মুখ নিম্নমুখী ও ঠোঁট পুরু থাকায় এরা জলজ উদ্ভিদ, উদ্ভিদের নরম পাতা, পচা জলজ লতাপাতার অংশ, মাঝে মাঝে পুকুরের তলদেশ থেকে পচা জৈবিক পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ছোট অবস্থায় এর শুধু প্রাণী প্ল্যাংকটন খেয়ে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে প্রাণী প্ল্যাংকটন গ্রহণের পরিমাণ কমতে থাকে। এরা পানিতে ডুবন্ত লতাপাতা বা ডালে লেগে থাকা জৈব পদার্থ, ধানক্ষেতে ধানের গায়ে লেগে থাকা শ্যাওলা প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। তাই অনেক সময় পুকুরে মাছ চুরি ঠেকানোর জন্য পুঁতে রাখা বাঁশ বা কঞ্চিতে লেগে থাকা শ্যাওলা রুই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাধারণত এরা পানির মধ্যস্তরে বসবাস করে এবং পানির মধ্যস্তর হতে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। চাষকৃত পুকুরে পিলেট জাতীয় সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে রুই মাছের আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

প্রজনন : এ মাছ দুই বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। জুন-আগস্ট মাসে এরা প্রজনন করে থাকে। রুই মাছ সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। তবে বদ্ধ জলাশয়ে কৃত্রিমভাবে স্রোতের সৃষ্টি করলে এরা প্রজনন করে থাকে। প্রবহমান নদীতে এরা সহজেই প্রজনন করে থাকে। আধুনিক পদ্ধতিতে অতি সহজেই হ্যাচারিতে এদের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ করা যেতে পারে। এদের ডিম দেখতে গোলাকার এবং লালচে রঙের। একটি পরিপক্ক স্ত্রী রুই মাছ বছরে ৩-৪ লক্ষ ডিম দিয়ে থাকে।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম রুই মাছে ১৬.৪ গ্রাম আমিষ, ১.৪ গ্রাম চর্বি, ৬০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ২২৩ মি.গ্রা. ফসফরাস থাকে।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ : রুই মাছ ২ বছরে ২-৩ কেজি ওজনের হয়ে থাকে এবং তখনই এ মাছ আহরণ করে বাজারজাত করা যেতে পারে। খেপলা জাল, বেড়জাল, ফাঁসজাল প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজেই এ মাছ আহরণ করা যেতে পারে। তবে মৎস্য শিকারিদের জন্য ছিপ বা বড়শি দিয়ে রুই মাছ শিকার অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

কাতলা

স্থানীয় নাম : কাতলা বা কাতল

বৈজ্ঞানিক নাম : *Catla Catla*

প্রাকৃতিক আবাস : কাতলা মাছ আমাদের দেশের জনপ্রিয় মাছ। রুই মাছের মতো নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও মুক্ত জলাশয় এদের প্রাকৃতিক আবাস। বর্ষাকালে এদেরকে ধান ক্ষেতে পাওয়া যায়। বদ্ধ পানিতেও এরা বাস করতে পারে বলে সারা দেশে চাষযোগ্য সব পুকুর-দিঘিতে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ হিসেবে চাষ করা হয়ে থাকে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমাদের দেশের বাইরে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও মায়ানমার কাতলা মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : কাতলা মাছের মাথা দেহের তুলনায় বড়, দেহ চওড়া ও দুই পাশে চ্যাপ্টা, মুখ প্রান্তিক, ঊর্ধ্বমুখী ও বেশ বড়। ঠোঁটে কোন দাঁত নেই। উপরের চোয়াল নিচের চোয়ালের চেয়ে ছোট। প্রশস্ত কানকো দ্বারা ফুলকা প্রকোষ্ঠ ঢাকা এবং সারা শরীর বড় বড় গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। তবে এদের মাথায় কোনো আঁইশ নেই। মাথার পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত দুই পাশে দুটি পার্শ্বরেখা থাকে। কাতলা মাছের পিঠের

মাঝখানে প্রশস্ত পৃষ্ঠ পাখনা, বিভক্ত পুচ্ছ পাখনা, পায়ু পাখনা এবং জোড়া বক্ষ পাখনা ও শ্রোণী পাখনা বিদ্যমান। পৃষ্ঠ পাখনায় ১৭-২০টি পাখনা রশ্মি থাকে। কাতলা মাছের রং পিঠের দিকে কালচে বা ধূসর কিন্তু পেটের দিকে সাদা। কাতলা মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১৮০ সে.মি. এবং ওজন ৪৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং প্রয়োজনীয় খাবার পেলে এক বছরে ৪ কেজি এবং দুই বছরে ১০ কেজি পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে।

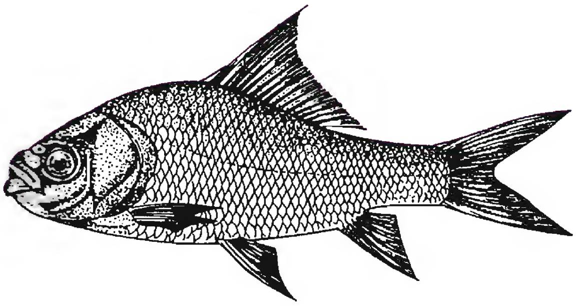

চিত্র-৭ : কাতলা মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : কাতলা মাছ পুকুরের উপরের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের মুখের উপরের চোয়াল ছোট হওয়ায় পানির উপরের স্তরের খাদ্য সহজেই এরা গ্রহণ করতে পারে। এরা সাধারণত সর্বভুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে প্রানী প্ল্যাংকটন অপেক্ষা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন বেশি পছন্দ করে থাকে। ছোট অবস্থায় এরা পানিতে ভাসমান উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও প্রানী প্ল্যাংকটন খায়। বড় কাতলা শ্যাওলা, পচা জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এরা সাধারণত রাতে আহার করে না। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশেষ করে বিকেলে খাদ্য গ্রহণ করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকে। এদের মুখের গড়ন সম্পূরক খাদ্য গ্রহণের জন্য ততবেশি উপযোগী নয়। ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য এদের খাদ্য তালিকায় সম্পূরক খাদ্যের পরিবর্তে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাধান্য বেশি দেয়া দরকার।

প্রজনন : কাতলা মাছ বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। প্রবহমান নদী ও মুক্ত জলাশয়ে এরা প্রজনন করে থাকে। সাধারণত মে মাস হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত বিভিন্ন নদ-নদীর নব্য প্লাবিত অগভীর অংশে কাতলা মাছ প্রজনন করে। এরা তৃতীয় বছরে প্রজননক্ষম হয় এবং বছরে একবারই ডিম দেয়। এদের ডিমগুলো ভাসমান বা আঠালোও নয়। এদের ডিমের রং হালকা লাল। ব্যাস ৪.৫ মি.মি. থেকে ৫.৫ মি.মি.। প্রজনন মৌসুম ব্যতিত পুরুষ ও স্ত্রী কাতলা মাছ শনাক্তকরণ বেশ কঠিন। প্রজনন মৌসুমে ভারী ও মোটা পেট দেখে স্ত্রী মাছ সহজেই চেনা যায়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে ডিম সংগ্রহ করে অথবা কৃত্রিম উপায়ে হরমোন ইনজেকশন দিয়েও কাতলা মাছের পোনা উৎপন্ন করা যায়।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম কাতলা মাছে ১৬.৪ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম চর্বি, ৫১৪ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম ও ২১৪ মি. গ্রাম ফসফরাস পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ : সাধারণত বেড় জাল দিয়ে সহজেই কাতলা মাছ আহরণ করা যায়। তবে ঝাঁকি জাল, ভেসাল জাল প্রভৃতি দ্বারা পুকুর বা নদ-নদী হতে অতি সহজেই এ মাছ আহরণ করা যায়। ছিপ দিয়েও মাঝে মাঝে কাতলা মাছ ধরা পড়ে। বাজারে বড় কাতলা মাছের চাহিদা বেশি বিধায় দু'বছর বয়সেই কাতলা মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ করা উচিত।

মৃগেল

স্থানীয় নাম : মৃগেল বা মিরকা

বৈজ্ঞানিক নাম : Cirrhinus Mrigala

প্রাকৃতিক আবাস : মৃগেল মাছ স্বাদুপানির নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় প্রভৃতি জলাশয়ে পানির নিচের স্তরে বসবাস করে। এদের প্রাকৃতিক আবাস বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। আমাদের দেশে পুকুর-দিঘিতে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে রুই-কাতলার সাথে মৃগেল মাছ ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ধানক্ষেতে এ মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। এরা কর্দমাক্ত জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করতে পছন্দ করে বিধায় পুরাতন পুকুরে এদের বৃদ্ধি নতুন পুকুরের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

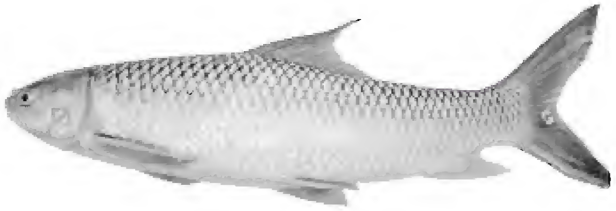

চিত্র-৮ : মৃগেল মাছ

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : মৃগেল মাছ লম্বাটে, দেহ পার্শ্বদেশে সামান্য চাপা, দেহের তুলনায় মাথা খুবই ছোট। এদের মুখ প্রান্তিক ও নিম্নমুখী। ঠোঁটে কোনো দাঁত নেই এবং ঠোঁট দুটি পাতলা। প্রশস্ত পৃষ্ঠ পাখনা, ছোট পায়ু পাখনা, দ্বিখণ্ডিত পুচ্ছ পাখনা এবং জোড়া বক্ষ ও শ্রোণী পাখনা বিদ্যমান। এদের পৃষ্ঠ পাখনায় ১৫-১৬টি পাখনা রশ্মি বিদ্যমান। এদের দেহ মাঝারি গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। ছোট মাছ সাদা বা রূপালী রংঙের তবে পাখনাগুলো দেখতে লালচে রঙের। মাছ বড় হলে পিঠের দিকে ধূসর হয় ও দুপাশ ও পেট রূপালি রঙের হয়। এ মাছের চোখ দেখতে সোনালী রঙের। সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১০০ সে.মি. এবং ওজন ১৩ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : মৃগেল মাছ জলাশয়ের নিচের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের মুখ ও ঠোঁট দুটো পাতলা হওয়ার কারণে অতি সহজেই তলদেশ হতে পচা-গলা জৈব পদার্থ, উদ্ভিদের পচা অংশ, কাদার ভিতরে বসবাসকারী ছোট ছোট বেনথোস, উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা বাছাই করে খাওয়ার মতো ফুলকা রশ্মি থাকায় এরা জলাশয় থেকে প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য বাছাই করে খেতে পারে।

পুকুরের তলদেশে কাদার মধ্যে বিদ্যমান খাদ্যকণা খুঁজে খায় বলে মৃগেল মাছে কখনও কখনও কাদার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ফলে অনেকে মৃগেল মাছ খেতে পছন্দ করে না। মৃগেল মাছ রুই কাতলার তুলনায় ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত প্রথম বছরে এরা গড়ে ২৫০-৩৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। তাই এক বছরের কম বয়সের মৃগেল মাছ ধরা ও বাজারজাত করা উচিত নয়। পুকুরে চাষের সময় এরা সম্পূরক খাবার, যেমন- খৈল, কুঁড়া, ভুসি মিশ্রিত বল বা পিলেট খাবার খেতে বেশ পছন্দ করে এবং এ খাদ্য গ্রহণে বৃদ্ধিও আশানুরূপ হয়ে থাকে।

প্রজনন : রুই ও কাতলার মতো মৃগেল মাছও বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। নদ-নদী ও মুক্ত জলাশয়ে এরা

প্রজনন করে থাকে। সাধারণত দুই বছর বয়সে মৃগেল মাছ প্রজননক্ষম হয়। মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মৃগেল মাছ প্রজনন করে থাকে। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বর্ষাকালে সদ্য প্লাবিত অগভীর এলাকায় এরা প্রজনন করতে চলে আসে। হ্যাচারিতে খুব সহজেই হরমোন ইনজেকশান দ্বারা কৃত্রিমভাবে প্রজনন করানো যায়। এদের ডিম আঠালো বা ভাসমান নয়। ডিমের ব্যাস ৫.৫ মি.মি.।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম মৃগেল মাছে ১৯.৫ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম চর্বি, ৩৩৫ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৩৮২ মি.গ্রা. ফসফরাস বিদ্যমান থাকে।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ । সব ধরনের জাল দিয়ে মৃগেল মাছ আহরণ করা যায়। তবে তলদেশে বসবাসকারী মাছ হিসেবে বেশি কাদাযুক্ত জলাশয়ে মৃগেল মাছ বেড় জালে খুব একটা বেশি ধরা পড়ে না। কারণ এরা সহজে কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়, ফলে জালে আটকায় না। জাল দেহের উপর দিয়ে চলে যায়। তবে মৃগেল মাছ বড়শি দ্বারা আহরণ করা সহজ। মৃগেল মাছের বয়স যখন কমপক্ষে এক বছর হবে তখনই তা বাজারজাত করা উচিত।

কালিবাউস

স্থানীয় নাম : কালিবাউস বা বাউস

বৈজ্ঞানিক নাম : *Labeo Calbasu*

প্রাকৃতিক আবাস : বাংলাদেশসহ ভারতের নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল এদের আবাসস্থল। বদ্ধ পানি অপেক্ষা প্রবহমান পানি এদের জন্য বিশেষ উপযোগী। এরা সাধারণত জলাশয়ের কর্দমাক্ত তলদেশ পছন্দ করে। রুই-কাতলা মাছের সাথে পুকুরে এ মাছ চাষ করা যায়।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলী : কালিবাউস মাছের দেহের রং পিঠের দিকে ঘন কাল এবং পেটের দিকে ক্রমশ ধূসর সাদা। দেহের তুলনায় মাথা ছোট। এদের চোখ লাল রঙের, মুখ প্রান্তিক ও নিম্নমুখী, ঠোঁট কিছুটা ফুলক। ঠোঁটের উপরে ও নিচে দুই জোড়া ছোট কাল রঙের স্পর্শী বা গোঁফ আছে যার একটি আর একটি অপেক্ষা একটু বড়। এদের দেহ মাঝারি ধরনের, কিছুটা গোলাকার। এদের পৃষ্ঠ পাখনায় ১৬-১৮টি পাখনা রশ্মি বিদ্যমান থাকে এবং পুচ্ছ পাখনা গভীরভাবে বিখন্ডিত। এদের বৃদ্ধির হার অন্যান্য মাছের তুলনায় কম। এদের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৯২ সে.মি. এবং ওজন ৯ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সাধারণভাবে প্রাপ্ত বেশির ভাগ মাছ ২০-৩০ সে.মি. এবং ১.০ - ১.৫ কেজি হতে দেখা যায়। দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত। দেহের দুই পাশে পার্শ্বরেখা থাকে।

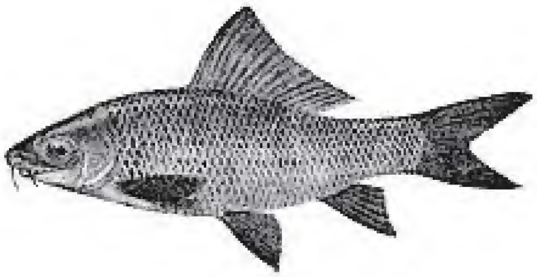

চিত্র-৯ : কালিবাউস মাছ

খাদ্য ও খাদ্যভ্যাস : কালিবাউস মাছ পানির নিচের স্তরে বসবাস করে এবং এদের মুখ নিম্নমুখী বলে তলদেশে বিদ্যমান খাদ্য সহজে গ্রহণ করে থাকে। পোনা অবস্থায় এরা এককোষী শ্যাওলা, পচা ও আধাপচা জলজ উদ্ভিদ ও কীটপতঙ্গ খায়। পরিণত বয়সে পচা ও আধাপচা জলজ উদ্ভিদ খায়। জলাশয়ের তলদেশে কাদার মধ্যে যেসব পোকামাকড় বা বিভিন্ন শুককীট থাকে যাদেরকে বেনথোজ বলে। কালিবাউস মাছ বেনথোজ খেতে খুব বেশি পছন্দ করে।

প্রজনন : মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে নদ-নদীর প্রবহমান পানিতে কালিবাউস মাছ প্রজনন করে। সাধারণত দুই বছর বয়সে এরা প্রজননক্ষম হয়। বর্ষার নতুন প্লাবিত অগভীর অঞ্চলে প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ প্রজননের জন্য উঠে আসে। স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ার পর পুরুষ মাছ ডিমকে বাহ্যিকভাবে নিষিক্ত করে। এদের ডিম ভাসমান নয়। ডিমের রঙ ঈষৎ নীল। ডিমের ব্যাস ৩ মি.মি. থেকে ৪ মি.মি.। হ্যাচারিতে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করে কালিবাউস মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণুপোনা উৎপাদন করা হয় ।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম কালিবাউস মাছে আমিষ ১৫.৫ গ্রাম, চর্বি ০.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৩৫ মি.গ্রা. এবং ফসফরাস ৩৮২ মি.গ্রা. পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ : বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে এ মাছ আহরণ করা যায়। এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল নয় বলে প্রথম বছর এ মাছ আহরণ না করাই ভালো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এ মাছ আহরণ ও বাজারজাত করা যেতে পারে।

বিদেশী মাছ

দেশে বর্তমানে চাষ করা হয় এমন অনেক মাছের আদি নিবাসস্থল আমাদের দেশ নয়। দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় এসব মাছকে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। মাছগুলো দ্রুত বর্ধনশীল এবং আমাদের দেশে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যম পোনা উৎপাদন করা হয়। এ মাছগুলো দেশীয় পরিবেশে খাপ খেয়ে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশ থেকে আনা এরূপ মাছকে বিদেশী মাছ (Exotic Fish) বলে। যেমন-সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, কমন কার্প বা কার্পিও এবং বিগহেড ইত্যাদি বিদেশী মাছ।

সিলভার কার্প

স্থানীয় নাম : সিলভার কার্প

বৈজ্ঞানিক নাম : *Hypopthalmichthys Molitrix*

প্রাকৃতিক আবাস : সিলভার কার্প মাছের আদি বাসস্থান চীন দেশের ইয়াংসি নদীতে। ১৯৬৩ সালে স্বাদুপানির মাৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, চাঁদপুর প্রথম এ মাছটি বিদেশ থেকে আমদানি করে। বর্তমানে চীন, রাশিয়া ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পুকুরে চাষ উপযোগী মাছ হিসেবে এ মাছ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের দেশের রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের মতো এরা নদীতে ও পুকুরে উভয় স্থানেই বসবাস করতে পারে। তবে নদীর চেয়ে পুকুরে এদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। দ্রুত বর্ধনশীল মাছ হিসেবে রুই-কাতলা মাছের সাথে সিলভার কার্পের মিশ্রচাষ করা হয়।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : সিলভার কার্প দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মতো বলে অনেকে এ মাছটিকে পুকুরের ইলিশ নামে অভিহিত করে থাকেন। তবে মাথা ইলিশের তুলনায় একটু বড়। এদের মুখ প্রান্তিক, নিচের ঠোঁট সামান্য বাড়ানো। দেহ দুই পাশে চাপা, মাথা ও লেজের দিক সরু পেটের দিক পিঠের চেয়ে উজ্জ্বল। এদের পুরা দেহ ছোট ছোট রূপালী আঁইশ দ্বারা আবৃত। পিঠের দিকের রঙ গাঢ় ধাতব রঙের, তবে অন্যান্য অংশে রূপালী রঙের। এদের পৃষ্ঠ পাখনায় ১০টি পাখনা রশ্মি আছে। সিলভার কার্প ভাল ব্যবস্থাপনায় চাষ করলে বছরে ২ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ২০ কেজি ওজনের সিলভার কার্প পাওয়া গেছে।

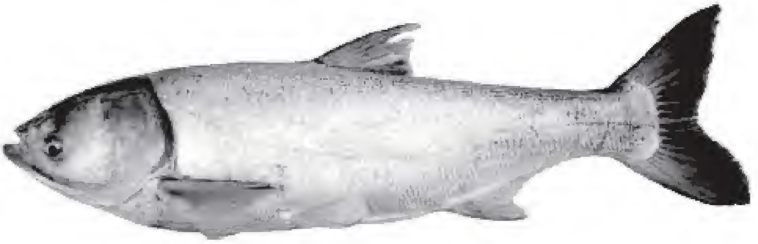

চিত্র-১০ : সিলভার কার্প

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : সিলভার কার্প প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে পানির উপরের স্তরের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আবার বাহির থেকে সরবরাহকৃত খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। ছোট অবস্থায় এরা ক্ষুদ্র শৈবাল খায় এবং বড় হলে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, পচা জলজ উদ্ভিদ, উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ খেয়ে থাকে। সিলভার কার্পের অন্ত্র দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ৮-১০ গুণ লম্বা হয়ে থাকে এবং এদের ফুলকায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক ফুলকা রশ্মি রয়েছে বিধায় এরা অধিক পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এরা পানিতে ভাসমান প্ল্যাংকটন ফুলকার সাহায্যে ছেঁকে খেতে সক্ষম বিধায় যেসব জলাশয়ে অধিক পরিমাণে প্ল্যাংকটন জন্মানোর কারণে পানির রঙ ঘনসবুজ দেখায়, বা সবুজ আস্তর পড়ে, সেসব জলাশয়ে সিলভার কার্প মজুদ করে ভালো ফল পাওয়া যায়। জলাশয়ের অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও শ্যাওলা বৃদ্ধির কারণে যে Algal bloom সৃষ্টি হয় তা নিয়ন্ত্রণে সিলভার কার্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু এ মাছ Algal bloom নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তথা পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রাখতে সহায়তা করে, তাই এ মাছকে পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপক বলে। এরা পানির উপরিভাগের খাদ্য গ্রহণ করে বলে অনেক সময় কাতলার সঙ্গে খাদ্যজনিত প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, ফলে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে কাতলার আশানুরূপ ফলন নাও পাওয়া যেতে পারে।

প্রজনন : সিলভার কার্প মাছ দ্বিতীয় বছরে প্রজননক্ষম হয়। এরা বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। হ্যাচারিতে কৃত্রিম উপায়ে হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে এদের প্রজনন করানো হয়। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এ মাছ প্রজনন করে থাকে।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম সিলভার কার্প মাছে আমিষ ২০ গ্রাম, চর্বি ১.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৫০ মি.গ্রা. এবং ফসফরাস ৩৮২ মি.গ্রা. পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ : উপরের স্তরের মাছ হওয়ায় সিলভার কার্প আহরণ খুবই সহজ। বেড় জাল, ঝাঁকি জাল ইত্যাদি দিয়ে অতি সহজেই পুকুর হতে সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করা যায়। বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভার

কার্প মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। প্রথম বছর গড়ে ১.৫ কেজি এবং দ্বিতীয় বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য পরে বৃদ্ধির এ হার কমে যায়। তাই সিলভার কার্পের বয়স যখন এক থেকে দেড় বছর হবে তখনই সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করে বাজারজাত করা ভালো।

বিগহেড

স্থানীয় নাম : বিগহেড

বৈজ্ঞানিক নাম : *Aristichthys Nobilis*

প্রাকৃতিক আবাস : বিগহেড মাছের আদি বাসস্থান চীন দেশ। ১৯৮১ সালে নেপাল থেকে এ মাছটি আমাদের দেশে আনা হয়। এ মাছ সিলভার কার্পের চেয়েও দ্রুত বর্ধনশীল। এ মাছ পুকুর খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি জলাশয়ে পানির উপরিস্তরে বাস করে থাকে।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : বিগহেড নামের অর্থই হলো বড় মাথাওয়ালা মাছ। অর্থাৎ দেহের তুলনায় মাথা অনেক বড়। ঠোঁট সরু এবং খাট, চোখ ছোট এবং মাথার মধ্যস্থলে শরীরের পার্শ্বরেখা বরাবর অবস্থিত। ফুলকা রশ্মি ঘন এবং স্পঞ্জ এর মত নরম নয়। দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ দ্বারা আবৃত। পিঠের দিকের রং হালকা কালচে, মাঝে মাঝে বৃত্তাকার হলুদ ও কালো দাগ দেখা যায়। গলবিলে এক সারি দাঁত বিদ্যমান। এ মাছ অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল। চাষের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করলে এক বছরে এ মাছ ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। সর্বোচ্চ ৪০ কেজি পর্যন্ত এ মাছ পাওয়া গেছে।

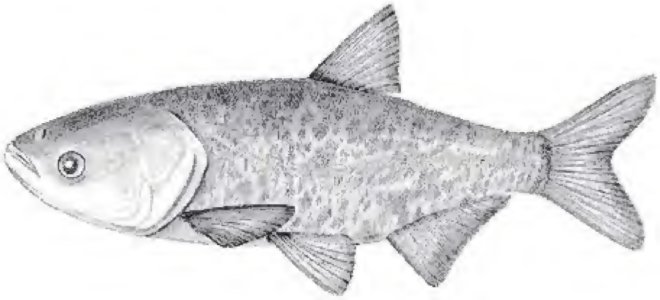

চিত্র-১১ : বিগহেড

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : বিগহেড পানির উপরের স্তরের খাদ্য খেয়ে থাকে। এরা মূলত প্রাণী প্ল্যাংকটন ভোজী, এদের ফুলকায় বিদ্যমান ফুলকা রশ্মি খুব ঘনভাবে সাজানো থাকে বিধায় সহজে পানি থেকে প্রাণী প্ল্যাংকটন ছেঁকে খেতে পারে। প্রাণী প্ল্যাংকটনের মধ্যে রোটিফার, নপ্লিয়াস, কপিপড প্রভৃতি প্রধান। সরবরাহকৃত খাদ্যের মধ্যে চালের কুঁড়া, খৈল, পচা জলজ উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ প্রভৃতি খেয়ে থাকে। এদের অন্ত্র দেহের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ লম্বা। এরা কাতলার সাথে খাবার ও বাসস্থানের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা করে। তাই একই পুকুরে একই সঙ্গে, একই আকারের কাতলা ও বিগহেডের পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। ভালো ফল পেতে হলে অবশ্যই বিগহেডের তুলনায় বড় সাইজের কাতলার পোনা মজুদ করতে হবে।

প্রজনন : বিগহেড মাছ বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে এদের প্রজনন ঘটানো হয়। সাধারণত মে হতে জুলাই মাস পর্যন্ত বিগহেড মাছের কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়ে থাকে। স্ত্রী বিগহেড ৩ বছর বয়সে এবং পুরুষ বিগহেড ২ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রাম বিগহেড মাছে আমিষ ২০ গ্রাম, চর্বি ১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪৭০ মি.গ্রা. এবং ফসফরাস ২৪২ মি.গ্রা. পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ : উপরের স্তরের মাছ হিসেবে খুব সহজেই বেড় জাল, ঝাঁকি জাল প্রভৃতি দ্বারা এ মাছ আহরণ করা যেতে পারে। এ মাছ এক বছর হতে দেড় বছরের মধ্যেই বাজারজাত করা যেতে পারে। কারণ এ সময়ে মাছের ওজন দেড় কেজি হতে আড়াই কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গ্রাসকার্প

স্থানীয় নাম : গ্রাসকার্প বা ঘেসো রুই

বৈজ্ঞানিক নাম : *Ctenopharyngodon Idella*

প্রাকৃতিক আবাস : গ্রাসকার্পের আদি বাসস্থান চীন দেশ এবং রাশিয়াতে। চীন, হংকং এবং রাশিয়ার আমুর নদীতে এ মাছ পাওয়া যায়। ১৯৫৯ সালে হংকং থেকে এ মাছ আমাদের দেশে আনা হয়। গ্রাসকার্প মাছ জলজ আগাছাকে দ্রুত আমিষে রূপান্তরিত করতে সক্ষম বিধায় জলাশয়ের জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে গ্রাসকার্প মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ মাছ অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল এবং শক্ত গড়নের। সুস্বাদু, দ্রুত বর্ধনশীল এবং চাষকালীন সময়ে উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সাথে এ মাছের মিশ্রচাষ করা হয়।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : গ্রাসকার্প মাছের দেহ মোটামুটি নলাকার। মাথা উপরের দিক থেকে কিছুটা চাপা, পৃষ্ঠদেশ সোজা পেটের দিকে মোটা ও ঝুলে পড়া। ঘাস খাওয়ার কারণে এদের অন্ত্র বেশ লম্বা হয় অর্থাৎ মাছের দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ লম্বা হয়। এদের মুখ প্রান্তিক, নিচের ঠোঁট সামান্য ছোট, এদের মুখ গহ্বর বা গলবিলে চিরুনির দাঁতের মত তীক্ষ্ণ দুই সারি দাঁত আছে। ফলে অতিসহজেই জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে।

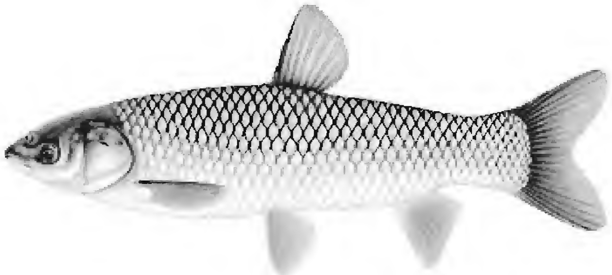

চিত্র-১২ : গ্রাসকার্প মাছ

শরীর বড় বড় গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। শরীরের রং পেটের দিকে রূপালি সাদা ও পিঠের দিকে কালচে ধূসর। এদের পৃষ্ঠপাখনায় ১০টি পাখনা রশ্মি আছে। প্রচুর ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ খেতে পেলে এরা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বছরে ৩-৪ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। গ্রাসকার্প সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : গ্রাসকার্পের নামকরণই এদের খাদ্যাভ্যাস বলে দেয় অর্থাৎ এরা ঘাস খেকো মাছ। ছোট অবস্থায় উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, শৈবাল ও ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। বড় হলে ঘাস, লতাপাতা, নরম

জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি এরা খেয়ে থাকে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ক্ষুদিপানা, টোপাপানা, কচুরিপানার নরম অংশ প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। পুকুরে গ্রাসকার্পের খাদ্যের অভাব হলে পুকুর পাড়ের ঝুলন্ত কলাপাতা লাফিয়ে খেতে দেখা যায়। এরা প্রতিদিন এদের শরীরের ওজনের দ্বিগুণ পরিমাণ ঘাস খেতে পারে।

প্রজনন : গ্রাসকার্প মাছ দুই বছর বয়সে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়েও এদের পরিপক্বতা আসে তবে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এরা বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। জুন-জুলাই মাসে হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে হ্যাচারিতে গ্রাসকার্পের কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়।

পুষ্টিমান : প্রতি ১০০ গ্রামে ১৯.৫ গ্রাম আমিষ, ১.১ গ্রাম চর্বি, ১.১ গ্রাম লৌহজাত উপাদান থাকে। এ ছাড়াও ৩৩৫ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ৩৮২ মি. গ্রা. ফসফরাস পাওয়া যায়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ : বেড় জাল, ঝাঁকি জাল, ফাঁস জাল প্রভৃতি দ্বারা গ্রাসকার্প মাছ আহরণ করা যেতে পারে। স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় গ্রাসকার্প মাছ চাষ করলে বছরে ২ থেকে ৩ কেজি ওজনের মাছ পাওয়া যেতে পারে।

থাই সরপুঁটি

স্থানীয় নাম : থাই সরপুঁটি বা রাজপুঁটি

বৈজ্ঞানিক নাম : *Puntius Gonionatus*

প্রাকৃতিক আবাস : থাই সরপুঁটি ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়। খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ে পানির উপরিস্তরে এ মাছটি বাস করে। দ্রুত বর্ধনশীল, সহজ ব্যবস্থাপনায় চাষযোগ্য এবং সুস্বাদু মাছ হিসেবে আমাদের দেশে এ মাছটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ছোট ছোট মৌসুমি পুকুরে চাষের জন্য থাই সরপুঁটি অত্যন্ত উপযোগী মাছ। প্রতিকূল পরিবেশ অর্থাৎ কম অক্সিজেন, বেশি তাপমাত্রা ও ঘোলা পানিতে চাষের জন্য থাই সরপুঁটি বিশেষ উপযোগী।

দেহের বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যাবলি : থাই সরপুঁটি দেখতে অনেকটা দেশী সরপুঁটির ন্যায়। তবে দেশী সরপুঁটির শরীর যতটা পুরু থাই সরপুঁটি সে তুলনায় পাতলা, এদের মুখ দেশী সরপুঁটির চেয়ে অনেকটা ভোঁতা। এদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল রূপালী। তবে পিঠের দিকের রঙ হালকা ধূসর। এ মাছের পৃষ্ঠ পাখনার পাখনা রশ্মি কাঁটাযুক্ত এবং খাঁজ কাটা। ফলে জালটানার সময় পৃষ্ঠ পাখনায় জালের সুতা আটকে গেলে মাছ সহজে ছাড়া পায় না।

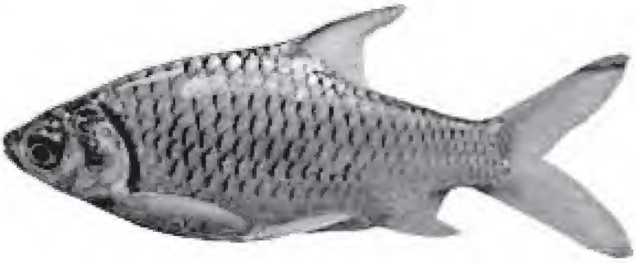

চিত্র-১৩ । থাই সরপুঁটি

এদের দেহ বড় বড় গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত ও মুখ গহ্বরে তিন সারি দাঁত বিদ্যমান। এদের অন্ননালী শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় দুই-তিন গুণ লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণত এক বছরে থাই সরপুঁটি ২৫০-৪০০ গ্রাম ওজনের হতে পারে। সর্বোচ্চ ১.৫ কেজি পর্যন্ত এ মাছ পাওয়া গেছে। এদের কোন পাকস্থলী নেই। তাই অন্ননালীর মধ্যেই খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : থাই সরপুঁটি সর্বভুক প্রকৃতির মাছ। তাই মাছের খাদ্যরূপে পরিচিত যে কোনো ধরনের খাবারই রাজপুঁটি খেতে পারে। রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শ্যাওলা এবং প্রাণি প্ল্যাংকটন গ্রহণ করে। পরিণত বয়সে এরা বড় ধরনের জলজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, গমের ভুসি প্রভৃতি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হলো ক্ষুদিপানা বা ডাকউইড। সম্পূরক খাদ্য পেলে এ মাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে।

প্রজনন : থাই সরপুঁটি মাছ এক বছর বয়সেই যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। এরা সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। তবে কোনো কারণে পুকুরে স্রোতের সৃষ্টি হলে অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টি হলে অনেক সময় বাড়ি-ঘর বা উঠানের পানি, পাড় নিচু থাকলে মাঠ থেকে পানি পুকুরে ঢুকে পড়ে এবং পুকুরে প্রজননক্ষম মাছ থাকে তাহলে অনেক সময় এরা পুকুরে প্রজনন করে। তবে অধিকাংশ সময় কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে এ মাছের প্রজনন করে পোনা উৎপাদন করা হয়। সাধারণত এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এ মাছ প্রজনন করে থাকে।

পুষ্টিমান : ১০০ গ্রাম সরপুঁটি মাছে ১৯ গ্রাম আমিষ, ২ গ্রাম চর্বি ও ১৫০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম এবং ৯৯০ মি.গ্রা. ফসফরাস পাওয়া যায়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : এ মাছ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। ৫-৬ মাস লালন-পালন করলে এ মাছ গড়ে ১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের হয়। তখন বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে এ মাছ আহরণ করে বাজারজাতকরণ করা যেতে পারে।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে কত প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়?
২. মাছের দেহকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. মাছের কানকো যে নরম পর্দা দ্বারা ফুলকা প্রকোষ্ঠকে বন্ধ করতে সহায়তা করে তাকে কী বলে?
৪. চিরুনি আকৃতির আঁইশ কোন মাছে দেখা যায়?
৫. সিলভার কার্প মাছের আদি নিবাস কোন দেশ?
৬. বিগহেডের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য দেহের তুলনায় কত বড়?
৭. গ্রাসকার্প মাছ প্রতিদিন কি পরিমাণ ঘাস খেতে পারে?
৮. ঘোলা পানিতে চাষ উপযোগী একটি মাছের নাম লিখ?
৯. দুটো ইন্ডিয়ান মেজর কার্প মাছের নাম লেখ।
১০. রুই মাছ কত বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পার্শ্বরেখা মাছের কি কাজে লাগে?
২. শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মাবলি লেখ।
৩. ফুলকার কাজ কী?
৪. Cat Fish কাকে বলে?
৫. দ্বিপদী নামকরণ বলতে কী বুঝ?
৬. শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কী?
৭. সিলভার কার্পের খাদ্যাভ্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৮. সিলভার কার্প মাছকে পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপক বলা হয় কেন?
৯. বিগহেড মাছের দেহাকৃতির বিবরণ দাও।
১০. গ্রাসকার্প মাছ কোন মাসে প্রজনন করে?
১১. কার্প জাতীয় মাছের বৈশিষ্ট্যাবলি লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রাসকার্প মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস এবং আহরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. থাই সরপুঁটি মাছের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মাছচাষে প্রতিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব

প্রতিবেশ বলতে কোনো স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝায়। একটি স্থানের প্রতিবেশ হলো সে স্থানের আলো, বাতাস, মাটি, পানি, তাপমাত্রা প্রভৃতি যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। প্রতিবেশ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যথা- জলজ প্রতিবেশ, স্থলজ প্রতিবেশ, মরুজ প্রতিবেশ ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ইত্যাদি। নিচে জলজ প্রতিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

জলজ প্রতিবেশ

পানিতে বিদ্যমান জৈব উপাদান যেমন- মাছ, পোকামাকড়, উদ্ভিদ, শ্যাওলা, প্ল্যাংকটন, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি এবং পারিপার্শ্বিক অজৈব উপাদান যেমন- আলো, তাপমাত্রা, মাটি, পানি ও মাটিতে বিদ্যমান নানা প্রকার পদার্থের সমন্বয়ে জলজ প্রতিবেশ গঠিত। জলজ প্রতিবেশ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন–

ক. স্বাদু পানির প্রতিবেশ;
খ. লোনা পানির প্রতিবেশ ও
গ. মোহনার প্রতিবেশ।

ক. স্বাদু পানির প্রতিবেশ

যে পানিতে লবণাক্ততা নেই বা সামান্য পরিমাণে আছে অর্থাৎ শূন্য (০) পিপিটি থেকে ০.৫ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততা থাকে তাকে স্বাদু পানি বলা হয়। স্বাদু পানিতে বিদ্যমান জৈব ও অজৈব উপাদানের সমন্বয়ে স্বাদু পানির প্রতিবেশ গঠিত। স্বাদু পানির প্রতিবেশ দুই প্রকারের হতে পারে। যথা–

১. স্রোতহীন পানির প্রতিবেশ : যে জলজ প্রতিবেশের পানি স্থির থাকে তাকে স্রোতহীন পানির প্রতিবেশ বলে। যেমন- পুকুর, দিঘি, হ্রদ, বাঁওড় ইত্যাদি।

২. স্রোতশীল পানির প্রতিবেশ : যে জলজ প্রতিবেশে স্রোত থাকে তাকে স্রোতশীল পানির প্রতিবেশ বলে। যেমন- নদ-নদী, ঝর্ণা ইত্যাদি।

খ. লোনা পানির প্রতিবেশ

যে পানিতে লবণাক্ততা ৫.০ পিপিটি থেকে ৩০.০ পিপিটি বা তার চেয়ে বেশি থাকে তাকে লোনা বা লবণাক্ত পানি বলে। লোনা পানিতে বিদ্যমান জৈব উপাদান ও অজৈব উপাদানের সমন্বয়ে লোনা পানির প্রতিবেশ গঠিত হয়।

গ. মোহনার প্রতিবেশ

নদী ও সমুদ্রের সংযোগ স্থলকে মোহনা বলে। মোহনা হলো এমন পানির অঞ্চল যেখানে নদীর পানি সাগরের পানির সাথে মিশে সাগরের পানিকে অধিকতর তরল করে। মোহনার পানি আধা লবণাক্ত প্রকৃতির, যার মাত্রা ০.৫ পিপিটি থেকে ৫.০ পিপিটি পর্যন্ত। মোহনাকে বাফার জোন বলা হয়। অর্থাৎ নদ-নদীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদান মোহনায় এসে মিলিত হয় বলে মোহনায় মাছের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরি হয়। তাই মোহনায় মাছসহ বিভিন্ন জীবের আধিক্য বেশি থাকে।

ইকোসিষ্টেম (Ecosystem) বা বাস্তুসংস্থান

প্রকৃতিতে জৈব ও অজৈব পরিবেশ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি থেকে আরেকটি আলাদা করা যায় না। প্রকৃতির কোন স্থান যেখানে জৈব ও অজৈব পদার্থ বিদ্যমান থেকে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এক অংশ থেকে আরেকাংশে (অজৈব থেকে জৈব এবং জৈব থেকে অজৈব অংশে) বস্তুর আদান-প্রদান ঘটায় তাকেই ইকোসিষ্টেম বা বাস্তুসংস্থান বলে। ইকোলজিক্যাল পদ্ধতির দুইটি অংশ আছে। একটিকে স্বতঃপুষ্ট বা Autotrophic অপরটিকে পরঃপুষ্ট বা Heterotrophic বলে। যারা সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে সরল অজৈব পদার্থ থেকে জটিল জৈবিক পদার্থ প্রস্তুত করে এরাই স্বতঃপুষ্ট।

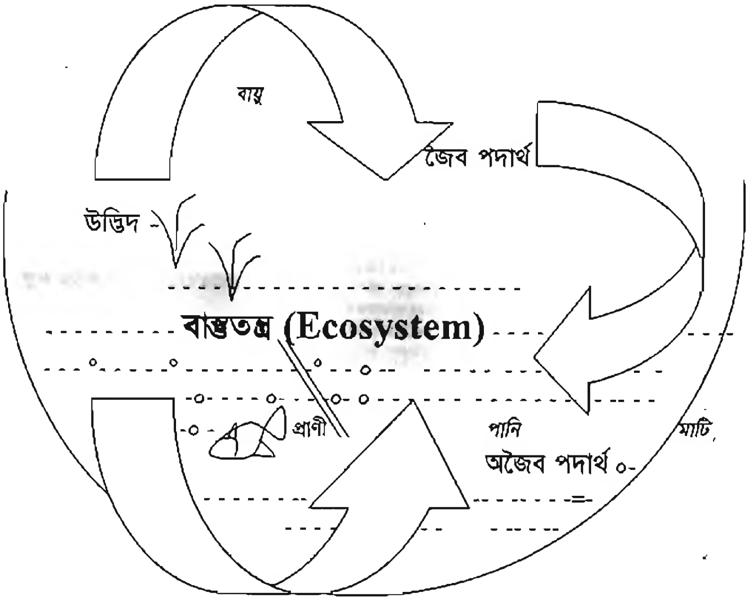

চিত্র-১৪ : ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান

যেমন- সব সবুজ উদ্ভিদ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আবার যারা সরল অজৈব পদার্থ থেকে জটিল জৈব পদার্থ তৈরি করতে পারে না, বা নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না তারাই পরঃপুষ্ট। যেমন- সমস্ত প্রাণিকূল, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা শুধু সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক তৈরিকৃত খাদ্যসমূহকে সদ্ব্যবহার করে, পুনঃবিন্যাস করে এবং পচায়। অর্থাৎ ইকোসিস্টেম চলতে হলে অবশ্যই তা অজৈব রূপ থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে জৈব রূপে যেতে হবে এবং তা আবার ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা পচে জৈব রূপ থেকে অজৈব রূপে ফিরে আসতে হবে। উপরের ১৪ নং চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো।

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থানে ৪টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো-

১. জৈব ও অজৈব পদাথ;
২. উৎপাদনকারী;
৩. গ্রাহক বা ভক্ষক এবং
৪. পচনকারী।

১. জৈব ও অজৈব পদার্থ

পানি, কার্বনডাই-অক্সিইড (CO_2), অক্সিজেন (O_2), ক্যালসিয়াম (Ca), নাইট্রোজেন (N_2) ফসফরাস (P) জাতীয় লবণ, অ্যামাইনো এসিড, হিউমিক এসিড ইত্যাদি অজৈব ও জৈব বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

২. উৎপাদনকারী : সবুজ উদ্ভিদকুল এ দলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এরা সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে সরল অজৈব পদার্থ থেকে জটিল জৈব পদার্থ প্রস্তুত করতে সক্ষম।

৩. গ্রাহক বা ভক্ষক : সমস্ত প্রাণিকুল এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে। যেমন- হরিণ ঘাস খায় আবার বাঘ হরিণ খায়। এখানে হরিণ প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাঘ হরিণ খায় বলে পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

৪. পচনকারী : ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক এ দলে পড়ে। মৃতজীবকে ভেঙে এরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। ফলে জীবের জটিল জৈবিক উপাদানসমূহ ভেঙে সরল উপাদানে বা অজৈব উপাদানে রূপান্তরিত হয়। এর ফলেই মৃতজীব পচে জীবের মূল উপাদানসমূহ আবার পরিবেশে ফিরে আসে।

পুকুর কেন একটি বাস্তুসংস্থান

একটি বাস্তুসংস্থানে জৈব ও অজৈব বস্তুসমূহ, উৎপাদনকারী, গ্রহীতা এবং পচনকারী বিদ্যমান থাকে। পুকুর একটি বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম হিসেবে কল্পনা করলে সেখানে দেখা যায় যে, অজৈব ও জৈব বস্তু হিসেবে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদানসমূহ, যেমন- ক্যালসিয়াম, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, অ্যামাইনো এসিড প্রভৃতি বিদ্যমান রয়েছে। উৎপাদনকারী হিসেবে রয়েছে ক্লোরোফিলধারী সবুজ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন। উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে। প্রাণিকুল, তথা মাছ আবার এসব খাদ্যকণা বা প্ল্যাংকটন ভক্ষণ করছে। ফলে পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদানসমূহ খাদ্যের মাধ্যমে মাছের দেহে সংশ্লেষিত হচ্ছে। মাছের তথা জীবকূলের মৃত্যুর পরে এসব পুষ্টি উপাদানসমূহ আবার পচন-কারী জীবের মাধ্যমে পচে মাটি বা পানিতে মিশে যাচ্ছে যা পরবর্তীতে আবার বিভিন্ন ধরনের সবুজ উদ্ভিদ তথা প্রাণী গ্রহণ করছে। এভাবে পুকুরে যেহেতু জৈব ভৌত রাসায়নিক চক্রের (Bio-geo-chemical Cycle) মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানসমূহ তথা রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ প্রতিনিয়ত ঘুরছে বলে পুকুরকে একটি বাস্তুসংস্থান বলা হয়। যা পাশের ১৫ নং চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

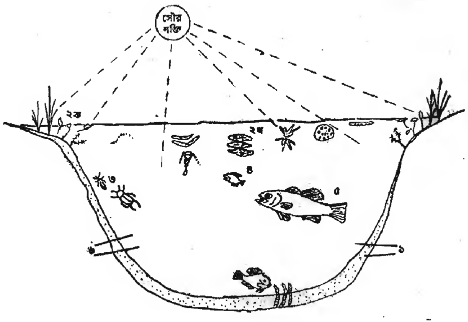

চিত্র-১৫ : পুকুরের ইকোলজি পদ্ধতি

খাদ্য শিকল

পুকুরে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে। এসব উদ্ভিদ, উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, শ্যাওলা প্রভৃতির ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ অংশ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে। এজন্য এদেরকে প্রাথমিক উৎপাদক বলা হয়। পুকুরে উৎপাদিত এসব উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনকে প্রাণি প্ল্যাংকটন ও অন্যান্য প্রাণীতে খায়। এসব প্রাণী ও প্রাণী প্ল্যাংকটনকে বলা হয় প্রাথমিক ভোক্তা। প্রানী প্ল্যাংকটন ও প্রাথমিক ভোক্তা দলের অন্যান্য প্রাণীকে খেয়ে বেঁচে থাকে আরেক ধরনের মাছ বা প্রাণী। এদেরকে ২য় শ্রেণির ভোক্তা বলা হয়। এভাবে ২য় শ্রেণির ভোক্তাকে আবার খেয়ে ফেলে তৃতীয় শ্রেণির ভোক্তা। এ প্রক্রিয়ায় শক্তি উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয়। প্রাথমিক উৎপাদক থেকে শুরু করে ভক্ষণ এবং পুনঃভক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদক থেকে সে খাদ্য শক্তি উদ্ভিদ ভক্ষণকারী প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ভক্ষণ ও পুনঃভক্ষণের মাধ্যমে মাংশাসী প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয়। অবশেষে সর্বশেষ প্রাণী-টির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্থানান্তর প্রক্রিয়া থেমে যায়। খাদ্য শক্তির উৎস উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শক্তি প্রবাহের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হলো খাদ্য শিকল। অন্যভাবে বলা যায় খাদ্য শক্তির এ প্রবাহের সাথে জড়িত সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যের জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতার এ প্রক্রিয়াকে খাদ্য শিকল বলে। এখানে উল্লেখ্য যে একটি খাদ্য স্তর থেকে অন্য খাদ্য স্তরে শক্তি স্থানান্তরের সময় মোট শক্তির প্রায় ৯০% শক্তি অপচয় হয়। মাত্র ১০% শক্তি কাজে লাগে। তাই খাদ্য স্তর যত ছোট হবে তত বেশি প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যাবে। নিচে একটি স্তর থেকে কীভাবে অন্য স্তরে শক্তি স্থানান্তরিত হয় তা দেখানো হলো।

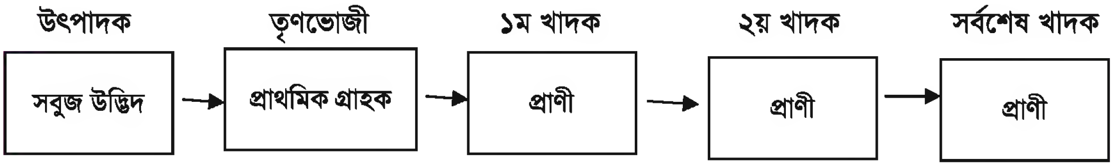

চিত্র-১৬ : খাদ্য শিকল

খাদ্য শিকলের প্রকারভেদ

খাদ্য শিকল বা খাদ্য চক্র তিন ধরনের হয়। যেমন–

১. প্রোডিওসার খাদ্য শিকল;
২. প্যারাসাইটিক খাদ্য শিকল;
৩. স্যাফ্রোফাইটিক খাদ্য শিকল।

১. প্রোডিওসার খাদ্য শিকল

এর আরম্ভ উদ্ভিদ থেকে এবং স্তর বাড়ার সাথে সাথে জীবের আকার বড় হতে থাকে। যেমন-
শ্যাওলা ⟶ পুঁটি ⟶ বোয়াল ⟶ মানুষ। অর্থাৎ খাদ্য ক্ষুদ্র থাকে খাদক বড় হয়।

২. প্যারাসাইটিক খাদ্য শিকল

এর আরম্ভ উদ্ভিদ বা প্রাণী যে কোনো জীব থেকে হতে পারে। এখানে চক্রের আরম্ভ বৃহত্তর জীব থেকে এবং শেষ হয় ক্ষুদ্রতর জীবে। যেমন–
মানুষ ⟶ ক্রিমি অথবা গরু ⟶ উকুন ইত্যাদি।

৩. স্যাপ্রোফাইটিক খাদ্য শিকল

এর আরম্ভ মৃত জীবে এবং শেষ হয় অণুজীবে। যেমন- মৃত প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক।

খাদ্য জালিকা

খাদ্যশক্তির উৎস উদ্ভিদকে বিভিন্ন জীবে ভক্ষণ করে এবং ঐ সব জীবকুল আবার অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়ে খাদ্য শক্তির হস্তান্তর ঘটায় একেই খাদ্য শিকল বা খাদ্যচক্র বলে। প্রতিটি খাদ্য শিকল ইকোসিস্টেমে একক বা আলাদাভাবে বিরাজ করে না। খাদ্য শিকলগুলো নানাভাবে একে অন্যের সাথে জড়িত। ফলে খাদ্য-শিকল একটি বা একাধিক জালের মতো নেটওয়ার্ক তৈরি করে। খাদ্য শিকলসমূহের মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক এ যুক্তির ধরনকেই (Inter Looking Pattern) খাদ্য জালিকা বলে।

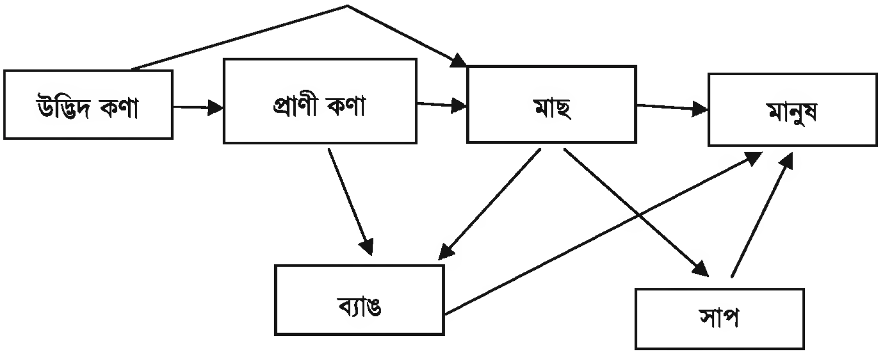

চিত্র-১৭ : খাদ্য জালিকা

খাদ্য পিরামিড

খাদ্য শিকলের মাধ্যমে খাদ্য শক্তি স্থানান্তরের সময় প্রায় বেশিরভাগ খাদ্য শক্তি নষ্ট হয়। ফলে উৎপাদনে যে খাদ্য শক্তি সঞ্চিত হয় খাদ্যশক্তি স্থানান্তরের সময় পরবর্তী ভক্ষক খাদ্য স্তরে তার অনেক কম খাদ্যশক্তিপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যশক্তি যতবারই স্থানান্তরিত হয় ততই খাদ্য শক্তির পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে খাদ্য শিকলের শেষ মাথার দিকে খুবই কম খাদ্যশক্তি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টি চিত্রে অঙ্কন করলে “পিরামিড” এর আকৃতি নেয় বলে একে খাদ্য পিরামিড বলে।

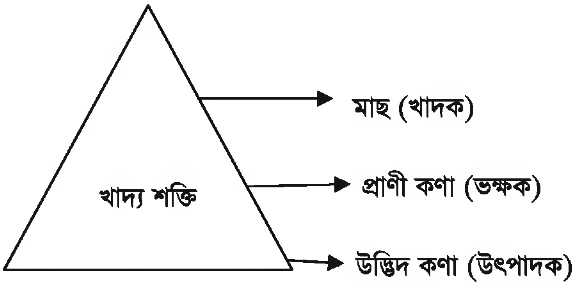

চিত্র-১৮ : খাদ্য পিরামিড

প্রতিবেশের জীবকুল

জৈব উৎপাদনের জীবকুল পুকুরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে। এসব জীবকে এদের অবস্থান অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ভাসমান জীবকুল,
২. তলদেশের জীবকুল, এবং
৩. জলজ উদ্ভিদকুল

১. ভাসমান জীবকুল

ভাসমান জীবকূলের মধ্যে প্ল্যাংকটন অন্যতম। প্ল্যাংকটন হলো এক ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী বা উদ্ভিদ জাতীয় অণুজীব। এসব অণুজীব পানিতে ভাসমান বা ঝুলন্ত অবস্থায় উপযুক্ত পরিবেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যমান থাকে এবং পানির প্রাথমিক উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিগত দিক থেকে প্ল্যাংকটনকে মূলত: দুই ভাগে ভাগ করা যায়–

ক. উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, ও
খ. প্রাণী প্ল্যাংকটন

ক. উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন : এ জাতীয় প্ল্যাংকটনের উদাহরণ হলো- স্পাইরোগাইরা, নেভিকুলা, অ্যানাবেনা, ফেকাস, সিনেডেসমাস ইত্যাদি।

খ. প্রাণি প্ল্যাংকটন : এ জাতীয় প্ল্যাংকটনের উদাহরণ হলো- ড্যাফনিয়া, সাইক্লপস, রোটিফেরা, ময়না, ফিলিনিয়া ইত্যাদি।

মাছচাষে ভাসমান জীবকুলের প্রভাব : মাছচাষে ভাসমান জীবকুল তথা প্ল্যাংকটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চাষযোগ্য অনেক মাছ আছে যারা খাদ্য ও পুষ্টির জন্য সরাসরি উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের ওপর নির্ভরশীল। যেমন- সিলভার কার্প মাছ। আবার এমন কিছু মাছ আছে যারা মূলত প্রাণী প্ল্যাংকটনের ওপর নির্ভরশীল। যেমন- বিগহেড, কাতলা প্রভৃতি। প্ল্যাংকটন শুধু মাছের খাদ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এমন কিছু কিছু প্ল্যাংকটন আছে যারা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে। যেমন- ব্লু-গ্রীন অ্যালজি। তবে পুকুরে এদের আধিক্য খুব বেশি থাকলে এক সময় সেগুলো পচে গিয়ে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই পানিতে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ বিশেষ করে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের পরিমাণ প্রয়োজনীয় সীমার মধ্যে রাখা উচিত। এর জন্য পরিমাণ মতো সার প্রয়োগ করা দরকার। কোনো ক্রমেই মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

২. তলদেশের জীবকুল

পুকুরের পানির তলদেশে কাদার উপরিভাগে বা কাদার মধ্যে বসবাসকারী জীবকুল কে বেন্থোজ (Benthose) বলে। যেমন- কাইরোনোমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি এ স্তরের প্রাণী।

মাছচাষে তলদেশের জীবকুলের প্রভাব : তলদেশীয় জীবকূল বা বেন্থোজ মাছচাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন- মৃগেল, কমন কার্প, মিরর কার্প, ব্ল্যাক কার্প, শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ পুকুরের তলদেশের খাদ্য খেয়ে থাকে। যেসব পুকুরের গভীরতা ৬ ফুটের কম ঐ সমস্ত পুকুরে বেশি পরিমাণে বেন্থোজ জন্মায় পক্ষান্তরে ৬ ফুটের বেশি গভীরতা সম্পন্ন পুকুরে এসব প্রাণী কম পরিমাণে জন্মায়। বেন্থোজ জাতীয়

প্রাণী পুকুরের তলা থেকে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সহায়তা করে যা প্ল্যাংকটন উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে পুকুরে শামুক ও ঝিনুক বেশি পরিমাণে থাকলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস কমে যায় বা মাছ ও চিংড়ির হাড়, খোলস নরম হয়ে যায়, ফলে বৃদ্ধি ব্যহত হয়। পুকুরে নিয়মিত জৈব সার প্রয়োগ করে তলদেশের প্রাণীর পুষ্টি ত্বরান্বিত করা যায়। পুকুর প্রস্তুতির সময় তলদেশে হালচাষ করে জৈব সার ও খৈল মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলে বেন্থোজ জাতীয় প্রাণিকুলের উৎপাদন ভালো হয়।

৩. পুকুরের প্রতিবেশে বিভিন্ন প্রকারের জলজ উদ্ভিদ ও শ্যাওলা থাকে। সচরাচর পুকুরে প্রাপ্ত জলজ উদ্ভিদকে নিচে বর্ণিত উপায়ে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. শ্যাওলা জাতীয়, যথা- স্পাইরোগাইরা, ইউগ্লিনা ইত্যাদি;
খ. অর্ধডুবন্ত উদ্ভিদ, যথা - শাপলা, পানিফল ইত্যাদি;
গ. ভাসমান উদ্ভিদ, যথা- কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি;
ঘ. নির্গমনশীল উদ্ভিদ, যথা - আড়াইল, বিষকাটালী ইত্যাদি;
ঙ. লতানো জলজ উদ্ভিদ, যথা - কলমিলতা, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।

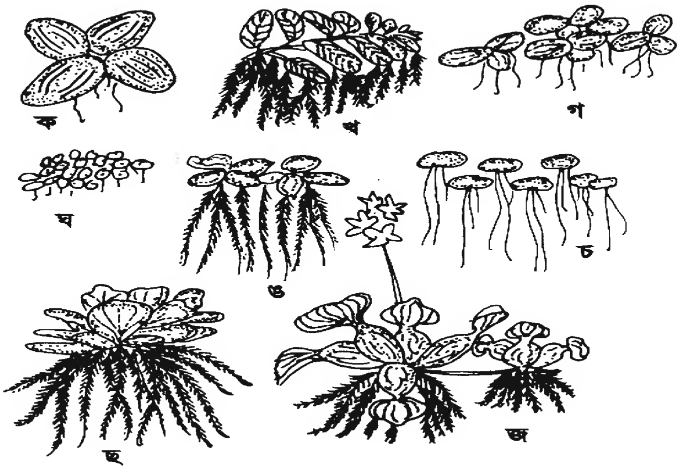

চিত্র-১৯ : জলজ উদ্ভিদকুল

মাছচাষে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব : অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ মাছচাষের জন্য ক্ষতিকর। কেবলমাত্র এককোষী শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের পরিমিত পরিমাণ উপস্থিতি মাছচাষের জন্য ভালো। অন্যান্য সকল প্রকার জলজ উদ্ভিদ পানি ও মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন উৎপাদন ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদের নরম অংশ মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাইড্রিলা, ভ্যালিসনেরিয়া জাতীয় উদ্ভিদ গ্রাসকার্প মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার অ্যাজোলা ও ক্ষুদিপানা সরপুঁটি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুষ্টি গ্রহণ ছাড়াও জলজ উদ্ভিদ পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা প্রদান করে ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু এবং রাক্ষুসে প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। ফলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন তথা মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অগভীর পুকুরে সূর্যালোকের হাত থেকে মাছকে রক্ষার উদ্দেশ্য অল্প সময়ের জন্য সীমিত সংখ্যক লতানো জলজ উদ্ভিদ, যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা প্রভৃতি রাখা যেতে পারে।

প্রতিবেশের ভৌত ও রাসায়নিক নিয়ামক : জলজ প্রতিবেশের মাধ্যম হচ্ছে পানি। আর পানিকে ধারণ করে থাকে মাটি। মাটির গুণাগুণের ওপর তাই পানির গুণাগুণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রতিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার পর মাটিতে স্থিত হয়। জীবকূলের মৃত্যুর পর পচনক্রিয়ার ফলে দেহাবশেষ বিভিন্ন মৌলিক বা যৌগিক উপাদান হিসেবে মাটিতে মিশে যায়। জীবকুলের পরবর্তী বংশধরদের বিকাশের প্রয়োজনে ঐসব উপাদান পুনঃচক্রায়িত হয়ে জীব উপাদানসমূহের কাজে লাগে। মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকা, খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক নিয়ামকসমূহের অনুকূল মাত্রা রয়েছে। নিচে মাছচাষের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এমন ভৌত ও রাসায়নিক নিয়ামকসমূহের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

মাছচাষে প্রভাব বিস্তারকারী ভৌত নিয়ামকসমূহ

মাছচাষে প্রভাব বিস্তার করে প্রতিবেশের এমন ভৌত নিয়ামক সমূহ হলো–

ক. পানির বর্ণ বা রং
খ. পানির স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব
গ. আলো
ঘ. তাপমাত্রা ও
ঙ. পানির গভীরতা

ক. পানির বর্ণ : পানির নিজস্ব কোন বর্ণ বা রঙ নেই। পানিতে যখন যে পদার্থের আধিক্য বেশি থাকে তখন পানি সে রঙ ধারণ করে। যেমন- পানিতে সবুজ কণিকা বা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন বেশি থাকলে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের বর্ণ সবুজ বিধায় পানি সবুজ বর্ণ ধারণ করে। আবার ফসফরাসের পরিমাণ কম থাকলে পানি কালচে রঙ ধারণ করে। হলুদাভ রঙের পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম থাকে। পানি যদি খুব বেশি স্বচ্ছ হয় তাহলেও সে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাবার অনুপস্থিত। আবার পানি যদি খুব বেশি সবুজ হয় তাহলেও সে পানিতে অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন বিদ্যমান থাকে বিধায় এটাও মাছচাষের জন্য তত বেশি উপযোগী নয়। মাছচাষের জন্য উপযোগী পানির বর্ণ হলো হালকা সবুজ অথবা বাদামি। সেকিডিস্ক রিডিং ১ ফুট বা ৩০ সে.মি.পর্যন্ত মাছচাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

খ. পানির স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব : পানিতে ভাসমান কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে থাকলে পানি অস্বচ্ছ দেখায়। আবার পানিতে অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের উৎপাদনের ফলেও পানির স্বচ্ছতা কমে যেতে পারে। ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী কণিকাসমূহের আধিক্যের কারণেও পানি ঘোলা হতে পারে। এঁটেল ও লাল মাটির পুকুরের পানিতে অতি সূক্ষ্ম মাটির কণা ভাসমান থাকে বলে প্রায় সময়ই এ ধরনের পুকুরের পানি ঘোলা থাকে। ঘোলা পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে সূর্যালোকের অভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী কণিকাসমূহ মাছের ফুলকায় আটকে গিয়ে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে মাছ ঘোলা পানিতে বসবাস করলে ফুলকা পচে যেতে পারে। ঘোলাত্ব দূরীকরণে শতাংশপ্রতি ১ কেজি চুন অথবা জিপসাম ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার অনেক সময় কচুরিপানা, খড়ের আটি, ডালপালা প্রভৃতি সাময়িক সময়ের জন্য পুকুরে রেখেও অনেক সময় ঘোলাত্ব দূর করা যেতে পারে। এছাড়া নিয়মিত গোবর গুলিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করেও ঘোলাত্ব দূর করা যেতে পারে। একটি আদর্শ পুকুরের পানির স্বচ্ছতার সহনীয় পরিমাপ হলো ১ ফুট বা ৩০ সেন্টিমিটার।

গ. আলো : পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোকের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলজ পরিবেশে বিদ্যমান সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষনের জন্য প্রায় ১ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করা প্রয়োজন। এ জন্য সমগ্র

পুকুরের কমপক্ষে ৫০% জায়গায় দৈনিক অন্তত ৮ ঘণ্টা সূর্যের আলো পড়া প্রয়োজন। সূর্যালোকের অভাবে সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য বা প্ল্যাংকটন তৈরি হবে না। পুকুরের যে গভীরতা পর্যন্ত কার্যকরী সূর্যালোক (কমপক্ষে ১%) পৌঁছায় সেই গভীরতা পর্যন্ত অঞ্চলকে ফোটিক জোন (Photic Zone) বা আলোকিত অঞ্চল বলে।

ঘ. তাপমাত্রা : জলজ পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো তাপমাত্রা। মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী বিধায় তাপমাত্রার সাথে বিপাকীয় কার্যক্রমের সরাসরি একটি সম্পর্ক রয়েছে। তাপমাত্রা বাড়লে মাছের বিপাকীয় কার্যক্রমের হার বেড়ে যায় ফলে খাদ্য চাহিদাও বেড়ে যায়। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত প্রতি ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাছের খাদ্য চাহিদা ১০% বৃদ্ধি পায়। যথাযথ তাপমাত্রায় অধিক খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে হজমক্রিয়া ও পাচকরস নিঃসরণে কম সময় ব্যয় হয়। ফলে অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় তাই মাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। এ জন্য শীতকালে খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। পানির তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে গেলে কার্পজাতীয় মাছ এবং ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে গেলে তেলাপিয়া মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। কার্পজাতীয় মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অনুকূল তাপমাত্রা হলো ২৫ ডিগ্রী হতে ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তাই কোনো কারণে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বা কমে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। পুকুরের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাহির থেকে ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করে বা সাময়িক সময়ের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করে পুকুরের পানির অতিরিক্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ'জন্য টোপা পানা, কচুরিপানা বা কলমিলতা দ্বারা সাময়িক সময়ের জন্য পুকুরের আয়তনের ১০% স্থানে ছায়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ. পানির গভীরতা : পানির গভীরতার ওপর উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। পানির গভীরতা খুব কম হলে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে সকল প্রকার মাছের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্থান বিদ্যমান থাকে না। আবার পানির গভীরতা কম থাকে বলে মাছের চলাফেরার সময় পাখনা দ্বারা তলদেশের মাটি এবং পানি আন্দোলিত হয়। ফলে পানি সবসময় ঘোলা থাকে। অল্প গভীর এবং ঘোলাত্বের কারণে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। আবার পানি ঘোলা হলে পানির ঘনত্ব বেড়ে যায়। ফলে স্বচ্ছ পানির চেয়ে ঘোলা পানিতে চলাফেরার সময় মাছের অনেক বেশি শক্তি ব্যয় হয়। এ ধরনের ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী পুকুরে কোনো ক্রমেই পর্যাপ্ত পরিমাণ চুন ব্যবহার করেও পানির ঘোলাত্ব দূর করা যায় না। আবার পানি যদি খুব বেশি গভীর হয় তাহলেও পুকুরের তলদেশ পর্যন্ত প্রকৃত সূর্যালোক পৌঁছাবে না ফলে সালোকসংশ্লেষণের অভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে না। আবার অধিক গভীরতা সম্পন্ন পুকুরে পচনকারী জীবের কর্মতৎপরতা কম থাকে বলে জৈব ভৌত রাসায়নিক চক্র ঠিকমতো সম্পন্ন হয় না। তাই তলদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ মাটি থেকে পানিতে মিশতে পারে না বিধায় ঐ ধরনের পুকুর তত বেশি উর্বর হয় না। গভীরতার সাথে পানির চাপেরও একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গভীরতা যত বেশি হবে পানির চাপ ততই বেড়ে যাবে। তাই পুকুরের পানির গভীরতা যদি খুব বেশি হয় এবং সেসব পুকুরে রেণুপোনা লালন-পালন করা হয় তাহলে পানির চাপের ফলে অনেক পোনা মারা যায় বা অতিরিক্ত চাপের কারণে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মাছকে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায়। একটি আদর্শ নার্সারি পুকুরের গভীরতা ৩ ফুট এবং মজুদ পুকুরের গভীরতা ৬ ফুট।

পুকুরের পানির স্তরবিন্যাস ও মাছচাষে এর প্রভাব

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের পুকুর, দিঘি বা হ্রদের পানির উপরিস্তর সূর্যালোকের প্রভাবে গরম হয়ে যায়। কিন্তু তলদেশের পানি ঠাণ্ডা থাকে। ফলে দুই পানির মধ্যবর্তী একটি স্তর সৃষ্টি হয় এ স্তরটিকে বলা হয় থার্মোক্লাইন। যে সব পুকুরের গভীরতা কমপক্ষে ২ মিটারের বেশি সেসব পুকুরে এ স্তরটি দেখা যায়। থার্মোক্লাইনের নিচের স্তরটিকে বলে হাইপোলিমনিয়ন (Hypolimnion) এবং উপরের স্তর যেখানে কার্যকরভাবে সূর্যালোক প্রবেশ করে এ স্তরটিকে বলে ইপিলিমনিয়ন (Epilimnion)। ইপিলিমনিয়ন ও থার্মোক্লাইন অঞ্চলের আওতাভুক্ত পাড়ের অঞ্চলকে লিটোরাল (Litoral) অঞ্চল বলে। এ অঞ্চলে মাছের জন্য প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয়। হাইপোলিমনিয়নের নিচের স্তরে থাকে প্রোফাউন্ডাল (Profoundal) অঞ্চল। এ অঞ্চলে সূর্যালোক প্রবেশ করেনা ফলে এ অঞ্চলের কোনো পুষ্টি উপাদান সহজে পানিতে মিশতে পারে না।

মাছচাষে প্রভাব : ইপিলিমনিয়ন ও থার্মোক্লাইন অঞ্চল মাছের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। থার্মোক্লাইন অঞ্চলের নিচে মাছের জন্য তুলনামূলকভাবে কম খাদ্য তৈরি হয় এবং অক্সিজেনের মাত্রাও অনেক কম থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ বার্ষিক পুকুরের পানির গড় গভীরতা ৪-৬ ফুটের মধ্যে ফলে পুকুরগুলোতে সাধারণত হাইপোলিমনিয়ন স্তর দেখা যায় না।

মাছচাষে প্রভাব বিস্তারকারী রাসায়নিক নিয়ামকসমূহ

মাছচাষে প্রভাব বিস্তার করে প্রতিবেশের এমন রাসায়নিক নিয়ামকসমূহ হলো -

ক. দ্রবীভূত অক্সিজেন
খ. দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ. পিএইচ
ঘ. মোট ক্ষারত্ব
ঙ. মোট খরতা
চ. খরতা
ছ. নাইট্রোজেন
জ. অ্যামোনিয়া
ঝ. হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি।

ক. দ্রবীভূত অক্সিজেন : অন্যান্য জীবের ন্যায় জীবন ধারণের নিমিত্ত মাছের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো অক্সিজেন। তবে অধিকাংশ মাছ (ব্যতিক্রম কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি) মানুষের ন্যায় বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না বিধায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনই তাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং তাপমাত্রা মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণিদের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য পানিতে বিভিন্ন মাত্রায় দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। তবে সব প্রজাতির জন্য গড়ে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমপক্ষে ৫ মিলিগ্রাম/লিটার হলে মাছের জন্য সবচেয়ে ভাল। পানিতে এ অক্সিজেনের মাত্রা ২ মিলিগ্রাম/লিটারের কম হলে কার্পজাতীয় মাছের স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যহত হয়। অক্সিজেনের মাত্রা উল্লেখিত মানের চেয়ে কম হলে মাছের বিপাকীয় কার্যক্রম কমে যায়। ফলে মাছ কম খাদ্য গ্রহণ করে এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায়।

খ. দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড : মাছের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের পাশাপাশি দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইডও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। আবার মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পানির অম্লত্ব বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলেও পানির অম্লত্বের কারণে মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ও

চাহিদা হ্রাস পায়। পানিতে ২ মিলিগ্রাম/লিটার মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ মাছচাষের জন্য সবচেয়ে ভালো।

গ. পিএইচ (P^H) মান : পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপকই হচ্ছে পিএইচ। পিএইচ ৭ এর কম হলে সে পানি অম্লীয়, ৭ এর বেশি হলে সে পানি ক্ষারীয় এবং পি এইচ ৭ হলো নিরপেক্ষ পিএইচ। মাছচাষের ক্ষেত্রে এ পিএইচ মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিএইচ মান ৯.৫ এর বেশি হলে সে পানিতে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকতে পারে না বিধায় সালোকসংশ্লেষণ ব্যবহৃত হয় এবং পানিতে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। আবার পিএইচ মান যদি ৪ এর নিচে নেমে আসে তাহলেও মাছ মারা যেতে পারে। কারণ এ অবস্থায় মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায়, বৃদ্ধি কমে যায়। পিএইচ মান ৭.০-৭.৫ এর মধ্যে থাকলে ফসফরাস সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত মাছচাষের জন্য মৃদু ক্ষারীয় পানি (পিএইচ ৭.৫- ৮.৫) সবচেয়ে ভালো। পিএইচ মান অনুকূল অবস্থায় বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন অনুসারে মাঝে মাঝে চুন অথবা জিয়োলাইট প্রয়োগ করা দরকার।

ঘ. মোট ক্ষারত্ব (Total Alkalinity) : পানির মোট ক্ষারত্ব ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের কার্বোনেট বা বাই-কার্বোনেট হিসেবে পরিমাপ করা হয়। পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা মোট ক্ষারত্বের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পানিতে মোট ক্ষারত্বের পরিমাণ বেশি হলে বা অনুকূলে হলে পিএইচ খুব দ্রুত ওঠানামা করতে পারে না, যা মাছচাষের জন্য ভালো। মাছচাষের জন্য পানির মোট ক্ষারত্বের কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পরিমাণ হলো ৭০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। পুকুরের পানিতে মোট ক্ষারত্বের পরিমাণ কমে গেলে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে এ মাত্রা বাড়ানো যায়।

ঙ. মোট খরতা (Total Hardness) : সাধারণত খরতা হলো ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের পরিমাপক। যা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। পানির খরতা ২০ মিলিগ্রাম/লিটারের কম হলে পানির বাফার ক্রিয়া (Buffer action) নষ্ট হয়ে যায় এবং মাছের জন্য তা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। ভালো জলাশয়ের খরতা ৪০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার এর মধ্যে হওয়া উচিত। পুকুরের পানিতে মোট খরতার পরিমাণ কমে গেলে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে এ মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। তবে মোট ক্ষারত্বকে অপরিবর্তিত রেখে মোট খরতা বাড়াতে চাইলে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে জিপসাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

চ. খরতা (Hardness) : এর দ্বারা পানিতে দ্রবীভূত ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম লবণসমূহের মাত্রা বুঝা যায়। মাছচাষের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়ের খরতা ৮০-১০০ মিলিগ্রাম/লিটার -এর মধ্যে হওয়া উচিত। খরতা কম হলে মাছ মারা যায় না তবে তা রোগ সৃষ্টিতে সহায়ক।

ছ. নাইট্রোজেন : নাইট্রোজেন উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের মৌল পুষ্টি উপাদান। আমিষ সংশ্লেষণের উপকরণ হিসেবে নাইট্রোজেন জলজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নাইট্রোজেন উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন কে ঘন সবুজ রাখতে সহায়তা করে। পরিমিত নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তথা বৃদ্ধি বা সংখ্যাধিক্য ত্বরান্বিত হয়, যা মাছচাষের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পানিতে ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার (মাটিতে ৮-১০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি) নাইট্রোজেন মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। প্রাকৃতিক পানিতে নাইট্রোজেন সাধারণত পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না বিধায় মাটিতে বা পানিতে নাইট্রোজেনের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। পানির স্বচ্ছতা ৩০

সেন্টিমিটার বা ১ ফুটের বেশি হলে সাধারণত প্রতি একর পুকুরে ২০ কেজি হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে।

জ. অ্যামোনিয়া : মাছচাষে ক্ষতিকর যেসব গ্যাস রয়েছে তার মধ্যে অ্যামোনিয়া অন্যতম। অবিয়োজিত অ্যামোনিয়া (NH^3) মাছের জন্য বিষাক্ত কিন্তু অ্যামোনিয়াম আয়ন ($NH4^+$) বিষাক্ত নয়। পানিতে যদি দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে অবিয়োজিত অ্যামোনিয়ার বিষাক্ততা বেড়ে যায়। পানিতে অবিয়োজিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.০২৫ মিলিগ্রাম/লিটার হলে তা মাছ চাষের জন্য ভাল। কিন্তু ০.৪ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি হলে সাধারণত মাছ মারা যায়। পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি হলে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে তা কমানো যায়। বর্তমানে অ্যামোনিয়া দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

ঝ. হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) : অবিয়োজিত হাইড্রোজেন সালফাইড মাছের জন্য খুবই বিষাক্ত। পানির তলদেশে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব পদার্থের পচনের ফলে হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয়। পঁচা ডিমের ন্যায় গন্ধ দ্বারা এ গ্যাসের উপস্থিতি অতি সহজেই বুঝা যায়। পুকুরের পানির জন্য হাইড্রোজেন সালফাইডের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা হলো ০.০০৩ মিলিগ্রাম/ লিটারের কম। কোনো কারণে পুকুরে এ গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে পুকুরের তলদেশে হড়রা টেনে এ গ্যাস দূর করা যায়।

মাছচাষে প্রভাব বিস্তারকারী মাটি ও পানির বিভিন্ন গুণাগুণের নাম, অনুকূল মাত্রা এবং সমাধানে করণীয়

একটি জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা তার মাটি ও পানির গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। মাছচাষে ভালো ফল পেতে হলে পুকুরের মাটি ও পানির গুণাবলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। মাছ পানিতে বসবাস করে এবং পানি থেকেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আবার মাটি হচ্ছে পানি সংরক্ষণের আধার অর্থাৎ পানির খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা সরাসরি মাটির গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে মাছচাষ করতে হলে মাটি ও পানির বিভিন্ন গুণাগুণের অনুকূল মাত্রা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। নিচে মাছচাষের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এমন পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণের নাম এবং অনুকূল মাত্রা দেয়া হলো–

গুণাগুণের নাম	অনুকূল মাত্রা	সমাধানে করণীয়
মাটির প্রকৃতি	দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী, এর পরে এটেল মাটি। বেলে মাটির পুকুর মাছচাষে ততবেশি উপযোগী নয়।	বেলে মাটির পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈবসার (গোবর) প্রয়োগ করে মাছচাষের উপযোগী করা যেতে পারে।
পাড়ের অবস্থা	মূল ভূমি হতে কমপক্ষে ২ ফুট উঁচু হতে হবে।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে মাটি কেটে পাড় উঁচু করা যেতে পারে।
পাড়ে গাছপালার অবস্থান	পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে অথবা নির্দিষ্ট ঋতুতে পাতা ঝড়ে যায় এমন কোন গাছপালা না থাকাই ভালো।	গাছপালা থাকলে অবশ্যই নিয়মিতভাবে ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।
পাড়ের ঢাল এবং বকচর	এটেল মাটির পুকুরে ১ঃ১.৫ এবং দো-আঁশ মাটির পুকুরে ১ঃ২ ঢাল থাকতে হবে। ঢালের পরে ৫ ফুট বকচর থাকলে ভালো হয়।	নতুন পুকুর খননের ক্ষেত্রে অবশ্যই উলেস্নখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
তলদেশে কাদার পরিমাণ	৬ ইঞ্চি এর বেশি নয়।	পুকুর পুরাতন হলে এবং তলদেশে কাদার পরিমাণ আদর্শ মানের চেয়ে বেশি হলে পুকুর শুকিয়ে অবশ্যই তা তুলে ফেলতে হবে।

গুণাগুণের নাম	অনুকূল মাত্রা	সমাধানে করণীয়
তাপমাত্রা	কার্পজাতীয় মাছের জন্য ২৫-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা সবচেয়ে ভালো।	যদিও এ ব্যাপারে আমাদের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই তবুও তাপমাত্রার সাথে মাছের খাদ্যগ্রহণ তথা বৃদ্ধির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে বিধায় এ ব্যাপারেও মৎস্য চাষিকে সচেতন হতে হবে।
সূর্যালোকের উপস্থিতি	সমগ্র পুকুরের কমপক্ষে ৫০% জায়গায় দৈনিক অন্তত ৮ ঘণ্টা সূর্যের আলো পড়া প্রয়োজন।	সূর্যালোক প্রবেশে বাধা প্রদানকারী গাছপালাকে অপসারন করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
পানির বর্ণ	হালকা সবুজ অথবা বাদামি সবুজ।	প্রয়োজন অনুসারে পানির বর্ণ দেখে জৈব/ অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
পানির গভীরতা	নার্সারি পুকুর ৩ ফুট এবং মজুদ পুকুর ৬ ফুট।	পরিকল্পনা অনুযায়ী পুকুর খনন করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫ মিলিগ্রাম/লিটার-এর উপরে।	পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, নতুন পানি সংযোগ করে বা সম্ভব হলে এরেটর ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড	২ মিলিগ্রাম/লিটার মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন।	কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে সমাধানকল্পে শতাংশপ্রতি ৫০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
পিএইচ মান	পিএইচ মান ৭.৫ থেকে ৮.৫ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।	পানি অম্লীয় হলে প্রয়োজন অনুসারে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন এবং ক্ষারীয় হলে শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।
মোট ক্ষারত্ব	৭০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার।	উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে ক্ষারত্বের মান কমে গেলে শতাংশপ্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
মোট খরতা	৪০-২০০ মিলিগ্রাম/লিটার।	উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে খরতার মান কমে গেলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
খরতা	৮০-১০০ মিলিগ্রাম/লিটার।	উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে খরতা বা হার্ডনেসের মান কমে গেলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
নাইট্রোজেন	পানিতে ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং মাটিতে ৮ ১০ মিলিগ্রাম/ ১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইউরিয়া সার ব্যবহার করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
নাইট্রেট নাইট্রোজেন	পানিতে ০.১ মিলিগ্রাম/লিটার এর নিচে থাকা ভালো।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইউরিয়া সার ব্যবহার করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
ফসফরাস	পানিতে ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং মাটিতে ১০ ১৫ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় পরিমাণে টিএসপি সার ব্যবহার করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
অবিয়োজিত অ্যামোনিয়া	০.০২৫ মিলিগ্রাম/লিটার মাছচাষের জন্য ভালো।	পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে অক্সিজেন সরবরাহ করে তা কমানো যেতে পারে।

গুণাগুণের নাম	অনুকূল মাত্রা	সমাধানে করণীয়
হাইড্রোজেন সালফাইড	০.০০৩ মিলিগ্রাম/লিটার এর কম।	তলদেশে খুব বেশি এ গ্যাস জমে গেলে হড়রা টেনে তা দূর করা যেতে পারে।
জৈব পদার্থ	৩-৪ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ক্যালসিয়াম	৪০-৫০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
পটাশিয়াম	৩-৪ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি।	উল্লিখিত পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে শতাংশ প্রতি ৭৫ গ্রাম হারে মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহার করা যেতে পারে।
ক্লোরাইড	স্বাভাবিক মাত্রা ৭ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি।	উল্লিখিত উপাদানের ঘাটতি থাকলে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন	সেকিডিস্ক রিডিং ১ ফুট পর্যন্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য।	সারের মাত্রা কমবেশি করে উল্লিখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।
প্রাণি প্ল্যাংকটন	গ্লাস প্রতি ৮-১০টি।	জৈব সারের মাত্রা কমবেশি করে উল্লেখিত মান বজায় রাখা যেতে পারে।

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জলজ প্রতিবেশ কত ধরনের হতে পারে?
২. স্বাদু পানির প্রতিবেশের লবণাক্ততা কত পিপিটি?
৩. লোনা পানির প্রতিবেশের লবণাক্ততা কত পিপিটি?
৪. মোহনার লবণাক্ততা কত পিপিটি?
৫. পুকুরের তলদেশে বসবাসকারী জীবকুলকে কী বলা হয়?
৬. পুকুরে শামুক ও ঝিনুক বেশি থাকলে কোন পুষ্টি উপাদান কমে যায়?
৭. মাছচাষে আদর্শ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রতিবেশ বলতে কী বুঝ?
২. খাদ্য শিকল কাকে বলে?
৩. রুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল তাপমাত্রা কত?
৪. কত তাপমাত্রায় রুই জাতীয় মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়?
৫. পুকুরের গভীরতা কত হওয়া ভাল?
৬. পুকুরের উষ্ণ ও শীতল স্তরের মধ্যবর্তী স্তরকে কী বলে?
৭. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে?
৮. মাছ চাষের জন্য অনুকূল দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত?
৯. নিরপেক্ষ পিএইচ কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেনথোজ কাকে বলে? মাছচাষে তলদেশের জীবকুলের প্রভাব আলোচনা কর।
২. পুকুরের গভীরতা ও তাপমাত্রার সাথে মাছচাষের সম্পর্ক আলোচনা কর।
৩. মাছ চাষের পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রভাব ও প্রয়োজনীয় মাত্রা আলোচনা কর।
৪. মাছচাষে প্রভাব বিস্তারকারী ভৌত নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর।
৫. মাছচাষে প্রভাব বিস্তারকারী রাসায়নিক নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর।
৬. স্বাদু পানির প্রতিবেশের বিবরণ দাও।
৭. পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
৮. পানিতে অ্যামোনিয়ার প্রভাব ও অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায় বর্ণনা কর।
৯. পুকুরের পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

মাছ চাষে পুকুরের ধরন ও পুকুর খনন

সুনির্দিষ্ট পাড় দ্বারা ঘেরা পানিসহ বা শুকনো জলাশয় যেখানে মাছ চাষের সকল উপাদানসমূহ অনুকূল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এমন বদ্ধ জলাশয়কে পুকুর বলে। সর্বোচ্চ ১ একর থেকে সর্বনিম্ন ২ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়কে পুকুর বলা হয়। ২ শতাংশের কম আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়কে কুয়া বলে। ১ একরের বেশি আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়কে দিঘি বলে। আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে ছোট বড়, গভীর-অগভীর, আয়তাকার, গোলাকার, নতুন ও পুরাতন অসংখ্য পুকুর-দিঘি রয়েছে। এসব পুকুর-দিঘির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদেরকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

পুকুরের শ্রেণিবিভাগ : পানির গভীরতা, মাটির গঠন এবং পানির প্রাপ্যতা অনুসারে পুকুরকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. মৌসুমী পুকুর এবং
খ. বাৎসরিক পুকুর।

ক. মৌসুমি পুকুর : যেসব পুকুরে সারা বছর পানি থাকে না বা বছরে ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত পানি থাকে তাকে মৌসুমী পুকুর বলে। এ ধরণের পুকুরে পানির গভীরতা ২ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাড়ি নির্মাণ, রাস্তার মাটি ভরাট বা অন্য কোন গৃহস্থালির কাজে মাটি কাটার ফলে এ জাতীয় মৌসুমী পুকুর সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় পুকুরের আয়তন সাধারণত ২ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মৌসুমী পুকুরে সেসব প্রজাতির মাছচাষ করা যায়, যেগুলো স্বল্প সময়েই খাওয়ার বা বাজারজাতকরণ উপযোগী হয়। যেমন- নাইলোটিকা, রাজপুঁটি, শিং, মাগুর ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দিক থেকে এসব পুকুরে পোনা উৎপাদন অত্যন্ত লাভজনক। কারণ মৌসুমী পুকুরপ্রতি বছরই শুকিয়ে যায়। তাই তলার পরিবেশ অত্যন্ত উপযোগী থাকে। মৌসুমী পুকুরের পাড়গুলো উঁচু নয় বলে বন্যা বা বৃষ্টির পানিতে সহজেই পুকুর ভেসে যায়। তাই এসব পুকুরে মাছচাষ করতে হলে হয় বন্যামুক্ত করে অথবা বন্য পরবর্তী সময়ে মাছ চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের দেশে ডোবা, নালা, খাদ প্রভৃতি মৌসুমী পুকুরের অন্তর্ভুক্ত।

খ. বাৎসরিক পুকুর : যেসব পুকুরে বছরের সব সময় পানি থাকে তাকে বাৎসরিক পুকুর বলে। এসব পুকুর সাধারণত ৫ ফুট হতে ৭ ফুট পর্যন্ত গভীর হয়ে থাকে। মাছচাষ বা পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য সাধারণত এসমস্ত পুকুর তৈরি করা হয়। আবার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও এসব পুকুর খনন করা হয়। বাৎসরিক পুকুরে কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ অত্যন্ত লাভজনক। এ জাতীয় পুকুরের আয়তন সাধারণত ৩৩ শতাংশ থেকে ১ একর পর্যন্ত হয়ে থাকে, তবে এর আয়তন পরিবর্তনশীল।

মাছের উৎপাদনশীলতার ওপর ভিত্তি করে পুকুরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. উৎপাদনশীল পুকুর : যেসব পুকুরের পানি সবুজ বা বাদামি রঙের, পুকুরে কোন আগাছা বা কচুরিপানা নেই, পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে, পাড় ভাঙ্গা নয় এবং পুকুরের তলদেশে কোন পচা কাদা নেই। এ ধরনের পুকুরকে উৎপাদনশীল পুকুর বলে। এ জাতীয় পুকুরে অত্যন্ত কম খরচে মাছচাষ করা যায়।

খ. পচা পুকুর : এ ধরনের পুকুর মূলত বহু বছর ধরে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত পুকুরের তলদেশে প্রচুর পরিমাণ পচা কাদা থাকতে পারে। কাদার স্তরের আধিক্য পুকুরের প্রধান

বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের পুকুরে পানির রং কালচে থাকে, পানি পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পুকুর সাধারণত জলজ আগাছা বা কচুরিপানায় পূর্ণ থাকে। পুকুর পাড়ের চারপাশ ঝোপ-জঙ্গলে বা বড় ধরনের গাছ-পালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। প্রায় ক্ষেত্রেই পুকুরের পাড় ভাঙা থাকে। এমন পুকুরকে পঁচা পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুরে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

মাছ চাষের ধরন অনুসারে পুকুরের শ্রেণিবিভাগ

মাছচাষ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ মাছের বয়সের সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন বয়সের মাছের জন্য বিভিন্ন ধরণের পুকুরের প্রয়োজন হয়। তাই মাছ চাষের ধরণ অনুসারে উক্ত পুকুরগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. আঁতুড় পুকুর : মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় ৪ থেকে ৬ দিন বয়সের রেণু পোনাকে ২০ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত যেসব অগভীর জলাশয় বা পুকুরে প্রতিপালন করা হয় তাকে আঁতুড় পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুরের আয়তন সাধারণত ৫ থেকে ২০ শতাংশ এবং গভীরতা ৩ থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। আঁতুড় পুকুর যে কোনো আকৃতির হতে পারে। তবে জাল টানার সুবিধার জন্য এর আকার আয়তাকার হওয়া বাঞ্ছণীয়।

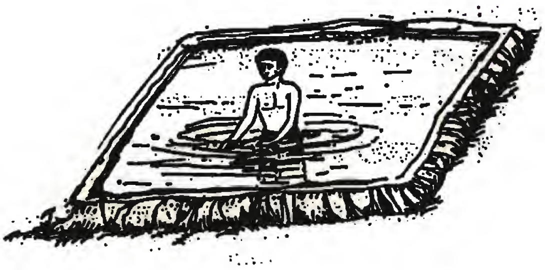

চিত্র-২০ : আঁতুর পুকুর

খ. নার্সারি, লালন বা চারা পোনা পালন পুকুর : আঁতড় পুকুরে লালন করা ১ ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ আকারের ধানী পোনাগুলো যে পুকুরে ৩০ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত পালন করে ৩ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি আকারের পোনায় পরিণত করা হয় সে পুকুরকে নার্সারি, লালন বা চারা পোনা পালন পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুরের আয়তন ৩০ শতাংশ থেকে ১ একর পর্যন্ত হতে পারে এবং পানির গভীরতা ৪ ফুট থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। লালন পুকুরে সার্বিক যত্ন নিলে শতাংশ প্রতি ৮০০-১০০০ টি ধানী পোনা মজুদ করে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

গ. মজুদ পুকুর বা পালন পুকুর : যেসব পুকুরে ৪ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি আকারের পোনা মজুদ করে পরিচর্যার মাধ্যমে বাজারজাতকরণ উপযোগী বা খাওয়ার যোগ্য বড় মাছে পরিণত করা হয় সেসব পুকুরকে মজুদ পুকুর বা পালন পুকুর বলে। মজুদ পুকুরের আয়তন সাধারণত ৩৩ শতাংশ থেকে যেকোন আয়তনের হতে পারে। তবে ৩৩ শতাংশ থেকে ২.৫ একর পর্যন্ত পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাজনক। এ ধরণের পুকুরের গভীরতা ৫ ফুট থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। মজুদ পুকুরে মিশ্রচাষে শতাংশ প্রতি ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি আকারের বিভিন্ন প্রজাতির ৫৫ থেকে ৬০টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। তবে ব্যবস্থাপনাভেদে এ সংখ্যা পরিবর্তনযোগ্য।

মৎস্য খামার বা পুকুর খননে স্থান নির্বাচন : মাছের খামার কিংবা মাছ চাষের উদ্দেশ্যে পুকুর খননের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযোগী এমন স্থানে মাছ চাষের পুকুর তৈরি আবশ্যক। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ভুলত্রুটি হলে পরবর্তী বছরে সেটা শোধরানো সম্ভব। কিন্তু পুকুর খননকালে স্থান নির্বাচনে কোনো ভুলত্রুটি হলে সেটা শোধরানো সম্ভব নয়। কারণ পুকুর খননে সিংহভাগ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। কাজেই পুঁজির সর্বাধিক সদ্ব্যবহার এবং খামার পরিচালনায় সর্বোচ্চ দক্ষতা

অর্জনের জন্য পুকুরের স্থান নির্বাচন, সঠিক নক্সা বা ডিজাইন অবলম্বন এবং পুকুরের বিভিন্ন অংশ যথাযথভাবে নির্মাণ সফল মাছ চাষের পূর্বশর্ত। নিচে পুকুর খননে স্থান নির্বাচনকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো–

পুকুর খননে স্থান নির্বাচনকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. ভূমির প্রকৃতি : তুলনামূলকভাবে নিচু এলাকায় পুকুর খনন করা উচিত। পাহাড় বা টিলার ঢালে পুকুর খনন ঠিক নয়। কারণ সেখানে পানি ধরে রাখা কঠিন। পুকুর খননের পর পাড় যে পরিমাণ উঁচু হবে তা মাঝারি ধরণের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন জায়গা নির্বাচনের ওপর জোর দিতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতে বন্যায় বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে। নিচু স্থানে পুকুর খনন করলে ভেজা মাটি দ্বারা ভালোভাবে পাড় নির্মাণ করা যায় এবং কম গভীরতায় যথেষ্ট পানি ধরে রাখা যায় বলে নিচু এবং বন্যামুক্ত স্থান পুকুর খননের জন্য সবচেয়ে ভালো।

২. মাটির বৈশিষ্ট্য : পুকুর তৈরির জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত যে স্থানের মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। মাছ চাষের পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণ পানি থাকা প্রয়োজন। তাই প্রথমে দেখতে হবে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কেমন। মোটা কাঁকরযুক্ত মাটি কিংবা বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। লাল মাটির এলাকায় এবং এঁটেল মাটিতে পুকুর খনন করলে পানি প্রায় সময়ই ঘোলা থাকে। কারণ এ ধরণের মাটির কণাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম যা সহজে থিতায় না। আর পুকুরের পানি ঘোলা থাকলে সূর্যের আলো পানির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এতে পুকুরের উর্বরতা শক্তি তথা খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। ফলে মাছের ফলনও ভাল হয় না। পুকুর খননের জন্য এঁটেল-দোঁআশ মাটি সবচেয়ে ভালো। এ মাটির উর্বরতা এবং পানি ধারণ ক্ষমতা দু'টোই সন্তোষজনক। তবে এলাকায় নেহায়েত ভালো মাটি পাওয়া না গেলে যে মাটিই পাওয়া যাক না কেন সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার যেমন- গোবর, কম্পোস্ট সার প্রভৃতি ব্যবহার করে তলদেশের উন্নয়ন সাধন তথা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

৩. বন্যামুক্ত স্থান : পুকুর খননের জন্য নির্বাচিত স্থান অবশ্যই বন্যামুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নিচু এলাকায় বন্যার আশঙ্কা থাকলে সম্মিলিত উদ্যোগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করতে পারলে পুকুরের পাড় বেশি উঁচু করার প্রয়োজন হয় না।

৪.পানির উৎস ও গুণাগুণ : পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় এমন স্থানে পুকুর খনন করা উচিত। আধুনিক পন্থায় মাছ চাষের জন্য সারা বছর পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির প্রয়োজন। আমাদের দেশে পুকুরগুলো সাধারণত বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল। কেবলমাত্র মাছচাষের উদ্দেশ্যে নতুন পুকুর করতে হলে তার পাশে নির্ভরযোগ্য পানির উৎস থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে শুধু পানির পরিমাণই যথেষ্ট নয়, পানির গুণাগুণও সমগুরুত্বপূর্ণ। যে উৎস হতে পুকুরে পানি সরবরাহ করা হবে কোন ক্রমেই সেই উৎস যেন দূষিত না হয়। আবার পানি স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়, ঘোলা পানি পুকুরের উৎপাদন শক্তি হ্রাস করে। তাছাড়া ভাসমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা মাছের ফুলকায় জমে শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে। ভাল ফল লাভের ক্ষেত্রে পানির উৎসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের গুণাগুণও সমভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. আলো বাতাসের ব্যবস্থা : পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পাওয়া যায় এমন খোলামেলা স্থানে পুকুর খনন করা উচিত। পুকুর পাড়ে ঘন গাছপালা ও ঘরবাড়ি থাকলে অথবা পুকুরে প্রচুর পরিমাণ কচুরিপানা থাকলে আলো-বাতাস বাধা পায়। পুকুরে সূর্যের আলো না পড়লে অথবা কম পড়লে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন

ব্যাহত হবে। অন্য দিকে বাতাসে পানি আন্দোলিত না হলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে এবং এতে মাছের মৃত্যুও ঘটতে পারে। সুতরাং পুকুর খননের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস পাওয়া যায়।

৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা : মৎস্য খামার বা পুকুরের সঙ্গে অবশ্যই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা পাকা রাস্তা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে অধিকাংশ সময়ই উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করা যায় না। এ ছাড়াও পুকুরে প্রতিনিয়ত কাজের জন্য যেমন- পোনা পরিবহন, খাদ্য, সার, ঔষধপত্র, জালসহ নানারকম জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করতে হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত না হলে এসব জিনিসপত্র সময়মতো আনা-নেয়া কষ্টকর বা পরিবহন খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। ফলে লাভের অংশ অনেক কমে যাবে। তাই নতুন পুকুর কিংবা খামার নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনকালে এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৭. উপকরণের প্রাপ্যতা : উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ করতে হলে নানাবিধ জিনিসপত্র যেমন- মাছের পোনা, খাদ্য, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধপত্র, মাছ আহরণ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। দেশের একান্তই প্রত্যন্ত অঞ্চলে খামার বা পুকুর খনন করা হলে এবং যেখানে ধারেকাছে এসব উপকরণ পাওয়া না গেলে খামার পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে এমন প্রত্যন্ত অঞ্চল খুবই কম, যেখানে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা কিংবা পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। তাছাড়া মাছ চাষের জন্য যেসব জিনিস দরকার সেগুলো সচরাচর ধারে-কাছেই পাওয়া যায়। আর কিছু কিছু জিনিস আছে যা বছরে দুই একবার প্রয়োজন হয়। সেগুলো বছরের প্রথমেই কিনে রেখে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

৮. নিরাপত্তা ব্যবস্থা : মাছ চাষের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সমস্যা দুই ধরনের, পুকুরের মাছসহ অন্যান্য মালামালের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, অন্যটি হলো বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক সমস্যা। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বসতবাড়ির কাছাকাছি পুকুর নির্বাচন করা যাতে খুব সহজেই পুকুর বা খামার দেখাশুনা করা যায়। আর বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক সমস্যা সমাধানকল্পে বাঁধ নির্মাণ করা এবং গভীর কিংবা অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। সম্ভব হলে এসব ব্যবস্থা নেয়ার পরই কেবল নির্ধারিত স্থানে খামার কিংবা পুকুর নির্মাণের কাজ শুরু করা উচিত।

৯. বিদ্যুতের ব্যবস্থা : নিবিড় মাছ চাষের ক্ষেত্রে খামার বা পুকুরে অবশ্যই বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সময়মতো পুকুরে পানি পরিবর্তন, আলোর ব্যবস্থাকরণসহ পুকুরের পানিতে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন বাড়ানোর যন্ত্র চালানোর জন্যও বিদ্যুতের প্রয়োজন। তাই খামার বা পুকুর নির্বাচনের আগে অবশ্যই এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে পরে পুকুর নির্মাণ করতে হবে।

১০. বাজারজাতকরণের সুবিধা : মাছ দ্রুত পচনশীল পণ্য। একই ওজনের তাজা মাছ আর পচা মাছের বাজার মূল্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে মাছ বাজারজাতকরণ করতে না পারলে অনেক সময় লাভের অংশ কমে যায়। তাই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মাছ বাজারজাতকরণ করতে পারলে লাভের অংশ বেড়ে যায়। বাজারজাতকরণের সুবিধা নেই এমন স্থানে পুকুর বা খামার স্থাপন করে বেশি লাভবান হওয়া যায় না।

একটি আদর্শ পুকুরের বিভিন্ন অংশ ও তার কার্যাবলি

একটি আদর্শ পুকুরের জন্য নিম্নলিখিত অংশগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

ক. পুকুরের পাড়	ঘ. তলদেশ
খ. বকচর	ঙ. পানি নিষ্কাশন নালা
গ. ঢাল	চ. পানি অনুপ্রবেশ নালা

ক. পুকুরের পাড় : পাড়ের প্রধান কাজ হলো বাহির থেকে যাতে পুকুরের মধ্যে বিষাক্ত বা দূষিত পানি ঢুকতে না পারে তা রক্ষা করা এবং পুকুরকে বন্যা মুক্ত রাখা।

খ. বকচর : পুকুরের পাড়ের ঢালের ভিতরের দিকে, ঢালের শেষ প্রান্ত থেকে মূল পুকুরের প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবধানকে বকচর বলে। এর প্রধান কাজ হলো যাতে পুকুরের পাড় ও ঢাল ভেঙে না যেতে পারে।

গ. ঢাল : ঢালোর কাজ হলো পুকুরের পাড় যেন ভেঙে না পড়ে এবং সব স্থানে যাতে সমানভাবে আলো পড়তে পারে। এ ছাড়াও ঢাল প্রশস্ত হলে মাছ ধরতে সুবিধা হয়।

ঘ. পুকুরের তলদেশ : এটি পুকুরের সর্বনিম্ন স্তর। এ স্তরের প্রধান কাজ হলো পুকুরের পানি সংরক্ষণ করা যাতে অধিক পরিমাণ পানি চুইয়ে বের হয়ে না যেতে পারে। এ ছাড়া পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এ স্তরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ.পানি নিষ্কাশন নালা : এর প্রধান কাজ হলো প্রতিকূল পরিবেশে অতিরিক্ত পানি বের করে দিয়ে মাছ চাষের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ নালাটি পুকুরের তলদেশের কাছাকাছি থাকে। পুকুরের পানি বের করে দিয়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রেও এ নালাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চ. পানি অনুপ্রবেশ নালা : এ নালার প্রধান কাজ হলো প্রতিকূল পরিবেশে যাতে পরিষ্কার পানি ঢুকানো যায়। এ নালা পুকুরের সর্বোচ্চ পানির স্তরের উপরে থাকে।

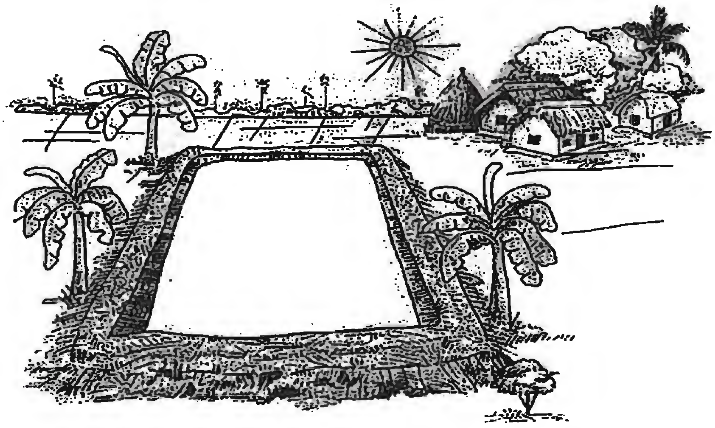

চিত্র-২১ : একটি আদর্শ পুকুর

পুকুর খনন পদ্ধতি : বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পুকুর খনন তথা জলায়তন নির্ধারণ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ বাজারজাতকরণ

পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি ধাপ। তাই প্রত্যেক মৎস্য চাষির অবশ্যই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে। নিচে কিভাবে মৎস্যচাষি এবং মৎস্য সেক্টরে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী এ ব্যাপারে সহায়তা পেতে পারে তার এক দিক নির্দেশনা তথা পুকুর খননের মৌলিক নীতিসমূহ দেয়া হলো–

ক. মাটির উর্বরতা পরীক্ষা : যে স্থানে পুকুর কাটা হবে ঐ স্থানে ৪-৫টি জায়গা থেকে অল্প কিছু পরিমাণ মাটি তুলে একটি কাঁচের পাত্রে পানির সাথে উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হয়। অতঃপর গ্লাসটিকে একটি নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়ে কিছু সময় পরে গ্লাসের তলদেশের বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট মাটির উপাদান দেখে স্থুল বালি কণার পরিমাণ, সুক্ষ্ম বালি কণার পরিমাণ, পলি কণার পরিমাণ ও জৈব পদার্থের পরিমাণ দেখে মাটির প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এছাড়াও নির্দিষ্ট জমির চারপাশের ফসল বা প্রাকৃতিক অবস্থা দেখেও মোটামুটিভাবে জমির উর্বরতা অনুমান করা যায়। কিন্তু খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে।

খ. মাটির গঠন পরীক্ষা : এ পরীক্ষার মুল উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত এলাকায় মাটির ধরন এবং পানি ধারণক্ষমতা জানা। মাটির পানি ধারণক্ষমতা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন-

১. মাটি স্পর্শ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ মাটি হাতের আঙুলের মাথায় নিয়ে ঘর্ষণ দিলে যদি পিচ্ছিল ও মসৃণ মনে হয় তবে বুঝতে হবে এ মাটিতে প্রচুর পরিমাণ কর্দম কণা রয়েছে। যা পানি ধারণ করে রাখতে সক্ষম। যদি খসখসে মনে হয় তবে বুঝতে হবে এ মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বালি রয়েছে এবং এ মাটির ধারণক্ষমতা নেই বললেই চলে।

২. হাতের তালু বা মুঠ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে মাটির পানি ধারণক্ষমতা পরীক্ষার জন্য হাতের তালুতে কিছু পরিমাণ ভেজা মাটি নিয়ে শক্ত করে হাত মুঠ করতে হবে এবং পরে খুলে ফেলতে হবে। হাতের মুঠোর মাটি যদি দলা বেঁধে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এ মাটি মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত। কেননা এঁটেল মাটি দলা বাঁধতে পারে। অপর দিকে মাটি যদি দলা না বাঁধে তাহলে বুঝতে হবে মাটিতে বালির ভাগ বেশি, যা মাছ চাষের জন্য অনুপোযোগী।

৩. মাটির বল তৈরি পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে খানিক মাটি হাতে নিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ভিজিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে মাটি দিয়ে একটি বল তৈরি করতে হবে। এবারে বলটিকে উপরের দিকে (১ থেকে ১.৫ মিটার) ছুড়ে দিয়ে হাতের তালুতেই আবার ধরতে হবে। মাটির বলটি যদি ভেঙে না যায় এবং পূর্বের আকারেই থাকে তবে বুঝতে হবে মাটি এঁটেল প্রকৃতির। আর যদি বলটি ভেঙে যায় তবে বুঝতে হবে মাটিতে বালির ভাগ বেশি ।

৪. কুপ খনন পদ্ধতি : অনেক সময় নির্ধারিত স্থানের উপরের মাটির স্তর এঁটেল থাকা সত্ত্বেও তলদেশের মাটি বেলে হতে পারে। এ কারণেই পুকুর কাটার পূর্বে যে স্থানে পুকুর কাটা হবে সেখানকার ৫/৬ স্থানে প্রয়োজনীয় গভীরতায় কুয়া কাটতে হয়। এবার কুয়াগুলোকে পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। কুয়ার পানি যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বা দুই-এক দিনের মধ্যেই কমে যায়, তবে বুঝতে হবে পুকুরের তলদেশের মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম এবং ৭/৮ দিনেও যদি পানি না কমে তাহলে বুঝতে হবে মাটির ধারণক্ষমতা ভালো এবং মাছ চাষের জন্য উক্ত স্থানে পুকুর খনন করা যেতে পারে।

পুকুরের আয়তন নির্ধারণ পদ্ধতি

যে কোনো পুকুরের আয়তন নিম্নে বর্ণিত সূত্রের সাহায্যে বের করা যায়।
পুকুরের আয়তন (শতাংশ) = দৈর্ঘ্য (ফুট) × প্রস্থ (ফুট)/৪৩৫.৬
যেমন- কোনো পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট এবং প্রস্থ ৫০ ফুট হলে
পুকুরের আয়তন হবে = ১১.৪৮ শতাংশ। (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)
আবার পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মাপ যদি ফুটে না নিয়ে মিটারে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে
পুকুরের আয়তন (শতাংশ) = দৈর্ঘ্য (মিটার) × প্রস্থ (মিটার)/৪০.৪৮
যেমন- পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার এবং প্রস্থ ৫০ মিটার হলে
পুকুরের আয়তন হবে = ১২৩.৫২ শতাংশ। (৪০.৪৮ বর্গমিটারে ১ শতাংশ)

পুকুর খননে মাটি কাটার হিসাব : পুকুরের আয়তন নির্ধারণের পর পুকুর কাটা শুরু করতে হয়। সাধারণভাবে মাটি কাটার হিসাব নিম্নে বর্ণিত সূত্রের সাহায্যে অতি সহজেই বের করা যায়। পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা যদি ফুটে হিসাব করা হয় তাহলে দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × গভীরতা = ঘনফুট।

যেমন- কোনো পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, প্রস্থ ৫০ ফুট এবং ঐ পুকুরে ৫ ফুট গভীর করে মাটি কাটতে হবে। পুকুরের মাটির ধরন যদি এঁটেল হয় তাহলে ১ : ১.৫ ঢাল রেখে মাটি কাটতে হবে। অর্থাৎ মাটি কাটার সময় ১ ফুট গভীরতার জন্য ১.৫ ফুট মাটি ছেড়ে দিতে হবে। এখন মাটি কাটার হিসাব হবে।

পুকুরের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য = ১০০ ফুট
উচ্চতা বা গভীরতা = ৫ ফুট
প্রাথমিক প্রস্থ = ৫০ ফুট
গড় দৈর্ঘ্য = ১০০+৮৫/২ = ৯২.৫ ফুট
গড় প্রস্থ = ৫০+৩৫/২ = ৪২.৫ ফুট

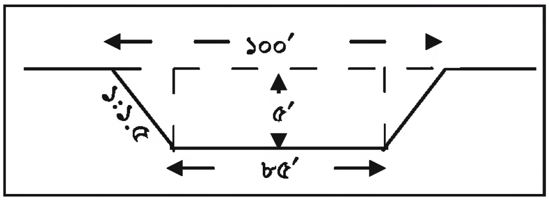

চিত্র-২২ : লম্বালম্বি সেকশান

মোট মাটির পরিমাণ = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা
= ৯২.৫ × ৪২.৫ × ৫
= ১৯,৬৫৬.২৫
= ১৯,৬৫৬ ঘনফুট (প্রায়)

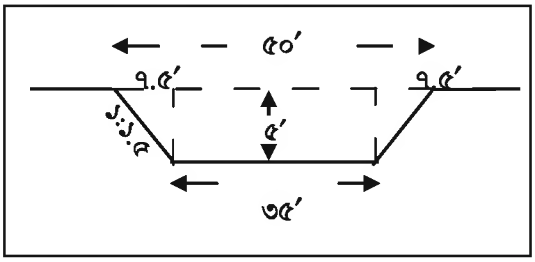

চিত্র-২৩ : আড়াআড়ি সেকশান

প্রতি হাজার (১ হাজার = ১০০০ ঘনফুট) মাটি কাটার মূল্য যদি ৩০০০ টাকা হয় তাহলে মোট মাটি কাটতে খরচ হবে ১৯.৬ x ৩০০০ = ৫৮,৮০০ টাকা।

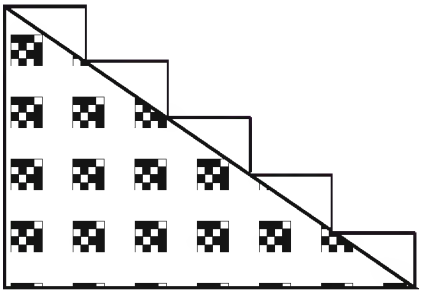

চিত্র-২৪ : পুকুরে মাটি কাটার পরে সিড়ির দৃশ্য

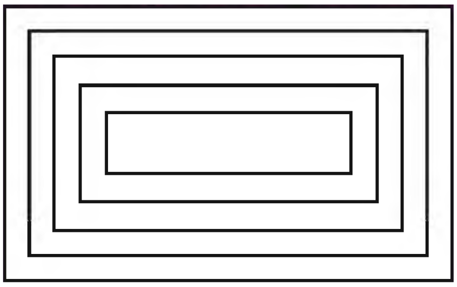

চিত্র-২৫ : পুকুরে মাটি কাটার পরের দৃশ্য

আবার অনেক সময় বৃষ্টিবাদল বা অন্য যে কোনো কারণে পুকুরের তলদেশে খননকৃত মাটি মাপ না করে পুকুরের পাড়ে উত্তোলিত মাটি মাপ করেও মাটির হিসেব বের করা যেতে পারে। যেমন- কোনো পুকুরের পাড়ের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, পাড়ের ঢালের দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, পাড়ের উচ্চতা ১০ ফুট এবং পাড়ের চূড়া বা টপের প্রস্থ ৬ ফুট হলে মোট মাটির পরিমাণ হবে।

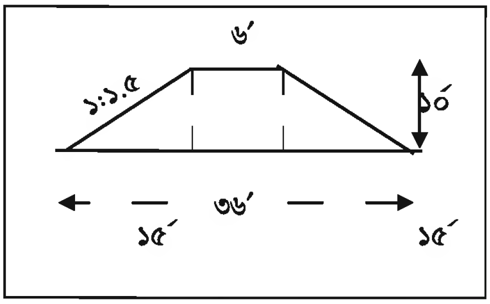

চিত্র-২৬ : পুকুর পাড়ের আড়াআড়ি সেকশন

পাড়ের দৈর্ঘ্য = ১০০ ফুট
উচ্চতা = ১০ ফুট
টপের দৈর্ঘ্য = ৬ ফুট
পাড়ের গড় প্রস্থ = ২১ ফুট
ঢালের দৈর্ঘ্য = ১৫ ফুট (১ : ১.৫)
মাটির পরিমাণ = ?

সূত্রানুযায়ী,

$$১০০'-০'' \times \frac{৬''-০''+৩৬'-০''}{২} \times ১০'-০''$$

= ১০০´-০″ x ২১´-০″ x ১০´-০″
= ২১,০০০ ঘনফুট।

প্রতি হাজার ঘনফুট মাটি কাটার মূল্য যদি ৩০০০ টাকা হয় তাহলে মোট মাটি কাটতে খরচ হবে ২১ x ৩০০০ = ৬৩,০০০ টাকা। আবার মাটির মাপ যদি এমন হয় যেমন- কোন পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০´ -২˝, প্রস্থ ৫০´ -৩˝ এবং গভীরতা ১০´ -৪˝ হয়। তাহলে সূত্রানুযায়ী

১০০´-২˝ x ৫০´-৩˝ x ১০´-৪˝
= ১০০.১৭ x ৫০.২৫ x ১০.৩৩
= ৫১,৯৯৭ ঘনফুট (প্রায়)।

২˝ কে ফুটে পরিণত করতে হবে
১২˝ = ১ ফুট

$$১'' = \frac{১}{১২} = ০.০৮৩ \text{ ফুট}$$

$$২'' = \frac{২}{১২} = ০.১৬৬ = ০.১৭$$

৩˝ = ০.২৫ , ৪˝ = ০.৩৩

১০০০ ঘনফুট মাটির মূল্য = ৩০০০ টাকা
১ ঘনফুট মাটির মূল্য = ৩০০০/১০০০ = ৩.০ টাকা।

সুতরাং মোট মাটির মূল্য = ৫১,৯৯৭ x ৩.০
= ১,৫৫,৯৯১ টাকা।

মাছ চাষের ধরন

মাছ চাষকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা–

১. **এককচাষ** (Monoculture)
২. **মিশ্রচাষ** (Poly/Composite culture)

১. এককচাষ পদ্ধতি : পুকুরে যখন শুধুমাত্র একটি প্রজাতির মাছচাষ করা হয় তখন তাকে এককচাষ পদ্ধতি বলে। যেমন- একটি পুকুরে শুধুমাত্র নাইলোটিকা অথবা সিলভার কার্প অথবা পাঙ্গাশ মাছচাষ করা হলে এবং এর সঙ্গে অন্য কোনো প্রজাতির মাছচাষ করা না হলে তখন তাকে একক মাছচাষ পদ্ধতি বলে।

সুবিধা

- নিবিড়ভাবে মাছচাষ সম্ভব;
- খাদ্য গ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা কম;
- একটি প্রজাতির ওপর ব্যাপক জ্ঞানলাভ সম্ভব ও
- ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক সহজ।

অসুবিধা

- পুকুরের সব স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না;
- সার্বিক উৎপাদন কম হতে পারে।

২. মিশ্রচাষ পদ্ধতি : মাছের মিশ্রচাষ হলো একই পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছচাষ করে পুকুরের সব স্তরে বিদ্যমান মৎস্য খাদ্যের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য যে, যেসব প্রজাতির মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের নয়, খাদ্য নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না, জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তাদেরকে মিশ্রচাষের প্রজাতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। যেমন- কোনো একটি জলাশয়ে প্রজাতিভিত্তিক আনুপাতিক হারে সিলভারকার্প, কাতলা, রুই, মৃগেল, গ্রাসকার্প, রাজপুঁটি প্রভৃতি মাছের একসঙ্গে চাষই হলো মিশ্রচাষ। স্বল্প পরিমাণ জলাশয় থেকে অধিক উৎপাদন পেতে হলে বর্তমানে মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে মাছচাষ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মিশ্রচাষের উপকারিতা : পুকুরে সার দেয়ার ফলে প্রাকৃতিক খাদ্যকণা জন্মে যা মাছের সহজপাচ্য খাদ্য। এ খাদ্যকণা পুকুরের পানির বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে থাকে। চাষের জন্য যেসব কার্পজাতীয় মাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঐ মাছগুলোও সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী পানির বিভিন্ন স্তরে বাস করতে অভ্যস্ত, ঘুরেফিরে বেড়ায়, খাদ্য খায়। যেমন- কাতলা মাছ পানির উপরিস্তরের, রুই মাঝের স্তরের এবং মৃগেল নিচের স্তর থেকে খাদ্য খায়। পুকুরে একটি বা দুইটি প্রজাতির পোনা ছাড়া হলে ঐ মাছগুলো এদের নির্ধারিত স্তরের খাদ্য খাবে অন্যস্তরের খাদ্য অব্যবহৃত থেকে যাবে, নষ্ট হবে- এ থেকে পানিও নষ্ট হতে পারে। তাই লাভজনক মাছচাষের জন্য পুকুরের পরিবেশ নিরাপদ রাখতে দেশী ও বিদেশী প্রজাতির মাছ একসঙ্গে চাষ করা যেতে পারে।

সুবিধা

- সব স্তরের খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয়;
- উৎপাদন বেশি হয়;
- আয় বেশি হয় ও
- ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী মাছ যোগান দেয়া সম্ভব।

অসুবিধা

- সঠিকভাবে প্রজাতি নির্বাচন না হলে ক্ষতিও হতে পারে;
- প্রজাতিভিত্তিক খাদ্যের যোগান না হলে ভাল ফল নাও আসতে পারে;
- রাক্ষুসে প্রজাতি নির্বাচন করা যায় না;
- ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক কঠিন;
- সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ও
- সব সময় সকল প্রজাতির পোনা নাও পাওয়া যেতে পারে।

মাছচাষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ ও উপকরণের প্রাপ্যতা, মৎস্যচাষের ব্যবস্থাপনা স্তর, চাষের ধরন, খামারী কিংবা মৎস্যচাষির আর্থিক সঙ্গতি, মাছচাষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিনিয়োগ ক্ষমতা এবং সর্বোপরি উৎপাদন ও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এক এক রকম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। যেমন-

ক. সনাতন মাছচাষ পদ্ধতি,
খ. আধা নিবিড় মাছচাষ পদ্ধতি, ও
গ. নিবিড় মাছচাষ পদ্ধতি।

উপরে উল্লিখিত ৩টি চাষ পদ্ধতির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুকুরের আয়তন সর্বনিম্ন কত?
২. মৌসুমী পুকুরে কত মাস পানি থাকে?
৩. বাৎসরিক পুকুর কাকে বলে?
৪. বাৎসরিক পুকুরের গভীরতা সাধারণত কত হয়?
৫. উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে পুকুরকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৬. নার্সারি পুকুর কতটুকু গভীর হওয়া উচিত?
৭. লালন পুকুর কতটুকু গভীর হওয়া উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুকুর কাকে বলে?
২. পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ বলতে কী বুঝ?
৩. মিশ্রচাষের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?
৪. কোনো একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ ফুটে দেয়া আছে। ঐ পুকুরের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ?
৫. কোনো একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ মিটারে দেয়া আছে। ঐ পুকুরের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
৬. কোনো একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, প্রস্থ ৫০ ফুট। ঐ পুকুরের আয়তন কত শতাংশ?
৭. পুকুরের পাড়ের ঢাল বলতে কি বুঝায়?
৮. বকচর কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুকুর তৈরির ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
২. আদর্শ পুকুরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
৩. পুকুর খননে মাটির গঠন পরীক্ষাকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ এবং যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. পানির গভীরতা অনুসারে পুকুরকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দাও।
৫. কোনো পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, প্রস্থ ৫০ ফুট, পুকুরের ঢাল ১ : ১.৫ ঐ পুকুরে ৫ ফুট গভীর করে মাটি কাটলে মোট মাটির পরিমাণ কত ঘনফুট হবে?
৬. কোনো একটি পুকুরের পাড়ের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, পাড়ের ঢালের দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, পাড়ের উচ্চতা ১০ ফুট এবং পাড়ের টপের প্রস্থ ৬ ফুট হলে পাড়ে উত্তোলিত মোট মাটির পরিমাণ কত ঘনফুট হবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পূর্বে যেসব ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা বলে। এক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে তা হলো–

ক. মাছচাষ পরিকল্পনা;
খ. স্থান নির্বাচন;
গ. পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা নির্ণয় করা;
ঘ. জলজ আগাছা দমন;
ঙ. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা;
চ. চুন প্রয়োগ;
ছ. মজুদপূর্ব সার প্রয়োগ;
জ. পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করা ও
ঝ. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা।

ক. মাছচাষ পরিকল্পনা : মাছ চাষের শুরুতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মাছচাষের জন্য সামর্থ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। মৌসুমী না বাৎসরিক পুকুরে মাছচাষ করা হবে, আধা নিবিড় না নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষ করা হবে, পাঙ্গাশ না কার্পজাতীয় মাছচাষ করা হবে, মজুদকৃত মাছের জন্য খাদ্যের উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক খাদ্য না পিলেটজাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভর করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্যই আগে থেকেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এখন সামর্থ্য অনুযায়ী কোন ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে এবং সেই ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা অবশ্যই জেনে নিয়ে সেই আঙ্গিকে পরিকল্পনা সাজিয়ে নিয়ে মাছচাষ শুরু করতে হবে। কথায় বলে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করা। তাই মাছচাষ শুরুর পূর্বেই সঠিকভাবে মাছচাষ পরিকল্পনা করা। এর পরে মাছচাষের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে।

খ. স্থান নির্বাচন : যদি খামারভিত্তিক মাছচাষ শুরু করতে হয় তাহলে অবশ্যই মাছচাষে পুজি বিনিয়োগের পূর্বেই যে অঞ্চলে খামার স্থাপন করা হবে সেই অঞ্চল মাছচাষের জন্য কতটুকু উপযোগী তা জেনে নিয়ে পরে খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। অনেক সময় একটি পুকুর কারিগরি দিক থেকে খুব ভালো মনে হলেও আর্থ-সামাজিক দিকগুলো অনুকূলে না থাকার ফলে মাছচাষ কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি, আর্থ-সামাজিক, বাজারজাতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়সমূহকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। লাভজনকভাবে মাছচাষ করতে হলে স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

- দোঁ-আশ, কাদাযুক্ত দোঁ-আশ, পলিযুক্ত কাদা এবং এঁটেল মাটির পুকুর মাছচাষের জন্য উত্তম। এ ধরনের মাটিতে পুকুর খনন করলে প্রাকৃতিক খাদ্য বেশি তৈরি হয়। ফলে মাছের উৎপাদনও অনেক বেড়ে যায়;
- পুকুরটি অবশ্যই বন্যামুক্ত হতে হবে;
- পুকুরের তলায় কাদার পরিমাণ কম হলে সবচেয়ে ভালো। তলায় কাদার পরিমাণ কোনোক্রমেই ৬ ইঞ্চি এর বেশি হওয়া উচিত নয়;

- পুকুরটি যেন খোলামেলা হয়। অর্থাৎ পুকুরটিতে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস লাগে। পুকুর পাড়ে কোনো ছায়া প্রদানকারী বা নির্দিষ্ট ঋতুতে পাতা ঝরে যায় এমন গাছপালা না থাকাই ভালো। পুকুরে প্রত্যেক দিন কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা সূর্যের আলো পড়া উচিত;
- মাটির ধরন অনুযায়ী (এঁটেল ১ঃ১ এবং দোঁ-আশ ১ঃ২) পুকুর পাড়ের ঢাল হলে ভালো হয়;
- পাড়ের পরে কমপক্ষে ৫ ফুট বকচর থাকলে ভালো হয়;
- মাছচাষে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় উপকরণসমূহ (চুন, সার, মাছের খাদ্য, ঔষধ প্রভৃতি) যেন অতি সহজে পাওয়া যায়;
- চাষকৃত মাছের পোনা সহজে এবং সুলভ মূল্যে সারা বছরই যেন পাওয়া যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া;
- পুকুরের মালিকানা একক এবং নিজস্ব হলে সবচেয়ে ভালো। ইজারা পুকুর হলে তা দীর্ঘমেয়াদি-কমপক্ষে ৫ বছর হতে হবে;
- পুকুর বসতবাড়ির কাছাকাছি হলে সবচেয়ে ভালো। এতে পুকুরের ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার সুবিধা হয়, মাছ চুরির ভয় থাকে না;
- বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের নিমিত্তে পুকুরের পাশে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়,
- পরিশেষে উৎপাদন সামগ্রী পুকুর পাশে আনা এবং উৎপাদিত মাছ দ্রুত বাজারজাতকরণের জন্য ভালো রাস্তাঘাট থাকা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি মাছচাষের জন্য অনুকূল তাই উক্ত স্থানকে মাছচাষের ক্ষেত্রে খামার বা পুকুরের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। স্থান নির্বাচনের পরে পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে।

গ. পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা নির্ণয় করা : মাছচাষ ব্যবস্থাপনার ধরন অনুযায়ী পুকুর যেকোনো আকার এবং আয়তনের হতে পারে। তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মজুদ পুকুরের আয়তন ১ একর এবং তা আয়তাকার উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি হলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি হলে বছরের যেকোনো ঋতুতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস লাগবে ফলে পুকুরের পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি হবে যা পানিতে অক্সিজেন মেশাতে সহায়তা করবে। মাছচাষ কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী পুকুরের পানির গভীরতা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। যেমন- মজুদ পুকুরের জন্য ৬ ফুট এবং নার্সারি পুকুরের জন্য ৩ ফুট গভীরতা হলো আদর্শ গভীরতা। পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা সম্পর্কে ধারণা অর্জনের পরে পুকুর প্রস্তুতির সঠিক নিয়মাবলি অনুসরণ করতে করতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি : মাছচাষের পুকুরে আশানুরূপ উৎপাদনের জন্য শুরুতেই পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। পুকুর প্রস্তুত করার মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের জন্য নিরাপদ আবাস, উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। এক এক ধরনের পুকুরের জন্য এক এক ধরনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন–

নতুন পুকুর

- বৃষ্টিতে পাড় ভেঙে পানি যেন ঘোলা না হয় সে জন্য পুকুরের নতুন পাড়ে দূর্বা জাতীয় ঘাস লাগানো;
- মাটি কাটার পরে তলার মাটিকে আলগা করার জন্য তলায় হালচাষ দেয়া;
- এঁটেল মাটির পুকুরে ঘোলাত্ব প্রতিরোধকল্পে ১০ কেজি/শতাংশ হারে ছাই প্রয়োগ করে সামান্য পানি দিয়ে হালচাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

পুরাতন পুকুর

পুকুর পুরাতন হলে কোনো কোনো সময় অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন–

- পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করা;
- তলায় অতিরিক্ত (৬" এর বেশি) পচা কাদা থাকলে তা তুলে ফেলা;
- পুকুর পাড়ে ছায়া প্রদানকারী গাছের বড় ডালপালা থাকলে তা ছেঁটে ফেলা;
- মৎস্যভুক (রাক্ষুসে) ও অবাঞ্ছিত মাছ থাকলে তা দূর করা ও
- জলজ আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করা।

ঘ. জলজ আগাছা দমন : পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছের উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে। পুকুরে কোনোক্রমেই জলজ আগাছা রাখা যাবে না কারণ এরা মাটি ও পানি থেকে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে যা প্ল্যাংকটনের বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তারের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পুষ্টিকর পদার্থের অভাবে প্ল্যাংকটন এবং সেই সাথে মাছেরও উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলজ আগাছা মাছের চলাচল এবং পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয় তথা প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। কোনো কোনো সময় আগাছা মাছের রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল বা বাহক হিসেবেও কাজ করে। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাসমান আগাছা পুকুরের পানিতে থাকলে বাতাস পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি করতে পারে না ফলে পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ কম হয়। কাজেই মাছচাষের পুকুরে জলজ আগাছা রাখা যাবে না।

ঙ. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ : জলজ আগাছা দমনের পরে পুকুর থেকে অবশ্যই মৎস্যভুক ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। রাক্ষুসে এবং অবাঞ্ছিত মাছ আমরা দুইভাবে দূর করতে পারি। যেমন–

পানি শুকিয়ে : বিভিন্ন ধরণের পাম্প মেশিন দ্বারা পুকুর শুকানো যেতে পারে। পুকুর শুকানোর পরে তলায় যদি ৬ ইঞ্চির বেশি পচা কাদা থাকে তাহলে অতিরিক্ত পচা কাদা তুলে ফেলতে হবে। আর কোনো ক্রমেই যদি পুকুর শুকানো সম্ভব না হয় তাহলে বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ তুলে ফেলতে হবে। এর পরেও যদি ক্ষতিকারক মাছ থেকে যায় বলে সন্দেহ হয় তাহলে বাজারের সহজলভ্যতা অনুসারে অনুমোদিত মাত্রায় মাছ মারার ওষুধ (বিষ) প্রয়োগ করতে হবে।

ওষুধ (বিষ) প্রয়োগ করে : নিচে মাছ মারার বিভিন্ন ওষুধের (বিষ) নাম এবং প্রয়োগমাত্রা দেয়া হলো। সুবিধামতো ওষধটি বেছে নিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে মৎস্যভুক (রাক্ষুসে) ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে রোটেনন পাউডার সবচেয়ে ভাল ওষুধ কারণ এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এর দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যেতে পারে যা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। এ রোটেনন পাউডার ডেরিস নামক গাছের

বিষের নাম	প্রয়োগ মাত্রা
রোটেনন	২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি
ফসটক্সিন/কুইকফস	১টি ট্যাবলেট/শতাংশ/ফুটপানি
ব্লিচিং পাউডার	১ কেজি/শতাংশ/ফুট পানি
চা বীজের খৈল	১ কেজি/শতাংশ/ফুট পানি
মহুয়ার খৈল	৩ কেজি/শতাংশ/ফুট পানি

চ. চুন প্রয়োগ : রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের পরে পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পানি চাষযোগ্য রাখতে, মাছের বসবাসের জন্য পরিবেশ উপযোগী রাখতে, মাছকে রোগমুক্ত রাখতে মাছচাষের পুকুরে অবশ্যই নিয়মিতভাবে চুন বা চুন সদৃশ উপকরণ প্রয়োগ করতে হয়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা

- চুন মাছচাষের পরিবেশকে অর্থাৎ মাটি ও পানির অম্ল-ক্ষারত্বকে নিরপেক্ষ করে;
- চুন মাছের কাঁটা ও আঁইশ গঠনে সহায়তা করে;
- মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করে;
- পুকুরের তলায় অবস্থিত পচা জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে;
- মাটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ মাটি হতে পানিতে মুক্ত করে প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ও
- চুন বাফার হিসেবে কাজ করে।

চুন প্রয়োগের সময় : যদি রোটেনন প্রয়োগ করা হয় তবে রোটেনন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর এবং সার প্রয়োগের বিশেষ করে টিএসপি সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন আগে চুন প্রয়োগ করতে হয়।

চুন প্রয়োগের মাত্রা : মাটির ধরন ও পুকুরের বয়স অনুযায়ী শতাংশ প্রতি চুন প্রয়োগের মাত্রা।

মাটি	নতুন পুকুর	পুরাতন পুকুর
দোঁ-আশ মাটি	১ কেজি	২ কেজি
এটেল মাটি	২ কেজি	৩ কেজি

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি : দুই ধরনের (শুষ্ক এবং পানি ভর্তি) পুকুরে দুইভাবে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর যদি শুকনো হয় তাহলে–

শুকনো পুকুরে চুন প্রয়োগ : পুকুর যদি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় অথবা নতুন করে পুকুর খনন করা হয় তাহলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন ভালোভাবে গুঁড়া করে যখন বাতাস থাকবে না তখন বকচরসহ সমস্ত পুকুরের শুষ্ক তলদেশে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর পরে লাঙ্গল দ্বারা চাষ করে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চুন গুঁড়া করতে অসুবিধা হলে চুনকে শক্ত মাটির উপর রেখে অল্প পরিমাণে পানি ছিটিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে চুন গুঁড়া হয়ে যাবে তখন গুঁড়া চুন ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

পানি ভর্তি পুকুরে চুন প্রয়োগ : মাছচাষ চলমান অবস্থায় পুকুরে চুন দেয়ার প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন সুবিধাজনক কোনো পাত্র যেমন- স্টিলের বালতি বা হাফ ড্রামে কিংবা ইউরিয়া বা টিএসপির প্লাষ্টিকের খালি বস্তায় অর্ধেক পরিমাণ চুন দ্বারা ভর্তি করে বস্তার একদম উপরের অংশে রশি দ্বারা মুখ বেঁধে বড় পুকুর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি (কমপক্ষে ৩ ফুট) থাকলে সে পুকুরে ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে। পরে চুন ভিজে ঠাণ্ডা হলে তা গুলে নিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে বকচরসহ সমস্ত পুকুরে বিকেলে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বড় পুকুরে নৌকা বা কলাগাছের ভেলা ব্যবহার করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, মাছ ভর্তি পুকুরে কোনো অবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত চুন প্রয়োগ করা যাবে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্রথমে ১/২ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করে ৭ দিন পরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার প্রয়োগের পরেও যদি পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি না হয় তাহলে আবারও শতাংশপ্রতি ১/২ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে পুকুরে একবার চুন প্রয়োগ করে বন্ধ রাখা উচিত নয়। বরং প্রতি ৩ অন্তর অন্তর সার প্রয়োগের অন্তত ৭ দিন আগে শতাংশপ্রতি ১/২ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

চুন প্রয়োগে সতর্কতা

- চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক মুখ গামছা দিয়ে ভালভাবে বাঁধতে হবে;
- প্লাস্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না;
- পাত্রে চুন রেখে তার পর পানি ঢালতে হবে;
- পানি ঢালার আগে পাত্রের মুখ বা চুন অবশ্যই চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;
- বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে। চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর পুকুরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

ছ. সার প্রয়োগ : পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয় পরোক্ষভাবে মাছের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করার জন্য। সার প্রয়োগের ফলে পুকুরের পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা বৃদ্ধি পায়। ফলে পুকুরে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ তাদের আমিষ চাহিদার ৪০-৭০% পূরণ করতে পারে। কার্পজাতীয় মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য হচ্ছে প্ল্যাংকটন। প্ল্যাংকটন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, পুকুরের তলার কীট প্রভৃতি মাছের প্রিয় খাদ্য। এসব প্ল্যাংকটন ও জীবের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য পুকুরে পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ সরবরাহ করতে হয়। পুষ্টিকারক উপাদানসমূহের মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব পদার্থ বাজারে সরাসরি পাওয়া যায় না। তা বাণিজ্যিকভাবে দু'ধরণের যৌগের আকারে সার হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন- জৈব সার ও অজৈব বা রাসায়নিক সার।

জৈব সার : জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত সারকে জৈব সার বলে। যেমন- গোবর, কম্পোস্ট সার প্রভৃতি।

অজৈব বা রাসায়নিক সার : সুনির্দিষ্ট উপাদান সমৃদ্ধ যেসব সার কৃত্রিম উপায়ে কারখানাতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে তাদের অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে। যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ ইত্যাদি। পুকুরে সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

- মাটির অবস্থা;
- পানির মধ্যকার শ্যাওলার পুষ্টি চাহিদা;
- পরিবেশের ভারসাম্য;
- সারের গুণাগুণ এবং
- মাছের ঘনত্ব।

সার প্রয়োগের উপকারিতা

পুকুরে সার প্রয়োগ করলে নিম্ন লিখিত উপকার পাওয়া যায় :

- সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা হয়। এসব পুষ্টি উপাদানসমূহ মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে;
- পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। ফলে মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়;

- সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়;
- জৈব সার বিশেষ করে গোবরে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে। পুকুরে এটা ব্যবহার করলে এ আঁশ ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়াও রুই ও তেলাপিয়া মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে;
- পরিশেষে অল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

সার প্রয়োগের মাত্রা : কোন ধরনের পুকুরে কোনো জাতীয় সার কতটুকু প্রয়োগ করতে হবে তা অভিজ্ঞতার আলোকেই ঠিক করে নিতে হবে। তবে একজন দক্ষ মৎস্য চাষি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পানির বর্ণ দেখেই বলে দিতে পারেন তার পুকুরের জন্য কতটুকু সার প্রয়োজন। স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় মাছচাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতকালীন এবং মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সার প্রয়োগের মাত্রা

পুকুর প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ		মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ		
সারের নাম	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ
	প্রতি শতাংশে	শতাংশ/দিন	শতাংশ/সপ্তাহ	বিঘা/দিন
গোবর সার	১০ কেজি	২০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	৭ কেজি
কম্পোষ্ট সার	১০ কেজি	২০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	৭ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম	৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫ গ্রাম	৩ গ্রাম	২১ গ্রাম	১০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের পদ্ধতি

উল্লিখিত পরিমাণ সার দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক কিস্তিতে শুকনো অথবা পানি ভরা পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুর যদি শুকনো হয় তাহলে পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে নিম্নে লিখিতভাবে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শুকনো পুকুরে সার প্রয়োগ : পুকুর যদি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় অথবা নতুন করে পুকুর খনন করা হয় তাহলে সে সব পুকুরের শুষ্ক তলদেশে শতাংশপ্রতি ১০ কেজি গোবর সার অথবা ১০ কেজি কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের পরপরই সম্ভব হলে কমপক্ষে ১ ফুট পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে জৈব সার পচে মৌলিক উপাদানসমূহ পানিতে মিশতে পারবে এবং পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। এর পরে আস্তে আস্তে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে পোনা মজুদের ৭ দিন পূর্বে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাসায়নিক সার (ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম/শতাংশ এবং টিএসপি ৭৫ গ্রাম/শতাংশ) পানিতে গুলে প্রখর সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভরা পুকুরে সার প্রয়োগ : মাটির চারিতে অথবা ড্রামে জৈব সার ও টিএসপি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিতে একরাত ভিজিয়ে প্রয়োগের আগে ইউরিয়া মিশিয়ে পাতলা করে সমানভাবে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ভাল ফল পেতে হলে মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন পুকুরে উল্লেখিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগে সতর্কতা

- পুকুরে আগাছা থাকলে সারের কার্যকারিতা কমে যায়,
- পুকুরে পানির স্থায়িত্ব কম হলেও সারের কার্যকারিতা কমে যাবে,
- মেঘলা দিনে অথবা বৃষ্টির মধ্যে সারের ব্যবহার খুব কার্যকর নয় ও
- চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করা উচিত।

জ. পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষাকরণ : পুকুরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমনে বিষ প্রয়োগ করা হলে পোনা মজুদের পূর্বে পানিতে অবশ্যই বিষক্রিয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করে পরে পোনা মজুদ করতে হবে। বিষক্রিয়া পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট পুকুর হতে এক বালতি পানি নিয়ে তার মধ্যে ৪/৫টি সুস্থ সবল পোনা ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টায় যদি পোনা মারা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলে জলায়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

ঙ. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষাকরণ : পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে। বিভিন্নভাবে আমরা এ প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে পারি। যেমন- পুকুরের পানির রং দেখে, পানিতে সেকি ডিস্ক ডুবিয়ে পুকুরের পানির রং দেখে, প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষাকল্পে একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পুকুর হতে পানি নিয়ে সূর্যের আলোতে ধরলে যদি গ্লাসের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণিকণা (গ্লাস প্রতি ৫-১০টি) দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। তখন পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

অনুশীলনী- ৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ?
২. পুকুরের পানিতে দৈনিক কত ঘন্টা সূর্যের আলো পড়া উচিত?
৩. পুকুরের পানির ঘোলাত্ব প্রতিরোধকল্পে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৪. কোন মাটির পুকুর মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম?
৫. পুকুরের তলদেশে কতটুকু কাদা মাছচাষের জন্য উপযোগী?
৬. নার্সারি পুকুরের আদর্শ গভীরতা কত?
৭. জলজ আগাছা কাকে বলে?
৮. কত উপায়ে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
৯. পুকুরে অত্যধিক উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন নিয়ন্ত্রণে কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়?
১০. রোটেনন কোন উদ্ভিদ হতে তৈরি করা হয়?
১১. রাক্ষুসে মাছ দমনে শতাংশপ্রতি রোটেননের মাত্রা কত?
১২. পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে কী মাত্রায় টিএসটি সার ব্যবহার করা হয়?
১৩. পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে কী মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়?
১৪. পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য কী?
১৫. পাড়ে দূর্বা জাতীয় ঘাস লাগানোর উপকারীতা কী?
১৬. এঁটেল মাটির পুকুরে ঘোলাত্ব প্রতিরোধকল্পে কী ব্যবহার করা যেতে পারে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ বলতে কী বুঝ?
২. বাজারে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন ধরনের চুন ও চুন সদৃশ উপকরণের নাম লেখ?
৩. পুকুরে কীভাবে চুন প্রয়োগ করা হয়?
৪. বিভিন্ন প্রকার সারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের নাম লেখ।
৫. পুকুরে সার প্রয়োগের উপকারিতা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মৎস্য খামার বা পুকুর খননের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
২. অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. চুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. পুকুর প্রস্তুতির সময় সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

মিশ্রচাষে পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদকালীন সময়ে যেসব ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাকে মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা বলে। এক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি পালন করতে হয় তা নিম্নরূপ–

ক. প্রজাতি নির্বাচন
খ. পোনার পরিমাণ নির্ধারণ
গ. ভালো ও খারাপ পোনা শনাক্তকরণ
ঘ. পোনার পেট খালিকরণ
ঙ. পোনা পরিবহন
চ. পোনা শোধন
ছ. পোনা অভ্যস্তকরণ
জ. পোনা মজুদকরণ

ক. প্রজাতি নির্বাচন : প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষিকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

- চাষকৃত প্রজাতিকে অবশ্যই দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে;
- মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রজাতি গুলোর পোনা যেন নিজ এলাকায় অথবা এলাকার কাছাকাছি পাওয়া যায়;
- চাষকৃত প্রজাতি যেন একে অন্যের সাথে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগীতা না করে;
- চাষকৃত প্রজাতিগুলোর স্বভাব যেন রাক্ষসে বা মৎস্যভুক না হয়;
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় এমন বৈশিষ্ট্যাবলি থাকলে ভালো হয়;
- মাছগুলোর এলাকাগত চাহিদা এবং বাজারমূল্য যেন ভালো হয়;
- পরিশেষে নির্বাচিত প্রজাতিটির চাষ ব্যবস্থাপনা যেন সহজ হয়।

খ. পোনার পরিমাণ নির্ধারণ : মাছ চাষের জন্য নির্বাচিত জাত বা প্রজাতির পোনার মধ্যে কোনটি কত সংখ্যায় মজুদ করা যেতে পারে তা নিচে লিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে।

১. চাষ পদ্ধতি;
২. পুকুরের উৎপাদনশীলতা ও চাষের জন্য প্রাপ্ত সময়কাল এবং
৩. উৎপাদিত মাছের আকার।

১. চাষ পদ্ধতি : কোন পুকুর বা জলাশয়ে মাছ চাষের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ঐ পুকুরে কী পরিমাণে পোনা মজুদ করা হবে। ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে মাছচাষ পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

● সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি;
● আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি এবং
● নিবিড় চাষ পদ্ধতি।

নিচে বিভিন্ন ধরনের চাষ পদ্ধতির সাথে মাছের মজুদ ঘনত্ব, প্রাকৃতিক খাদ্য এবং সম্পূরক খাদ্যের সম্পর্ক দেখানো হলো-

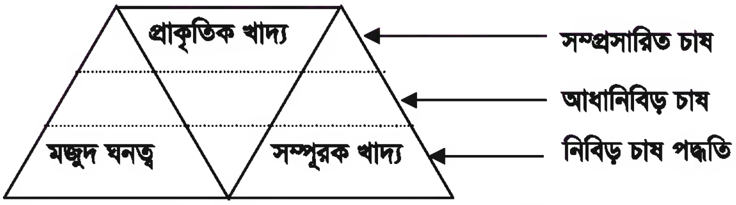

চিত্র-২৭ : বিভিন্ন ধরনের চাষ পদ্ধতির সাথে মাছের মজুদ ঘনত্ব, প্রাকৃতিক খাদ্য এবং সম্পূরক খাদ্যের সম্পর্ক

সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব সবচেয়ে কম। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর অর্থাৎ কোন প্রকার সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না। আমাদের দেশের অনেক পুকুর-দিঘি এখনও সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির আওতায়।

আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির চেয়ে একটু বেশি। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু কিছু সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে কয়েক প্রজাতির মাছ একত্রে (মিশ্রচাষ) বা শুধু এক প্রজাতির মাছচাষ করা যায়। আমাদের দেশে এ পদ্ধতিতে মাছচাষ বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে।

নিবিড় চাষ পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হচ্ছে আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি যেখানে মজুদ ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে। প্রাকৃতিক খাদ্যের ব্যবহার সবচেয়ে কম থাকে। সম্পূরক খাদ্যের ওপর মাছের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করা হয় যাতে অব্যবহৃত খাদ্য বেশি ঘনত্বে বসবাসকারী মাছের জন্য কোন ক্ষতি করতে না পারে। ব্যয়বহুল এ মাছচাষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে অনুকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত এক প্রজাতির মাছচাষ করা হয়। আমাদের দেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছের চাষ এখনও প্রসার লাভ করেনি।

২. পুকুরের উৎপাদশীলতা ও চাষের জন্য প্রাপ্ত সময় : মাটি ও পানির গুণাগুণ অনুযায়ী পুকুরের উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন পুকুরে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- বেলে ও এঁটেল মাটির পুকুরের উৎপাদনশীলতা দো-আঁশ মাটির পুকুরের চেয়ে কম। সুতরাং কম উৎপাদনশীল পুকুরের মজুদ ঘনত্ব কম রাখতে হয়। একইভাবে মৌসুমি পুকুর যেগুলো বছরের ৬-৭ মাস পানি থাকে এমন পুকুরের মজুদ ঘনত্ব সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুরের চেয়ে কম হয়ে থাকে।

৩. উৎপন্ন মাছের আকার : মজুদ ঘনত্বের ওপর মাছের আকার নির্ভর করে। সম্প্রসারিত পদ্ধতিতে কম ঘনত্বে মাছ মজুদ করা হয় বলে মাছের আকার বড় হয়। পক্ষান্তরে নিবিড় পদ্ধতিতে বেশি ঘনত্বে মাছ মজুদ করা হয় বলে মাছের আকার তুলনামুলকভাবে ছোট হয়। সম্প্রসারিত পদ্ধতির চেয়ে নিবিড় পদ্ধতিতে মোট মাছের উৎপাদন বেশি হয়। সুতরাং বড় আকারের মাছ উৎপাদন করতে চাইলে কম ঘনত্বে মাছ মজুদ করতে হবে। তবে পোনা মজুদের আগে অবশ্যই পোনা ভালো না খারাপ তা শনাক্ত করতে হবে।

গ. ভালো ও খারাপ পোনা শনাক্তকরণ : মাছের পোনার প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব সম্পর্কে জানার পর পোনা কীভাবে চেনা যায় তা জানা দরকার। নিচের ছকে ভালো ও খারাপ পোনা শনাক্তকরণের লক্ষ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য

উল্লেখ করা হলো।

পর্যবেক্ষণের বিষয়	ভালো পোনা	খারাপ পোনা
চলাফেরা	চঞ্চল	স্থির
আঁইশ	চকচকে	দাগযুক্ত
পাখনা	অক্ষত	ছেঁড়া, ভাঙ্গা
রঙ	উজ্জ্বল	বিবর্ণ
শরীরের দাগ	কোনো দাগ নেই	গায়ে, পাখনায়, ফুলকায় দাগ থাকে
গোলাকার পাত্রে রেখে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	পাত্রের মাঝখানে জমা হয়

ঘ. পোনার পেট খালিকরণ : পোনা পরিবহনের পূর্বে পোনার বিপাকক্রিয়া কমানো এবং অক্সিজেন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পোনার পেট খালি করা হয়। এজন্য পুকুর হতে মাছ ধরে কমপক্ষে ৪-৬ ঘণ্টা হাপায় রাখলে পোনার পেট খালি হবে তখন পরিবহনের সময় পাত্রের পানি নষ্ট হবে না। তা না হলে পোনা মল বা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে পানির গুণাগুণ নষ্ট করে। পোনা পরিবহনকারীদের ভাষায় পোনার পেট খালিকরণের এ পদ্ধতিকে পোনা পাকাকরণ বা টেকসইকরণ বলে।

ঙ. পোনা পরিবহন : সঠিকভাবে পোনা পরিবহন মাছচাষে ভালো ফল লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যদি সঠিক নিয়মে পোনা পরিবহন করা না হয় তাহলে পোনার ওপর শারীরবৃত্তীয় বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে যা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পোনা মজুদের পর পোনা মৃত্যুর হারও অনেক বেড়ে যায়। পোনা পরিবহনের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো পোনার আকার, প্রজাতি, পরিবহন স্থানের দূরত্ব এবং পরিবহন পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনা করা। নিচে পোনা পরিবহনের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য এসব বিষয়সমূহ কী প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করা হলো।

- ছোট পোনার চেয়ে বড় পোনার অক্সিজেন চাহিদা আনুপাতিক হারে অনেক কম (১ কেজি ছোট পোনা ১ কেজি বড় পোনার চেয়ে বেশি অক্সিজেন নেয়) তাই পোনা পরিবহনের সময় বড় পোনার চেয়ে ছোট পোনার ঘনত্ব কম অথবা অক্সিজেন সরবরাহ বেশি হওয়া প্রয়োজন;
- সব প্রজাতির মাছের অক্সিজেন চাহিদা সমান নয়। যেমন- সিলভার কার্প এবং কাতলার অক্সিজেন চাহিদা অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে অনেক বেশি। তাই সিলভার কার্প এবং কাতলার পরিবহন ঘনত্ব অন্যান্য মাছের চেয়ে কম হবে;
- অধিক দূরত্বে পোনা পরিবহন করতে হলে অক্সিজেন সম্বলিত পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহন সবচেয়ে উত্তম। দূরত্ব বেশি হলে পোনাকে টেকসইকরণ করে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা খাবার ছাড়া রেখে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর কম দূরত্বে পরিবহন করতে হলে জাল টেনে মাছ ধরে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা হাপায় রেখে পরে পরিবহন করা যেতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণত দু'ভাবে পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে।

সনাতন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের হাঁড়িতে অথবা ড্রামে করে কাঁধে, বাইসাইকেলে বা ভ্যানে পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে।

আধুনিক পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেনসহ পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে।

পরিবহনের সময় পোনার ঘনত্ব : পরিবহনের সময় পোনার ঘনত্ব পোনার আকার, পরিবহন স্থানের দূরত্ব, পরিবহন পদ্ধতি প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল যা নিচে ছকে দেখানো হলো।

সারণি-৩ : পরিবহনকালীন সময়ে পোনার ঘনত্ব

পরিবহন পদ্ধতি	পোনার ঘনত্ব প্রতি লিটার পানিতে	পরিবহন স্থানের দূরত্ব (ঘন্টা)	পোনার আকার (ইঞ্চি)
অক্সিজেন ব্যাগ	৩০-৩৫	১০-১২	১.০
ঐ	২০	১০-১২	১.৫
ঐ	১০	১০-১২	২.০
ঐ	৫	১০-১২	২.৫
ঐ	৪	১০-১২	৩.০
পাতিল/ড্রাম	১৫	৩-৪	২.০

পোনা পরিবহনকালে করণীয় : পরিবহনকালে মাছ কর্তৃক নিঃসৃত মল পচনের ফলে পাত্রে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় যার ফলে পানি বিষাক্ত হয়ে পোনা মারা যেতে পারে। বিশেষ করে ২১ দিনের কম বয়সের পোনার ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া বেশি ঘটে থাকে। অ্যামোনিয়ার কারণে পোনার অবস্থা খারাপ হলে ৩ গ্রাম/লিটার হিসেবে খাবার লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোনা পরিবহনে সতর্কতা

- পোনা পরিবহনের সময় পাত্রের পানি গরম হয়ে গেলে প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম বরফ যোগ করে পানির তাপমাত্রা কমিয়ে আনা যেতে পারে;
- অধিক দূরত্বে পোনা পরিবহন করতে হলে চেতনানাশক ব্যবহার করে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ড্রাই আইস (শুষ্ক কার্বন ডাই-অক্সাইড), এম.এস ২২২, কুইনালডিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকতে হবে। অক্সিজেন ঘাটতি থাকলে সমস্ত পোনাই মারা যেতে পারে।

চ. পোনা শোধন : পোনা পরিবহনকালে অনেক সময় পরিবহন পাত্রের সঙ্গে ঘর্ষনের ফলে পোনা আহত হতে পারে ফলে ঐ পোনা পুকুরে মজুদ করলে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক খুব সহজেই মাছের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটাতে পারে যা মাছের মড়কের কারণও হতে পারে। তাই পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বে পোনাগুলোকে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া ভাল। একটি বালতির মধ্যে ১০ লিটার পানিতে এক চা চামচ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট অথবা ২০০ গ্রাম লবণ মেশাতে হবে। উল্লেখিত মিশ্রণে ৩০০-৫০০টি পোনা শোধন করা যেতে পারে। এ মিশ্রণে পোনাগুলোকে ৩০ সেকেন্ড গোসল করানোর পর পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

চ. পোনা শোধন : পোনা পরিবহনকালে অনেক সময় পরিবহন পাত্রের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে পোনা আহত হতে পারে ফলে ঐ পোনা পুকুরে মজুদ করলে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক খুব সহজেই মাছের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটাতে পারে যা মাছের মড়কের কারণও হতে পারে। তাই পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বে পোনাগুলোকে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া ভালো। একটি বালতির মধ্যে ১০ লিটার পানিতে এক চা চামচ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট অথবা ২০০ গ্রাম লবণ মেশাতে হবে। উল্লিখিত মিশ্রণে ৩০০-৫০০টি পোনা শোধন করা যেতে পারে। এ মিশ্রণে পোনাগুলোকে ৩০ সেকেন্ড গোসল করানোর পর পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

ছ. পোনা অভ্যস্তকরণ : মাছ চাষের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধাপের ন্যায় পোনা অভ্যস্তকরণ ধাপটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছ একটি চঞ্চল প্রাণী। যখন সে পুকুরে অবস্থান করে তখন সে একটি বিশাল পরিবেশকে ব্যবহার করে। কিন্তু হঠাৎ করেই যখন কোনো মাছকে পুকুর থেকে তুলে হাঁড়িতে বা ড্রামে করে পরিবহন করা হয়। তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে পারিবেশিক বিরূপ চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে অনেক মাছ পরিবহনের সময়ই মারা যায় বা অনেকেই মুমূর্ষু অবস্থায় পুকুর পর্যন্ত পৌঁছে। এভাবে পরিবহনকৃত মাছকে পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত না করে অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে পুকুরে ছেড়ে থাকেন। ফলে অর্ধেক পোনাই নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে মারা যায়। ছোট পোনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে রেণুপোনার ক্ষেত্রে এ মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশি। তাই পোনা অবমুক্তকরণের পূর্বে অবশ্যই পোনা অভ্যস্তকরণ করে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে।

জ. পোনা অবমুক্তকরণ : এমনিভাবে পরিবহনকৃত পোনা প্রজাতিভিত্তিক সঠিকভাবে গুণে নিম্নলিখিত ধাপের মাধ্যমে পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে -

- পলিথিন ব্যাগে/হাঁড়িতে পোনা পরিবহন করলে সেই ব্যাগ/হাঁড়ি পুকুরের পানিতে বেশ কিছুক্ষণ ভাসিয়ে রেখে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে;
- তারপর ব্যাগের মুখ/হাঁড়ির মুখ খুলে দিয়ে নিজের হাত বা থার্মোমিটার দিয়ে পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান দেখতে হবে;
- তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত পাত্রের কিছু পানি পুকুরে এবং পুকুরের কিছু পানি পাত্রে নিতে হবে;
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে ব্যাগটি পুকুরের দিকে কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে;
- মৃদু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় (সকাল/বিকাল) পোনা ছাড়া ভালো। দুপুরের কড়া রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পোনা ছাড়া উচিত নয়।

সারণি-৪ : বাৎসরিক পুকুরে শতাংশপ্রতি পোনা মজুদের নমুনা

প্রজাতির নাম	পোনার আকার (ইঞ্চি)	গড় ওজন (গ্রাম)	আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি	সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি
সিলভার কার্প	৪-৫	২০-৩০	১০	৪-৫
কাতলা	৪-৫	৪০-৫০	৫	৩-৪
রুই	৪-৬	৩০-৪০	৭	৪-৫
মৃগেল	৪-৬	৩০-৪০	৫	৩
কমন কার্প	৩-৪	৩০-৪০	২	২-৩
গ্রাসকার্প	৪-৬	৩০-৪০	৩	১-২
রাজপুঁটি	১-২	১০-১৫	১০	১
মোট			৪২	১৮-২৩

অনুশীলনী-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পোনার পরিমাণ নির্ধারণ পুকুরের কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
২. সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে ১ শতাংশ পুকুরে কতটি পোনা মজুদ করা যায়?
৩. পোনা শোধনের জন্য কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়?
৪. পুকুরে কখন পোনা ছাড়া ভালো?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে মাছ চাষ পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?
২. নিবিড় চাষ পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?
৩. ভালো ও খারাপ পোনা কিভাবে শনাক্ত করা যেতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পোনা পরিবহনের আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. মিশ্রচাষে প্রজাতি নির্বাচন বা মাছের জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
৩. পোনা শোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৪. পোনা অভ্যস্তকরণ ও পোনা অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

মিশ্রচাষে পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পরে যেসব ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বলে। এক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে তা হলো-

ক. পোনা বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ;
খ. সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ;
গ. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ;
ঘ. নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ;
ঙ. ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন করা;
চ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা;
ছ. রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
জ. রোগাক্রান্ত মাছের চিকিৎসা করা;
ঝ. মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ করা;
ঞ. রেকর্ড সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং
ট. সফলতা বা ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা।

ক. পোনা বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ : পুকুরে পোনা ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পর (৬-১২ ঘণ্টা) পাড়ের কাছে বা পানির উপর চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কোনো পোনা মারা গেল কিনা দেখা দরকার। পোনা মারা গেলে ভেসে উঠবে বা পাড়ের কাছাকাছি ভেসে থাকবে। যদি বেশি পোনা মারা যায় তাহলে সমসংখ্যক পোনা আবার পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : অন্যান্য প্রাণীর মতো মাছকেও বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য পরিমিত পরিমাণ সুষম পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সুষম পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া মাছের দ্রুত বৃদ্ধি তথা সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব নয়। পুকুরে মাছের যে প্রাকৃতিক খাবার থাকে তা মাছচাষে অধিক উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই মাছের অধিক উৎপাদন পেতে হলে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি : সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতের সময় খাদ্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের গুণগতমান, সহজলভ্যতা ও বাজারদরকে প্রাধান্য দিতে হয়। কেননা প্রস্তুতকৃত খাদ্যের গুণগতমান ভালো রেখে বাজার মূল্য যত কম হবে মাছের উৎপাদন খরচ তত কম হবে। সাধারণত মাছের দেহ বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে ৩০% এর বেশি আমিষের প্রয়োজন হয় না। এখন যদি ৩০% আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদান দিয়ে মাছের খাদ্য তৈরি করতে হয় তাহলে প্রথমেই বেছে নিতে হবে কী কী উপকরণ বা কাঁচামাল মিলিয়ে খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। যা নবম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ এবং খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ : মজুদকৃত মাছের জন্য কতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন তা জানার জন্য অবশ্যই পুকুরের মজুদকৃত মাছের মোট জীবভর বের করতে হবে। জীবভর বলতে ইকোসিস্টেমের একটি নির্দিষ্ট এলাকায়, নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক জায়গায় যে পরিমাণ জীব বিদ্যমান থাকে তাদের ওজনকে বুঝায়। যেমন- কোনো একটি

পুকুরে যে পরিমাণ মাছ ও অন্যান্য জীব বিদ্যমান থাকে তাদের ওজনকে ঐ পুকুরের জীবভর বলে। জীবভর বের করার জন্য প্রথমেই মজুদকৃত মাছের গড় ওজন বের করে সেই গড় ওজনকে মজুদকৃত মাছের মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে মোট জীবভর পাওয়া যাবে। সেই মোট জীবভরকে শতকরা হার (%) দিয়ে গুণ করলে প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের পরিমাণ পাওয়া যাবে।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পুকুরের বিভিন্ন জায়গার একটি নির্দিষ্ট স্থানে, প্রতিদিন একই সময়ে, একই সাথে কমপক্ষে ২ বার পানির ৩ ফুট নিচে খাদ্যদানি স্থাপন করে সেই খাদ্যদানিতে খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে। তবে পাংগাস এবং তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে খাদ্যদানিতে খাদ্য না দিলেও চলবে। সেক্ষেত্রে সরাসরি মাটিতে খাদ্য প্রয়োগ করলে অল্প দিনের মধ্যেই খাদ্য গ্রহণের সময় মাছের পাখনার ঘর্ষণে ঐ স্থানের কাদা মাটি সরে গিয়ে শক্ত তলা বের হবে যা খাদ্যদানির বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

গ. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ : পোনা মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ : মাসে একবার জাল টেনে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঙ. ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন

- ভোরে অক্সিজেন স্বল্পতার অভাবে মাছ খাবি খেলে পাতিল দিয়ে পানিতে ঢেউ দিতে হবে। অথবা সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পানিতে অক্সিজেন মিশে যায়;
- ইউগ্লিনা প্রজাতির প্ল্যাংকটন দিয়ে পুকুরের পানির উপরে লাল সর পড়লে খড়ের রশি টেনে তা তুলে ফেলতে হবে অথবা ইউরিয়া সারের ঘন দ্রবণ ছিটিয়ে দিতে হবে;
- পুকুরের মাটিতে বিষাক্ত গ্যাস জমা হলে হড়রা টানতে হবে;
- খারাপ আবহাওয়ায় ও শীতের সময় মাছকে কম খাদ্য দিতে হবে।

চ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : মাছচাষ যেহেতু কৃষিজাত পণ্যের একটি অংশ এবং ঋতু নির্ভরশীল। তাই এ ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ঝুঁকি থাকাই স্বাভাবিক। মৎস্যচাষির ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো হলো- বন্যা, অতিরিক্ত খরা, মাছের বাজারদর, শীতকালীন ঝুঁকি বা রোগব্যাধি, মাছ চুরি, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি। এসব সমস্যাদি নিম্নোক্তভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

- বন্যায় মাছ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বন্যা আসার আগেই বড় আকারের মাছগুলো আংশিক আহরণের মাধ্যমে ধরে ফেলতে হবে;
- শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে গেলে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে মাছচাষ সম্ভব নয় এমনকি গভীর বা অগভীর নলকূপের সাহায্যেও পানি বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা করা না যায় সেখানে অবশ্যই বিক্রয়যোগ্য মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে;
- ভালো বাজারমূল্য প্রাপ্তির নিরিখে সুযোগ এবং সামর্থ্য থাকলে সবাই যে মৌসুমে মাছ বিক্রি করবে তখন মাছ বিক্রি না করে পরে যখন বাজারে কম পরিমাণ মাছ থাকবে তখন মাছ বিক্রি করলে অনেক বেশি লাভ পাওয়া যেতে পারে;

- শীতকালে যেহেতু মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং রোগব্যাধির জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাই বিক্রয়যোগ্য মাছ বিক্রি করে পুকুরে মাছের জীবভর কমিয়ে দিতে হবে;
- নমুনায়ন (Sampling) যদি দিনের বেলায় লোক সম্মুখে করা হয় তাহলে বড় মাছ দেখে লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকেই মাছ চুরি করতে আগ্রহী হতে পারে। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে নমুনায়ন করা উচিত। এছাড়াও আহরণযোগ্য মাছ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রির ব্যবস্থা করা উচিত। মাছ চুরি থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হলো বিশ্বস্ত পাহাড়াদার নিয়োগ করা।

ছ. রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা : মাছ জলজ প্রাণী বিধায় মৃত্যু থেকে শুরু করে এর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং জলীয় পরিবেশে পানির অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। তাই ব্যাপক ধরনের কোনো রোগব্যাধী দেখা না দিলে অনেকাংশেই তা মৎস্যচাষির গোচরে আসে না। যখন মৎস্যচাষির গোচরে আসে তখন অনেক ক্ষেত্রেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই মাছচাষের ক্ষেত্রে কথায় বলে 'রোগের চিকিৎসা নয়, রোগের প্রতিরোধ বা রোগ সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং আগে থেকেই তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া'। নিচে রোগ প্রতিরোধে করণীয় পদক্ষেপসমূহ দেয়া হলো :

- শীত শুরুর আগেই পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে;
- মজুত ঘনত্ব বেশি হলে আংশিক আহরণের মাধ্যমে ঘনত্ব কমিয়ে ফেলতে হবে;
- সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে;
- পুকুরের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

জ. রোগাক্রান্ত মাছের চিকিৎসা : মাছচাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও যদি রোগ হয়েই যায় তাহলে অবশ্যই রোগাক্রান্ত মাছের সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে সেই রোগের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় বা শনাক্তকরা (Disease diagnosis)। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি দেখে রোগ নির্ণয় সম্ভব না হলে আক্রান্ত মাছের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করে কোন ধরনের সংক্রমণ হয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে সেই ধরনের নির্দিষ্ট চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। যা পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঝ. মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : পুকুর থেকে মাছ ধরার পূর্বের দিন পুকুরে অবশ্যই জাল টানতে হবে এবং সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এতে মাছ পাকা হবে অর্থাৎ মাছের দেহ শক্ত হবে। কারণ মাছের পেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য থাকলে জীবিত অবস্থায় যে এনজাইম খাদ্য হজমে সহায়তা করতো ঠিক সেই এনজাইম এবং পচনকারী ব্যাকটেরিয়া মাছ মরার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মাছকে পচাতে সহায়তা করবে। সঠিক বাজার মূল্য প্রাপ্তির নিমিত্ত মৎস্যচাষিকে অবশ্যই উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তবে পাংগাসের ক্ষেত্রে একদম খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার অনেকেই বিশেষ করে পুকুরে মাছ যখন কমে যায় তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুকুর হতে মাছ ধরার সময় মাছকে ধরে বেশ কিছু সময়ের জন্য হাপাতে রাখেন। এমন কি কখনও কখনও প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা মাছকে এভাবে রাখা হয়। মাছকে এভাবে হাপায় রাখলে পালানোর জন্য মাছ অবিরাম চেষ্টা করে। এ কারণে এভাবে রাখা মাছের ক্ষেত্রে মাছ মরার সঙ্গে সঙ্গেই গুণগতমানের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। বাজারে এ অবস্থায়

উত্তোলিত মাছকে আঞ্চলিক ভাষায় বাসি মাছ বলে। সদ্য ধৃত মাছ এবং বাসি মাছের বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। তাই সম্ভব হলে সদ্য ধৃত বা টাটকা মাছ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করলে ভাল মূল্য পাওয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ তুলে বাজারজাতকরণ করতে হবে। সম্ভব হলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে (ঈদ/পূজা) সামনে রেখে অতি সকালে মাছ বাজারজাত করতে হবে।

আশানুরূপ উৎপাদন : এ অধ্যায়ে মাছচাষের ক্ষেত্রে যেসব মূল নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বলা হয়েছে তা সঠিকভাবে মেনে চললে বছরে দুই ফসলে বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশে) কমপক্ষে ২,০০০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকা এবং উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে নিট মুনাফা ১ লক্ষ টাকা হতে পারে বলে আশা করা যায়।

ঞ. তথ্য সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও পরবর্তী পরিকল্পনা : মাছচাষে সফলতা অর্জন করতে হলে পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল তথ্যাদি রেকর্ড বইয়ে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। রেকর্ড বইয়ে চাষির নাম ও ঠিকানা, পুকুরের অবস্থান, আয়তন ও বৈশিষ্ট্য, চুন, সার, বিষ প্রয়োগের মাত্রা, মজুদকৃত পোনার প্রজাতি, সংখ্যা এবং আকার, পোনা মজুদের তারিখ, চাষকালীন সময়ে সার এবং খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা, ক্রয়মূল্য, মাছের শারীরিক বৃদ্ধির হার, মাছ আহরণ, মাছচাষে মোট ব্যয়, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি তথ্য নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব তথ্য নিয়ে মৎস্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি আগামী মৌসুমে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মাছের উৎপাদন, গুণগতমান এবং লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে সে বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। এসব তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে না রাখলে কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষেই মৎস্যচাষিকে সঠিক পরামর্শ দেয়া সম্ভব নয়।

ট. সফলতা বা ব্যর্থতার কারণসমূহ : মাছচাষে সফলতা বা ব্যর্থতা আসতেই পারে। সফলতা বা ব্যর্থতা যাই আসুকনা কেন অবশ্যই এর কারণসমূহ খুঁজে বের করতে হবে। সঠিকভাবে রেকর্ড বই সংরক্ষণ করলে এর কারণসমূহ খুঁজে পাওয়া যাবে। যদি কোনো কারণে ব্যর্থতা এসেই যায় তাহলে রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ সব তথ্যাদি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করে ব্যর্থতার মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে আনা যেতে পারে।

অনুশীলনী-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য শতকরা কত ভাগ আমিষের প্রয়োজন হয়?
২. মাছের নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীতা কী?
৩. অক্সিজেন স্বল্পতার অভাবে মাছ খাবি খেলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৪. ইউগ্লিনা প্রজাতির প্ল্যাংকটনের কারণে পুকুরে লাল স্তর পড়লে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৫. বাসি মাছ কাকে বলে?
৬. মাছ পাকাকরণ বলতে কী বুঝ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতির সময় কী কী বিষয় প্রাধান্য দেয়া উচিত?
২. পুকুরে মজুদকৃত মাছের খাদ্যের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা হয়?
৩. জীবভর (Biomass) কী?
৪. কীভাবে পুকুরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা যায়?
৫. মাছের আশানুরুপ বৃদ্ধির জন্য পুকুরে খাদ্য প্রয়োগকালিন সময়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৬. মাছচাষে ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো কী কী?
৭. শীতকালে মাছের রোগ প্রতিরোধকল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৮. মাছ চাষের ক্ষেত্রে তথ্য বা রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুকুরে সার প্রয়োগের সময় কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখা উচিত বর্ণনা কর।
২. মিশ্রচাষের জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ আলোচনা কর।
৩. পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের কৌশল আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

চাষযোগ্য মাছের খাদ্য ও পুষ্টি

মাছকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা তথা জলজ পরিবেশে নিজেকে ভারসাম্যে রেখে টিকে থাকা, শরীর গঠন ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য জলজ পরিবেশ থেকেই খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। জীবনধারণ তথা বৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত মাছ তার বসবাসরত পরিবেশ থেকে দুই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। যথা- প্রাকৃতিক খাদ্য ও কৃত্রিম বা সম্পূরক খাদ্য। এ দুই ধরনের খাদ্যই গ্রহণ করার পরে মাছের দেহে কীভাবে প্রাণাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদিত হয় তথা মাছের দেহের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তা একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল। তবে এর আগে খাদ্য বলতে কী বুঝি তা জেনে নেই।

খাদ্য : ক্ষুধা নিবারনের জন্য আহার্য্য হিসেবে মুখ দ্বারা গৃহিত যে সকল বস্তু শরীরের গঠন, বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ, তাপ উৎপাদন এবং পরিশেষে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলে তাকে খাদ্য বলে।

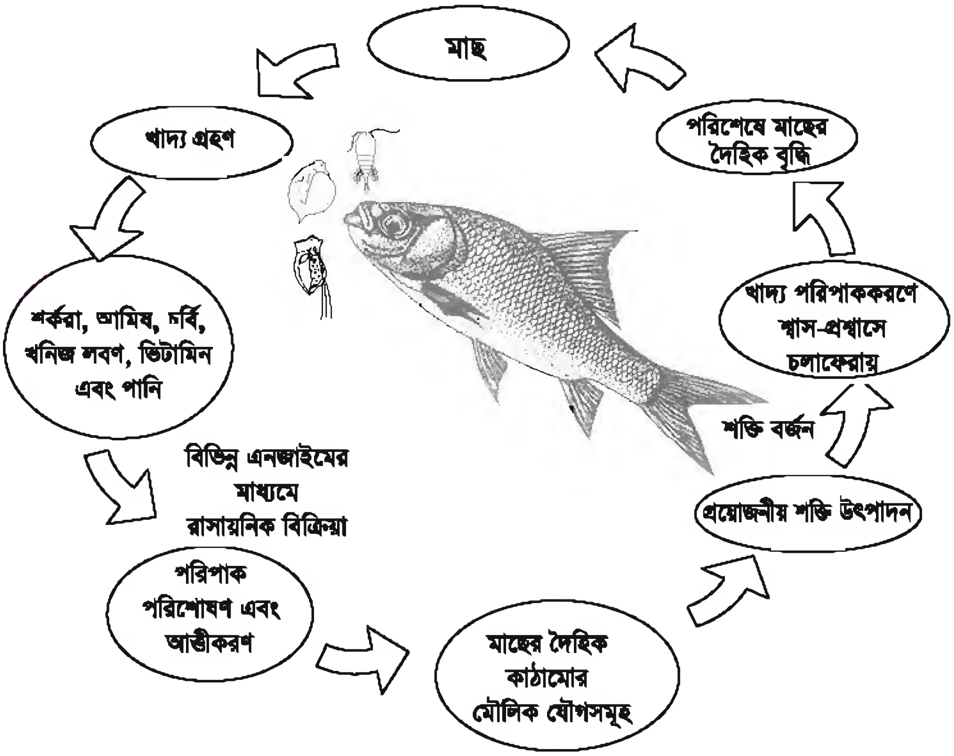
মাছ
খাদ্য গ্রহণ
শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ, ভিটামিন এবং পানি
বিভিন্ন এনজাইমের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া
পরিপাক পরিশোষণ এবং আত্তীকরণ
মাছের দৈহিক কাঠামোর মৌলিক যৌগসমূহ
প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন
শক্তি বর্জন
খাদ্য পরিপাককরণে শ্বাস-প্রশ্বাসে চলাফেরায়
পরিশেষে মাছের দৈহিক বৃদ্ধি

চিত্র-২৮ : মাছের দেহে প্রাণ রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ

মাছ বিভিন্ন উৎস হতে যেসব খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে থাকে পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে এগুলোকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ বা মিনারেলস, ভিটামিন এবং পানি। এগুলোর মধ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যে এসব পুষ্টি উপাদানের

কোনটি না থাকলে অথবা প্রয়োজনীয় অনুপাতে না থাকলে বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাতে থাকলে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যবহত হয়। সেজন্য মাছের খাদ্য তৈরি করতে উপরোক্ত পুষ্টি উপাদানসমূহ অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণে থাকতে হবে। মাছের দেহে এগুলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট এনজাইম দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে পরিপাক, পরিশোষন এবং আত্তীকরণের মাধ্যমে দৈহিক কাঠামোর মৌলিক যৌগসমূহ তৈরি হয়। এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ শক্তিই মাছের খাদ্য পরিপাককরণে, জীবন ধারণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে, বিচরণ ক্ষেত্রে নিজেকে ভারসাম্যে রেখে চলাফেরায়, বংশগতি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রজননে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদনে ব্যয় হয়ে থাকে। এসব জৈবিক ক্রিয়াদির পরিসমাপ্তির পরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র সেটুকু শক্তিই মাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে থাকে। কাজেই এখানে সুস্পষ্ট যে, খাদ্য মাছের প্রাণ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে বৃদ্ধি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে।

১. প্রাকৃতিক খাদ্য ঃ কোনো জলাশয়ের পানিতে স্বাভাবিকভাবে যেসব খাদ্য উৎপন্ন হয় সেগুলোকে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য বলা হয়। উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন (অতি ক্ষুদ্র ভাসমান সবুজ উদ্ভিদকনা), প্রাণি প্ল্যাংকটন (অতি ক্ষুদ্র ভাসমান প্রাণী কনা), বেনথস (পুকুরের তলদেশে কাদার উপরিভাগে বা কাদার মধ্যে বসবাসকারী জীব), পেরিফাইটন (জলজ উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা বা পানিতে নিমজ্জিত শুকনা ডালপালার গায়ে জন্মানো বা আশ্রয় গ্রহণকারী প্রাণী) এবং ডেট্রাইটাস (পচনশীল জৈব বস্তু বিশেষত জলাশয়ের তলদেশে কাদার উপর পুঞ্জিভূত জৈব তলানী যা ব্যাকটেরিয়া কলোনী সমৃদ্ধ) হলো মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। তবে কার্পজাতীয় মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য হচ্ছে প্ল্যাংকটন।

প্ল্যাংকটন ঃ প্ল্যাংকটন হচ্ছে এক ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী বা উদ্ভিদ জাতীয় অণুজীব। প্রাকৃতিক পানির এসব অণুজীব পানিতে ভাসমান বা ঝুলন্ত অবস্থায় উপযুক্ত পরিবেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যমান থাকে এবং পানির প্রাথমিক উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্ল্যাংকটনকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন এবং প্রাণি প্ল্যাংকটন।

কার্যগত দিক থেকে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন অটোট্রপিক (Auto trophic) এবং ক্রোমোপ্লাষ্ট (Chromoplast) ও অন্যান্য রঞ্জক (Pigment) সমৃদ্ধ। ফলে এরা সৌর শক্তিকে ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানির সহায়তায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের গ্রহণ উপযোগী শক্তিতে (কার্বোহাইড্রেট) রূপান্তরিত করতে পারে। এ কারণেই এরা প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত। যা একটি সমীকরণের সাহায্যে দেখানো হলো–

$$6Co_2 + 12H_2o \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} \underset{\text{(কার্বোহাইড্রেট)}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 + 6H_2O$$

অপরদিকে প্রাণী প্ল্যাংকটন হেটারোট্রপিক। এরা মূলত নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। খাদ্যের জন্য এরা পচনশীল জৈব বস্তু ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের ওপর নির্ভরশীল। মাছচাষের ক্ষেত্রে এ উভয় ধরনের প্ল্যাংকটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সমস্ত প্ল্যাংকটন ও জীবের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর উপাদান সরবরাহ করতে হয়। পুষ্টিকর এ সমস্ত উপাদানের মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম গুরুত্বপূর্ণ। এসব উপাদান বাজারে সরাসরি পাওয়া যায় না। বাণিজ্যিকভাবে তা বিভিন্ন যৌগের আকারে সার

হিসেবে পাওয়া যায়। তাই পুকুরের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুসারে মাঝে মাঝে উপরি সার প্রয়োগ করতে হয়।

উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ঃ পুকুরের পানিতে যেসব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ নিমজ্জিত/ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাদেরকে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন বলা হয়। এদের নিজস্ব কোনো চলন ক্ষমতা নেই। এরা বাতাসের ধাক্কায় অথবা অন্য কোনো বাহক দ্বারা একস্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করে থাকে। অর্থাৎ এরা পানির ঢেউ বা স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে পারে না। এদের দেহে ক্লোরোফিল নামক এক ধরনের রঞ্জক কণিকা (Pigment) বিদ্যমান থাকে। ক্লোরোফিলের বর্ণ সবুজ বিধায় পানিতে এদের আধিক্যের কারণে পানির বর্ণ হয় সবুজ যা মাছ চাষের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এদেরকে মাছচাষের প্রথম ভিত্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়। যেমন- অ্যানাবেনা (Anabaena), স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), নেভিকুলা (Navicula), ফেকাস (Phacus), ডায়াটম (Diatom), ব্লু-গ্রীন-অ্যালজি (Blue-Green-Algae) ইত্যাদি।

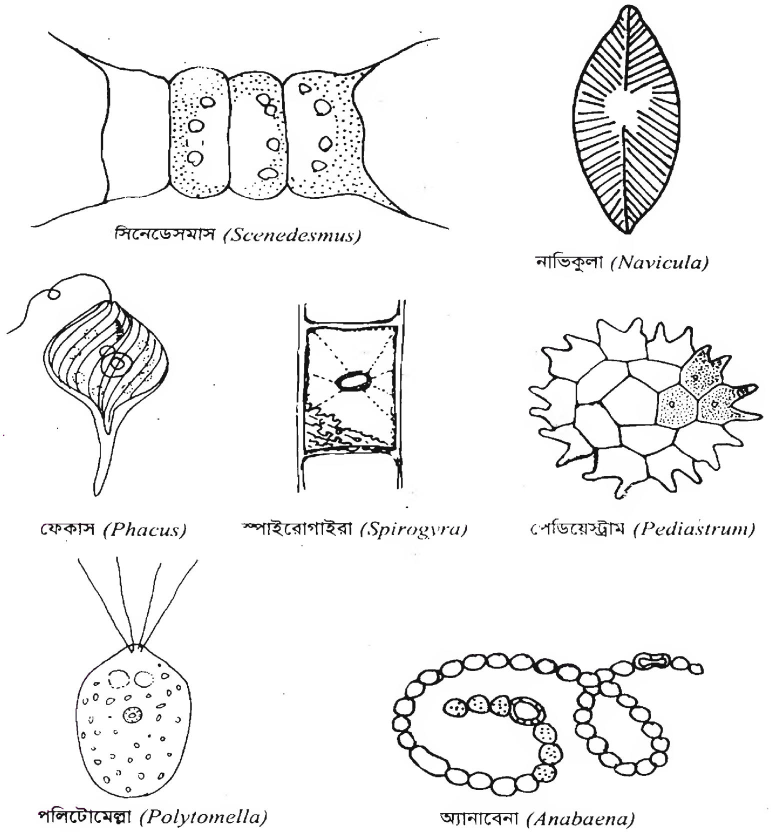

সিনেডেসমাস *(Scenedesmus)*

নাভিকুলা *(Navicula)*

ফেকাস *(Phacus)*

স্পাইরোগাইরা *(Spirogyra)*

পেডিয়েস্ট্রাম *(Pediastrum)*

পলিটোমেল্লা *(Polytomella)*

অ্যানাবেনা *(Anabaena)*

চিত্র-২৯ ঃ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন (Phyto Plankton)

প্রাণি প্ল্যাংকটন ঃ পুকুরের পানিতে যেসব আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও কীটপতঙ্গের লার্ভা নিমজ্জিত/ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাদেরকে প্রাণী প্ল্যাংকটন বলা হয়। এদের নিজস্ব চলন ক্ষমতা বিদ্যমান ফলে এরা পানির ঢেউ

বা স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে পারে। প্রাণী প্ল্যাংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস। যেমন- ড্যাফনিয়া (Daphnia), সাইক্লপস্ (Cyclops), রোটিফেরা (Rotifera), ময়না (Moina) ইত্যাদি।

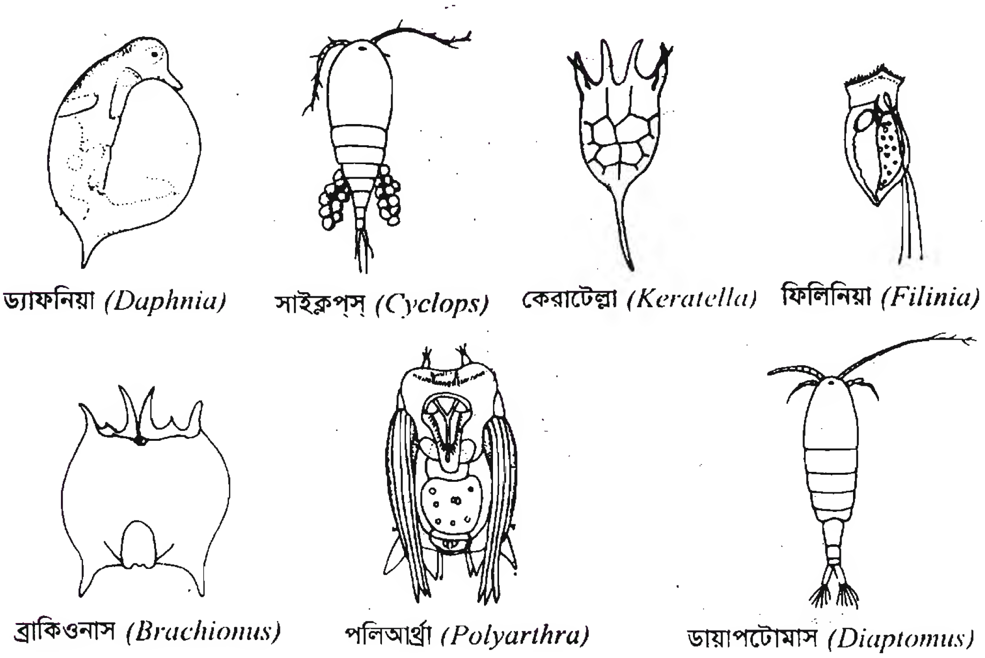
ড্যাফনিয়া *(Daphnia)* সাইক্লপস্ *(Cyclops)* কেরাটেল্লা *(Keratella)* ফিলিনিয়া *(Filinia)*
ব্রাকিওনাস *(Brachionus)* পলিআর্থ্রা *(Polyarthra)* ডায়াপটোমাস *(Diaptomus)*

চিত্র-৩০ ঃ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী প্ল্যাংকটন (Zoo plankton)

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয় ঃ পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বিভিন্নভাবে আমরা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে পারি। যেমন- পুকুরের পানির বর্ণ দেখে, পানিতে সেকি ডিস্ক ডুবিয়ে, গামছা গস্নাস ইত্যাদি পদ্ধতিতে।

ক. পানির বর্ণ দেখে : পানির বর্ণ যদি হালকা সবুজ বা বাদামি বর্ণের হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ত উপস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে।

খ. পানিতে সেকি ডিস্ক ডুবিয়ে : সেকিডিস্ক রিডিং যদি সর্বোচ্চ ১ ফুট হয় তাহলে সেখানেও মাছের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

গ. গামছা গ্লাস পদ্ধতি : পুকুরে কিছুক্ষণ গামছা টেনে সেখান হতে একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস পানি নিয়ে সূর্যের আলোতে পরীক্ষা করলে গস্নাসের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণীকণা (গ্লাস প্রতি ১৫-২০টি) দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রাকৃতিক খাদ্য (প্রাণী প্ল্যাংকটন) বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাকৃতিক খাদ্যের গুরুত্ব

প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ তাদের আমিষ চাহিদার ৪০-৭০% পূরণ করতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক খাদ্য বিশেষ করে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং এর সাথে উপজাত হিসেবে অক্সিজেন তৈরি করে। তাই প্রাকৃতিক খাদ্য বিশেষ করে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন শুধু খাদ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না অক্সিজেন তৈরির উৎস হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রাকৃতিক খাদ্য বেশি হলে কী ঘটে ?

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তথা প্ল্যাংকটনের উপস্থিতি বিশেষ করে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের পরিমাণও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পানিতে যদি এদের আধিক্য খুব বেশি হয় তাহলে দিনের বেলায় সূর্যের আলোর সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে এবং এর সাথে উপজাত হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেনও তৈরি করে। ফলে দিনের বেলায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। আবার ঠিক এর উল্টোটি ঘটে রাত্রি বেলায়। তখন পানিতে বসবাসকারী প্রাণী প্ল্যাংকটন থেকে শুরু করে মাছসহ সব ধরনের জলজ জীব তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। শুধু তাই না, যে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন দিনের বেলায় প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি করল সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবার গ্রাহক হয়ে তার নিজেরই প্রয়োজনে শ্বসনে অক্সিজেন গ্রহণ করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বিপজ্জনক হারে কমে যায়। বিশেষ করে ভোর রাতে এ সমস্যা সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। তাই পানিতে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ বিশেষ করে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের পরিমাণ প্রয়োজনীয় সীমার মধ্যে রাখা উচিত। এর জন্য পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা দরকার। কোন ক্রমেই মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

কৃত্রিম বা সম্পূরক খাদ্য

অধিক উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পুকুরে চাষকৃত মাছকে বাহির থেকে কিছু খাদ্য সরবরাহ করা হয়। বাহির থেকে প্রয়োগকৃত এসব খাদ্যদ্রব্যকে কৃত্রিম বা সম্পূরক খাদ্য বলা হয়। যেমন- চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, খৈল ইত্যাদি।

সুষম সম্পূরক খাদ্য বা কৃত্রিম খাদ্য ঃ বিভিন্ন খাদ্য উপাদান নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রণের পর খাদ্য উপাদানগুলোর গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন গুণাগুণ সম্পন্ন যে খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয় এবং যাতে মাছের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য উপাদান (আমিষ, শর্করা, লিপিড, খনিজ লবণ, ভিটামিন এবং পানি) সুষম বা সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম সম্পূরক খাদ্য বা কৃত্রিম খাদ্য বলে। যেমন- চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, ফিশমিল, সয়াবিন মিল, আটা, চিটাগুড়, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদির নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রণকৃত খাদ্যই হল সুষম সম্পূরক খাদ্য বা কৃত্রিম খাদ্য। অন্যকথায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ করে কারখানায় বা গবেষণাগারে যে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা হয় তাকেই কৃত্রিম খাদ্য বলে। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রজাতির এবং বিভিন্ন বয়সের মাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রেডের কৃত্রিম খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। যেমন- পোনা মাছের জন্য স্টার্টার- ১, স্টার্টার- ২ এবং মজুদ পুকুরে মাছচাষের জন্য গ্রোয়ার- ১, গ্রোয়ার- ২, ফিনিশার ইত্যাদি।

কৃত্রিম খাদ্যের সুবিধা সমূহ ঃ নিবিড় মাছ চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম খাবারের কোন বিকল্প নেই। নিবিড় মাছ চাষ পদ্ধতিতে কম জায়গায় বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা হয় বিধায় সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহারের বেশ কতগুলো সুবিধা রয়েছে যেমন–

- কৃত্রিম খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ফলে খাদ্যের ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় ও সুষম পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত হয়;
- যেসব খাদ্য উপাদান এককভাবে মাছ অপছন্দ করে সেগুলো অন্য খাদ্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে মাছকে খাওয়ান যেতে পারে;
- বাইন্ডার ব্যবহারের ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজে পানিতে গলে যায় না। ফলে খাদ্যের অপচয় কম হয়;
- খাদ্য দ্রব্যের সাথে প্রয়োজনে ঔষধ ব্যবহার করে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও
- কৃত্রিম খাদ্যের পরিবহন ও সংরক্ষণ সুবিধাজনক।

সম্পূরক খাদ্যের গুণাবলি

- খাদ্যটি অবশ্যই সুস্বাদু এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন;
- সম্পূরক খাদ্যের উপাদানসমূহ সহজে পরিপাক ও আত্তীকরণ হওয়া দরকার;
- অধিক মাত্রায় রূপান্তরিতকরণে সমর্থ হওয়া প্রয়োজন;
- পানিতে যেন খাদ্য উপাদানসমূহ সহজে গলে না যায়;
- প্রয়োগকৃত খাদ্যটি যেন মাছ খেতে অভ্যস্ত থাকে;
- অপেক্ষাকৃত দামে সস্তা ও সর্বদা হাতের কাছেই পাওয়া যায়;
- গুদামজাতকরণে সহজে যেন নষ্ট না হয়;
- সর্বোপরি পুষ্টিমানের দিক থেকে সম্পূরক খাদ্যটিতে যেন ২৮-৩৫% আমিষ, ৩০-৪০% শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান বিদ্যমান থাকে এবং প্রতিগ্রাম খাদ্যে যেন ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপাদক ক্ষমতা থাকে।

কৃত্রিম বা সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

যেসব কারণে মাছচাষে সম্পূরক খাদ্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে তা হলো–

- অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছচাষ করা যায়;
- অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থ-সবল পোনা উৎপাদন করা যায়;
- পোনা বাঁচার হার অনেক বেড়ে যায়;
- মাছচাষে মৃত্যুহার অনেকাংশে হ্রাস পায়,
- মাছ পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে;
- মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় ফলে মাছ অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়;
- মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে ও
- কম সময়ে অল্প পরিমাণ জলাশয় হতে অধিক মাছ ও আর্থিক মুনাফা পাওয়া যায়।

মাছের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা ঃ মাছের খাদ্য চাহিদা প্রজাতি, বয়স ও আকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছের জন্য পোনার দৈহিক ওজনের ৮-২৫%, বড় মাছের জন্য ২-১০% এবং প্রজননক্ষম মাছের জন্য ২-৮% হারে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। এভাবে খাদ্য সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়। নিচে প্রজাতি ও জীবনস্তর ভেদে মাছের খাদ্য চাহিদা দেয়া হলো -

সারণি-৫ : প্রজাতি ও জীবনস্তর ভেদে মাছের খাদ্য চাহিদা

প্রজাতি	দৈহিক ওজনের শতকরা হার (%)		
	পোনা মাছ	বড় মাছ	প্রজননক্ষম মাছ
রুইজাতীয় মাছ	৮-২৫	২-৬	২-৫
ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ	১০-২৫	৩-৮	২-৬
চিংড়ি	১২-২৫	৩-১০	৩-৮

চাষকৃত মাছের জন্য সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ যেকোনো খাবার প্রস্তুতের সময় খাদ্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের গুণগতমান, সহজলভ্যতা ও বাজারদরকে প্রাধান্য দিতে হয়। কেননা প্রস্তুতকৃত খাদ্যের বাজার মূল্য যত কম হবে এবং খাদ্যের গুণগতমান যত মানসম্পন্ন হবে মাছের উৎপাদন খরচ তত কম হবে। সাধারণত মাছের দেহ বৃদ্ধির জন্য ৩০% এর বেশি আমিষের প্রয়োজন হয় না। নিচে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে বিদ্যমান আমিষ, শর্করা, চর্বি, অ্যাশ (অংয) এবং খনিজ পদার্থের পরিমাণ দেয়া হলো।

সারণি-৬ : বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান

খাদ্যোপাদানের নাম	আমিষ (%)	শর্করা (%)	চর্বি (%)	অ্যাশ (%)	খনিজ পদার্থ (%)
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৭৮	১৩.৪৪	৭.১	১৫.৩
সয়াবিন খৈল	৪০.৯	৩৫.৭	৩.৫	৪.৩	৫.৫
বাদাম খৈল	৪৭.৯	২৫.০	১০.৯	৩.৬	৪.৮
তিলের খৈল	২৭.২০	৩৪.৯৭	১৩.১৮	৬.৯০	১৪.৮০
নারিকেলের খৈল	১৭.৩	৪২.৮	৭.৩	৪.৮	৭.৫
চালের মিহি কুঁড়া	১১.৮৮	৪৪.৪২	১০.৪৫	১৪.১	১১.৫
চালের মোটা কুঁড়া	৬.২	৩৭.৮	২.৭	৩৩.১	১০.৭
চালের খুদ	৮.৪	৭৬.৭	২৭.০	০.৭	০.৮
গমের ভূসি (চিকন)	১৫.০	৫৪.১	৪.৪৩	৭.৫	৫.৩
ভুট্টার আটা	৮.৮	৭০.৪	৪.৩	১.৩	১.৪
সয়াবিন গুড়া	৩৬.৩	২৫.০	১৮.৪	৪.৮	৫.০
আটা	১৭.৭৮	৭৫.৬	৩.৯০	০.৯	১.২
ময়দা	১৯.৭৩	৭৯.৪৯	০.৩৮	১.২	১.৪
আলু	২.১	১৯.৭	০.১	০.৯	১.০
শুটকি মাছ	৬১.০	১.৫	৩.৫	৫.০	২১.০
ফিশমিল-এ গ্রেড	৫৬.৬১	১১.২২	৩.৭৪	৪.২	৬.৫
ফিশমিল-বি গ্রেড	৪৪.৭৪	৭.৮৭	১৬.৮২	৪.১	৬.৪
ব্লাড মিল	৬৩.১৫	০.৫৬	১৫.৫৯	৫.৩	৭.৫
মিট এন্ড বোনমিল	৫৬.০	১২.০	৫.০	৬.২	৫.৩
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	২.০	১.০	১.২

উৎস ঃ মৎস্য ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা- বিষ্ণুদাস

সারণি-৭ : মাছের খাদ্যে আমিষ, শর্করা এবং লিপিডের চাহিদা

প্রজাতি	আমিষের চাহিদা (%)	কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা (%)	লিপিডের চাহিদা (%)
কার্পজাতীয়	২৫	২৫	৮
পাঙ্গাস	৩০	৩০	১০
তেলাপিয়া	২৫	৩০	১০
গড়	**২৭**	**২৮**	**৯**

এখন প্রজাতি এবং বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুদকৃত মাছের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য উপাদান মিশিয়ে সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরি করতে হলে নিম্নোক্ত সারণি-৮ অনুসরণ করে খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে।

সারণি-৮ : সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির নমুনা

খাদ্যোপকরণ		বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান (%)			ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদন (%)			আনুমানিক মূল্য/কেজি (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
নাম	পরিমাণ (কেজি)	আমিষ	কার্বোহাইড্রেট	লিপিড	আমিষ	কার্বোহাইড্রেট	লিপিড		
চালের কুঁড়া	২০	১১.৮৮	৪৫.১৪	৬.৮	২.৩৮	৯.০৩	১.৩৬	১৮.০০	৩৬০.০০
গমের ভুসি	১০	১৫.০	৫৪.১০	৩.২	১.৫০	৫.৪১	০.৩২	২০.০০	২০০.০০
ফিশমিল	২০	৫৬.৬১	১১.২২	৩.৭৪	১২.২০	২.২৪	০.৭৫	১০০.০০	২০০০.০০
সরিষার খৈল	৩৫	৩০.৩৩	৩৪.৭৮	১৩.৪	১০.৬২	১২.১৭	৪.৬৯	৩০.০০	১০৫০.০০
ভূট্টার আটা	৫	৮.৮	৭০.৪	৪.৩	০.৪৪	৩.৫২	০.২২	১৮.০০	৯০.০০
সয়াবিন মিল	৫	৩৬.৩	২৫.০	১৮.৪	১.৮২	১.২৫	০.৯২	৪০.০০	২০০.০০
গমের আটা	৩	১৭.৭৮	৭৫.৬	৩.৯	০.৫৩	২.২৭	০.১২	২২.০০	৬৬.০০
চিটা গুড়	১	৪.৪৫	৮৩.৬২	২.০	০.০৫	০.৮৪	০.০২	৬০.০০	৬০.০০
লবণ	০.৫০	--	--	--	--	--	--	২৪.০০	১২.০০
ফিড প্রিমিক্স	০.৫০	--	--	--	--	--	--	৫০০.০০	২৫০.০০
মোট	১০০	--	--	--	**২৯.৫৪**	**৩৩.৮৪**	**৮.৮৭**		**৪২৮৮.০০**

উৎস : মাছের খাদ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাৎস্য ও মাৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা-বিষ্ণুদাস।

খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

সারণি- ৮ এ বর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিমাণ মতো খাদ্য উপাদান গ্রাইন্ডারে ভাল করে চূর্ণ বা গুড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। এর পর ফর্মুলা অনুযায়ী উপাদানসমূহ একটি একটি করে নির্দিষ্ট মাত্রায় মেপে নিতে হবে এবং অল্প অল্প করে মিক্সার মেশিনে বা বড় একটি পাত্রে ঢেলে হাত কিংবা কাঠি দিয়ে শুকনা অবস্থায় ভালভাবে মিশাতে হবে। মিশানোর সময় সবচেয়ে কম খাদ্য উপাদানসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি খাদ্যের সাথে মিশাতে হবে। এভাবে মেশানোর পর অল্প অল্প করে পানি এমনভাবে মিশিয়ে নাড়তে হবে যাতে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠালো পেষ্ট বা মন্ডে পরিনত হয়। বাইন্ডার হিসেবে চিটাগুড় ব্যবহার করলে চিটাগুড়কে

প্রথমে পানিতে মিশিয়ে পাতলা করে উপরে বর্ণিত খাদ্যের সাথে মিশিয়ে মন্ড তৈরি করতে হবে। এ মন্ড ভেজা খাদ্য হিসেবে গোলাকৃতির বল আকার বানিয়ে সরাসরি মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে।

ভেজা খাদ্য বল আকারে প্রয়োগ করলে কী ঘটে

ভেজা খাদ্য বল আকারে পুকুরে প্রয়োগ করলে প্রয়োগকৃত খাদ্যের অধিকাংশই পানিতে গলে যায়। যা মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। ঐ খাদ্য পানিতে সার হিসেবে কাজ করে পরোক্ষভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপাদনে সহায়তা করে। খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী সব প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য খেতে ততবেশি অভ্যস্তও নয়। যেমন- সিলভার কার্প, কাতলা, বিগহেড এ জাতীয় মাছ প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল বলে এদের মুখের আকৃতি এবং ফুলকার সজ্জাবিন্যাসও সেইভাবে তৈরি। তাই এদের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রয়োজন। পক্ষান্তরে রুই, মৃগেল, পাঙ্গাস এ জাতীয় মাছ পুরোপুরি সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল বলে মুখের আকৃতি এবং ফুলকার বিন্যাস প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণের জন্য ততবেশি উপযোগী নয়। আবার মুখের আকার ছোট বিধায় একই সময়ে একটি রুই মাছ যতগুলো প্ল্যাংকটন খেতে পারবে সেই সময়ে একটি কাতলা মাছ তার চেয়ে অনেক বেশি প্ল্যাংকটন খেতে পারবে। শুধু তাই নয় রুই মাছের মুখের আকৃতি ছোট বিধায় কাতলার সমপরিমাণ প্ল্যাংকটন খেতে তাকে যতবার মুখ হা এবং বন্ধ (Gulping) করতে হবে তাতে তার যে শক্তি ব্যয় হবে সেটাও আসবে নিশ্চয়ই খাদ্য থেকে এটাও বিবেচ্য হওয়া উচিত।

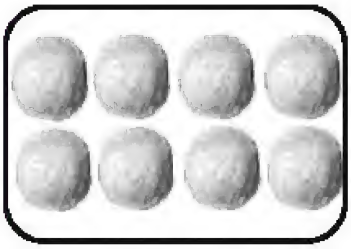
চিত্র-৩১ : পানিতে প্রয়োগের পূর্বে তৈরিকৃত বল

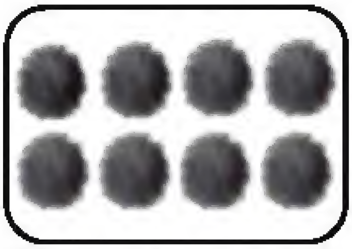
চিত্র-৩২ : পানিতে প্রয়োগের পরে বলের অবস্থা

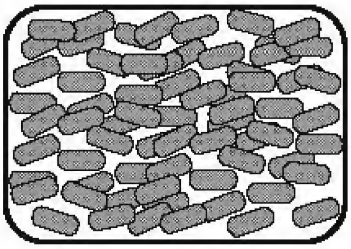
চিত্র-৩৩ : পানিতে প্রয়োগকৃত পিলেট জাতীয় খাদ্য

আবার ভেজা খাদ্য বল আকারে প্রয়োগ করলে একটি বলকে কেন্দ্র করে তার চার পাশে বড় জোড় ১০-১৫টি মাছ সুষ্ঠুভাবে সেই খাদ্য খেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে বল খাদ্য প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাছ সেখানে এসে ভিড় করে। ফলে খাদ্য নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড কাড়াকাড়ি হয়। তাদের লেজ এবং পাখনা দ্বারা বল খাদ্যের অধিকাংশ ভেঙ্গে পানিতে গলে যায়। অপেক্ষাকৃত বড় এবং সবল মাছগুলোই প্রতিযোগিতায় টিকে খাদ্য গ্রহণ করে। ছোট ও দুর্বল মাছগুলোও খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে সময় এবং শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে ছোট ও দুর্বল মাছগুলো আরও ছোট ও দুর্বল হয়ে যায়। পিলেট খাদ্যে এ সমস্যা নেই।

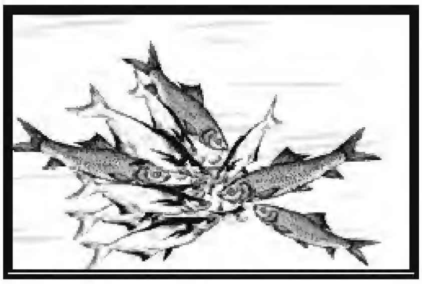
চিত্র-৩৪ : বল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের দৃশ্য

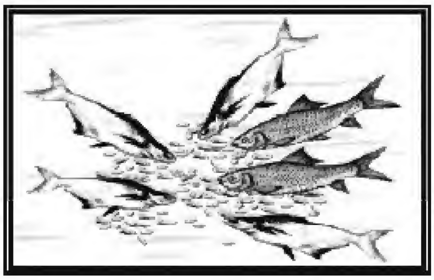
চিত্র-৩৫ : পিলেট জাতীয় খাদ্য গ্রহণের দৃশ্য

বল খাদ্যের অসুবিধা

- পানিতে দ্রুত গুলে যায় বিধায় খাদ্যের অপচয় বেড়ে যায় ফলে সঠিক পুষ্টিমান রক্ষা করা যায় না;
- প্রয়োগকালীন সময়ে অল্প জায়গা দখল করে বিধায় খাদ্য নিয়ে মাছের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়;
- মাছের মুখের ব্যাস অনুযায়ী তৈরি করা যায় না;
- অব্যবহৃত খাদ্যকণা পচে গিয়ে পানি ও পুকুরের তলদেশ দূষণের সম্ভাবনা থাকে?
- খৈল পচে খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় বিধায় অনেকে বল খাদ্য তৈরি করতে চায় না;
- এক দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যায় না।

পিলেট খাদ্যের সুবিধা

- পিলেট খাদ্যের পুষ্টিমান অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে বিধায় মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়,
- এ জাতীয় খাদ্য মাছের মুখের ব্যাস অনুযায়ী তৈরি করা হয়ে থাকে। ফলে যে কোনো আকারের মাছ খুব সহজেই এ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে;
- উন্নত মানের বাইন্ডার ব্যবহারের কারণে উক্ত খাদ্য খুব সহজে পানিতে গলে না বিধায় প্রয়োগকৃত খাদ্যের অধিকাংশই মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে;
- এ জাতীয় খাদ্য পরিবহন, প্রয়োগ এবং সংরক্ষণ খুবই সহজ;
- ভেজা খাদ্যের খারাপ গন্ধের কারণে খাদ্য প্রদানে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকে নিয়মিত খাদ্য প্রদান করে না। অথচ পিলেট জাতীয় খাদ্যের সেই ধরনের কোন কটু গন্ধ নেই। এমনকি প্রয়োগকালীন সময়ে তেমন কোন ঝামেলাও পোহাতে হয় না বিধায় যেকোন লোক, যেকোনো সময়ে এ জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করতে পারেন,
- পিলেটজাতীয় খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যয় হয় না।

খাদ্য প্রয়োগ হার : মজুদকৃত মাছের জন্য কতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন তা জানার জন্য অবশ্যই পুকুরের বিদ্যমান মাছের মোট জীবভর বের করতে হবে। আর এজন্য প্রথমেই মজুদকৃত মাছের গড় ওজন বের করে সেই গড় ওজনকে মজুদকৃত মাছের মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে মোট জীবভর (Biomass) পাওয়া যাবে। জীবভরকে শতকরা হার (%) দ্বারা গুণ করলে প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের পরিমাণ পাওয়া যাবে। যা নিচে সারণি- ১০ এ দেখানো হলো।

সারণি-৯ : প্রজাতি ভিত্তিক খাদ্য চাহিদা

প্রজাতি	মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	সাইজ (ইঞ্চি)	মাছের সংখ্যা	জীবভর (কেজি)	খাদ্য প্রয়োগ (%)	প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)	দৈহিক বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন)
পাংগাস	২০	৪-৫	৫০০০	১০০	৫	৫	৫
রুই	২০	৪-৫	১০০০	২০	৫	১	৩
মোট	২০		৬০০০	১২০		৬	

যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করা হয় তাহলে নমুনায়নের (Sampling) মাধ্যমে প্রত্যেক প্রজাতির মাছের আলাদা আলাদাভাবে গড় ওজন এবং জীবভর বের করে পরে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে যোগ করতে হবে। যেমন- মজুদকৃত মাছের গড় ওজন ২০ গ্রাম এবং মোট মাছের সংখ্যা ৬০০০টি। তাহলে মোট জীবভর হবে

(২০ x ৬০০০ = ১২০০০০ গ্রাম) ১২০ কেজি। প্রত্যেক দিন মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজনের ৫% হারে খাদ্য প্রয়োগ করলে মোট ৬ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হবে। ছোট মাছের খাদ্যের চাহিদা বেশি বিধায় মজুদকালীন সময়ে মাছের দৈহিক ওজনের ১০% এবং পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কমিয়ে ২% এ আনা যেতে পারে। এভাবে আস্তে আস্তে মাছ যত বড় হবে খাদ্য প্রয়োগের হার তত কমে আসবে কিন্তু মোট খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তবে অবশ্যই নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আস্তে আস্তে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

সারণি-১০ : মাসভিত্তিক মাছের খাদ্য প্রয়োগের হার

মাস	মজুদকৃত মাছের ওজন (কেজি)	মাছের মোট ওজনের শতকরা হারে খাদ্য প্রয়োগ	প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)
১ম মাস	১০০	১০%	১০
২য় মাস	২০০	৮%	১৬
৩য় মাস	৪০০	৬%	২৪

খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা

- পুকুরে নিয়মিত (দিনে কমপক্ষে ২ বার) খাদ্য দিতে হবে,
- খাদ্য অবশ্যই টাটকা এবং স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে তা না হলে মাছ অনেক সময় খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়;
- পুকুরের পানির তাপমাত্রা এবং গুণাগুণের তারতম্যের সাথে খাদ্য প্রয়োগ হারও কমবেশি হবে;
- পুকুরে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ খুব বেশি হলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে;
- ১৫ দিন অন্তর কিংবা মাসে একবার নমুনা সংগ্রহ করে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করতে হবে;
- পুকুরের পানির গভীরতা এবং তাপমাত্রা খুব কমে গেলে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে;
- প্রতিদিন একই সময় একই স্থানে খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে;
- নিয়মিত খাদ্যদানি পরিষ্কার করতে হবে ও
- শীতকালে খাবার প্রয়োগের পরিমাণ অর্ধেকের বেশি কমিয়ে আনা যেতে পারে।

অনুশীলনী - ৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাংকটন কত প্রকার?
২. উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন কাকে বলে?
৩. একটি উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের উদাহরণ দাও?
৪. প্রাণি প্ল্যাংকটন কাকে বলে?
৫. একটি প্রাণি প্ল্যাংকটনের উদাহরণ দাও?
৬. প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ তাদের আমিষ চাহিদার শতকরা কত ভাগ পেয়ে থাকে?
৭. পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিনা তা কীভাবে পরীক্ষা করা হয়?
৮. সেকি ডিস্ক এর ব্যবহার কী?
৯. পুকুরে সেকি ডিস্ক রিডিং কত হলে মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল?
১০. সুষম সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব কী?
১১. আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎস কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক খাদ্য বলতে কী বুঝ?
২. উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে খাদ্য তৈরি করে তা সমীকরণের সাহায্যে দেখাও?
৩. পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য বেশি হলে কী ঘটে?
৪. সম্পূরক খাদ্য বলতে কী বুঝ?
৫. সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব কী?
৬. সরিষার খৈল এবং চালের কুঁড়ায় শতকরা কতভাগ আমিষ পাওয়া যায়?
৭. পিলেট খাদ্যের ২টি সুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ৩০% আমিষ সম্বলিত সুষম সম্পূরক খাদ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত কর ।
২. প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ। যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. কোন একটি পুকুরে ৫০০০টি পাঙ্গাশ এবং ১০০০টি রুই মাছ আছে। প্রত্যেকটি মাছের গড় ওজন ৫০০ গ্রাম। ঐ পুকুরে মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ৫ ভাগ হারে খাদ্য প্রয়োগ করলে দৈনিক কত কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হবে?

দশম অধ্যায়

মৌসুমি পুকুরে মাছচাষ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট জলাশয় রয়েছে। যেখানে বছরে ৪-৮ মাস পানি থাকে এবং আয়তনের দিক থেকেও ২-২০ শতাংশের বেশি নয়, সেই সাথে পানির গভীরতা থাকে ৪-৬ ফুট। এসব ছোট ছোট জলাশয়সমূহকে বলা হয় মৌসুমি পুকুর। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবহারের অভাবে এসব জলাশয় বছরের পর বছর পতিত থাকে যা মশার আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ একটু পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করলেই এ সমস্ত মৌসুমি পুকুরে লাভজনকভাবে মাছচাষ করা সম্ভব। মৌসুমি পুকুরে চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রজাতি হিসেবে যে সব মাছ বিবেচিত সেগুলো হলো।

১. তেলাপিয়া
২. সরপুঁটি বা রাজপুঁটি
৩. শিং মাছ
৪. মাগুর মাছ ইত্যাদি।

নিচে এসব প্রজাতির মাছচাষ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো-

মৌসুমি পুকুরে তেলাপিয়া/নাইলোটিকার চাষ

তেলাপিয়া হলো চিকলিডি (Cichlidae) গোত্রভুক্ত মাছ যাদের আদিবাস আফ্রিকা মহাদেশে। ১৯৭৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে প্রথম এ মাছ আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত প্রজাতিগুলো হলো -

নাইল তেলাপিয়া (Oreochromis niloticus)
মোজাম্বিক তেলাপিয়া (O. mossambicus)
ব্লু তেলাপিয়া (O. aureus)

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তেলাপিয়ার কতিপয় উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন- গিফট জাত (GIFT Strain), লাল তেলাপিয়ার জাত, জিএমটি জাত (GMT Strain) এবং হাইব্রিড জাত ইত্যাদি। এদের মধ্যে নাইল তেলাপিয়া বা তেলাপিয়া নাইলোটিকা এবং ব্লু তেলাপিয়া সবচেয়ে জনপ্রিয়।

নাইলোটিকা চাষের সুবিধা

- তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন করা যায়;
- অতি সাধারণ ও সহজ ব্যবস্থাপনায় এদের চাষ করা যায়;
- রোগ বালাই প্রতিরোধক্ষম;
- অধিক কষ্ট সহিষ্ণু ও বেশি ঘনত্বে বেঁচে থাকায় অভ্যস্ত। যেমন ৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সহজেই টিকে থাকতে পারে;
- জৈবিক এবং কৃষিজ বর্জ্যকে সহজেই উন্নত আমিষে রূপান্তর করতে সক্ষম;
- সহজেই এ মাছের পোনা পাওয়া যায়;
- শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যেকোনো মৌসুমে এদের চাষ করা যায় ও
- একই পুকুরে বছরে ২ বার চাষ করা যায়।

নাইলোটিকার শারীরিক গঠন : নাইলোটিকা মাছটি ধূসর নীলাভ থেকে সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। প্রায় সমস্ত পিঠ জুড়েই কাঁটাযুক্ত পৃষ্ঠ পাখনা আছে। পিঠের পাখনাটি অনেকটা কৈ মাছের পাখনার মতো। পিঠের ও পায়ু সংলগ্ন পাখনা সাদা রঙের সরু ও লম্বা দাগযুক্ত। পুরুষ মাছের গলার অংশে প্রজনন কালে লালচে দেখায়। এ সময় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পেট ও অঙ্কীয়দেশ লালচে দেখায় যা পুরুষের বেলায় বেশি উজ্জ্বল। পূর্ণ প্রজনন অবস্থায় পুরুষের পিঠে লালচে আভা লেজের পাখনা পর্যন্ত বিস্তৃতি পেয়ে ঘন রক্ত বেগুনি রং ধারণ করে। শ্রোণী পাখনা কালো বর্ণের হয়ে থাকে। পরিপক্ক পুরুষ ও স্ত্রী মাছের জননেন্দ্রিয় পরীক্ষা করলে দেখা যায়, পুরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় দুই ছিদ্র বিশিষ্ট সাদা ও লম্বাটে আর স্ত্রী মাছের বেলায় তা তিন ছিদ্র বিশিষ্ট, খাটো ও লালচে রঙের হয়।

চিত্র-৩৬ : নাইলোটিকা মাছ

নাইলোটিকার জীবনচক্র : তিন মাস বয়সে তেলাপিয়া নাইলোটিকার শারীরিক ওজন যখন ৫০-৬০ গ্রামে পৌঁছে তখন এরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। প্রজননক্ষম পুরুষ মাছ পুকুর এবং বদ্ধ জলাশয়ের অগভীর অঞ্চলে শক্ত মাটিতে তার শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় দ্বিগুণ ব্যাসের স্থান জুড়ে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার গভীর গর্ত করে এবং তার পছন্দের প্রজননক্ষম স্ত্রী মাছকে বাসায় ডিম ছাড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বেশির ভাগ তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে ডিম ছাড়ার প্রাক্কালে স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রণয় ও বাহ্যিক দৈহিক মিলনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে পুরুষ মাছ স্ত্রী সঙ্গীকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শন করে থাকে (যেমন- পৃষ্ঠ পাখনা খাঁড়া করানো এবং মোহনীয় শারীরিক ভঙ্গিমা প্রদর্শন ইত্যাদি)। পছন্দের সঙ্গী পাওয়া মাত্রই তাকে নির্মিত বাসায় প্রবেশের অধিকার দিয়ে থাকে। স্ত্রী মাছ তার পুরুষ সঙ্গীর সাথে সঠিক মিলন আচরণ বিনিময়ের ফলে বাসায় ডিম পাড়ার উদ্যোগ নেয়। ডিম ছাড়ার প্রাক্কালে স্ত্রী মাছ বাসার তলদেশে জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগ স্পর্শ করে প্রতিবারে ৩০-৪০টি ডিম ছেড়ে দেয়। স্ত্রী মাছের মোহনীয় আচরণে মুগ্ধ হয়ে পুরুষ সঙ্গী প্রতি ব্যাচ ডিম ছাড়ার পর পরই শুক্র নিঃসরণের মাধ্যমে ডিমগুলো নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিমের রং হয় ঈষৎ হলুদ এবং কমলার মিশ্রণ। নিষিক্ত হওয়ার পর পরই স্ত্রী মাছ ডিমগুলো মুখে তুলে নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে এবং মুখের মধ্যে রেখেই তা দিয়ে ডিম ফুটিয়ে পোনা তৈরি করে। সাধারণত ২৮±১° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মুখে ডিম ফুটতে ৭০-৯০ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। এ সময় স্ত্রী মাছ ফুটে যাওয়া লার্ভিগুলোকে পূর্ণাঙ্গ পোনায় রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত আরো ৬-১০ দিন মুখে রেখে যত্ন ও নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে মা মাছ বাহির থেকে কোনো রূপ খাদ্য গ্রহণ করে না। সাধারণত ১২ দিনের দিন স্ত্রী মাছ বাচ্চাগুলোকে মুখ থেকে ছেড়ে দেয়। কারণ ১২ দিনের পূর্বে বাচ্চাগুলো ছেড়ে দিলে দেখা যায় বাচ্চাগুলো পেটে লেগে থাকা ডিমগুলির জন্য পানিতে সহজে সাঁতার কেটে চলাচল করতে পারে না। তাই ১২ দিন পর ডিমগুলো নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং বাহির থেকে খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হলে তখনই মা মাছ তার অভিভাবক সুলভ আচরণ (Parental Care) ছেড়ে দেয়। প্রায় তিন মাসের মধ্যে বাচ্চাগুলো বড় হয়, তখন এদের ওজন হয় প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম এবং তখনই তারা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে।

নাইলোটিকার চাষ পদ্ধতি : মৌসুমি পুকুরে ২ ধরনের ব্যবস্থাপনায় নাইলোটিকা মাছচাষ করা হয়ে থাকে। যেমন-
ক. সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি খ. আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতি। নিচে উভয় ধরণের মাছচাষ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

ক. সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিটি খুবই সহজ। ৩ থেকে ৪ মাস ২-৩ ফুট পানি থাকে এমন ছোট গর্ত, ডোবা, ইত্যাদি জলাশয়ে এ মাছের চাষ করা যায়। তবে জলাশয়ের আয়তন ১০-২০ শতাংশ এবং তা আয়তাকার হলে এ মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক। স্বল্প ব্যয়ে, কম সময়ে, ছোটখাটো জলাশয়েও এ পদ্ধতিতে মাছচাষ করা যায়। এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া কিংবা সরিষার খৈল প্রয়োগ করতে হয় না। শুধুমাত্র জৈব ও অজৈব সার দিলেই চলে।

পুকুর প্রস্তুতি : অন্যান্য মাছচাষের মতোই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। প্রথমে পুকুরে জলজ আগাছা থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এর পরে সম্ভব হলে সেচের মাধ্যমে পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে এবং প্রয়োজন হলে পুকুরের তলদেশ এবং পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পারিবারিক বা অন্যান্য যে কোনো কারণে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে অথবা মাছ মারার ঔষধ হিসেবে প্রতি শতাংশে প্রতিফুট পানির জন্য ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের পর শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এতে মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর হবে এবং বিভিন্ন রোগের জীবাণু ধ্বংস হবে। চুন প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পরে শতাংশ প্রতি ৩-৪ কেজি পচা গোবর প্রয়োগ করতে হবে। গোবরের পরিবর্তে শতাংশপ্রতি ৫-৭ কেজি কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। পানি ভর্তি পুকুরে জৈব সার প্রয়োগের ৬-৭ দিনের মধ্যেই পানি সবুজ রঙের হয়ে যায়। যদি চুন ও গোবর প্রয়োগের পরেও পানি যথেষ্ট সবুজ রং ধারণ না করে তবে শতাংশপ্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৭৫ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি পাত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গোবর সার নিয়ে এর মধ্যে হিসেব মতো টিএসপি সার মিশিয়ে পানি দিয়ে গুলে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এর পরে পুকুরে প্রয়োগের সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইউরিয়া সার মিশিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে গোবর ও সারের মিশ্রণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের ৩-৪ দিনের মধ্যে পানির রঙ সবুজ হলে জলায়তন হিসেব করে পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মজুদ ও খাদ্য প্রয়োগ : সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে শতাংশপ্রতি ৮-১০ গ্রাম ওজনের ৩০-৩৫টি সুস্থ সবল পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের পরে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে হাত দ্বারা প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ বা গামছা গম্লাস পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে সার প্রয়োগের পাশাপাশি চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল গুঁড়া করে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মাঝে মাঝে নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের মোট জীবভর জেনে দৈহিক ওজনের কমপক্ষে ৪-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : উপরে উল্লিখিত সব ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পালন করলে ৩-৪ মাস পর মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হবে এবং প্রত্যেকটি মাছের ওজন গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম হবে। মাছ আহরণের ক্ষেত্রে খেপলা জাল, বড়শি, ধর্মজাল, বেড়জাল প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে নাইলোটিকা যেহেতু

পুকুরে গর্ত করে তাই বার বার বেড় জাল টেনেও খুব সহজেই সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করা যায় না। সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করতে হলে পানি কমিয়ে বা পুকুর শুকিয়ে মাছ আহরণ করতে হবে।

খ. আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতি : আধা-নিবিড় ব্যবস্থাপনাকে আদর্শ মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় কতিপয় ছোট-বড় পুকুর প্রয়োজন হয়। পুকুরের আয়তন, মাছের মজুদ ঘনত্ব, পানির গভীরতা, অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ ও সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতির সমন্বয় সাধন করেই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আধা-নিবিড় ব্যবস্থাপনায় ৬ মাস পর পর বছরে ২ বার মাছ আহরণ করা যায়। এ ধরনের চাষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়।

১. প্রজনন পুকুর তৈরিকরণ ও পুকুর প্রস্তুতি;
২. প্রজননক্ষম মাছ প্রতিপালন;
৩. আঁতুড় পুকুরে রেণুপোনা প্রতিপালন;
৪. লালন পুকুরে পোনা প্রতিপালন ও
৫. মজুদ পুকুরে মাছ প্রতিপালন।

১. প্রজনন পুকুর তৈরিকরণ ও পুকুর প্রস্তুতি : প্রজননক্ষম তেলাপিয়া পালনের জন্য ছোট আকারের পুকুর হলে ভাল হয়। সাধারণত ৫-১০ শতাংশ আয়তনের পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এ ধরনের মাছচাষের ক্ষেত্রে পুকুরের ঢাল বেশি হলে ভালো হয়। কারণ ঢাল কম হলে মাছ ধরার অসুবিধা হয়। আর গভীরতার ক্ষেত্রে পুকুরের গভীরতা ১ মিটার বা প্রায় ৩ ফুট হলে তা মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। পুকুরের পাড়টি পানিতল থেকে অন্তত ১ মিটার উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে। তা না হলে অতি বৃষ্টিতে পুকুরের পাড় ভেসে যেতে পারে। পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতির ন্যায় রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ প্রভৃতি কাজ গুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। চুন ও সার প্রয়োগের পর পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলে প্রজননক্ষম তেলাপিয়া মজুদ করা যেতে পারে।

২. প্রজননক্ষম মাছ প্রতিপালন : প্রজনন পুকুর তৈরি করার পর পরই নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি মৎস্য খামার থেকে উন্নত জাতের ১০-১২ সেন্টিমিটার আকারের ৬০-১০০ গ্রাম ওজনের সুস্থ সবল নাইলোটিকা মাছ সংগ্রহ করে প্রজনন পুকুরে মজুদ করতে হবে। পুকুরে মজুদের আগে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ শনাক্ত করে যথাক্রমে ৩ : ১ অনুপাতে শতাংশ প্রতি ৮০-১০০টি মাছ ছাড়তে হবে। অর্থাৎ ৮০টি মাছের মধ্যে ৬০টি স্ত্রী মাছ এবং ২০টি পুরুষ হতে হবে। যেহেতু মাছগুলো প্রায় ১০০ গ্রাম ওজনের তাই প্রজননকালে পরিপক্ব পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে তাদের জননেন্দ্রিয় দেখে সহজেই চেনা যায়।

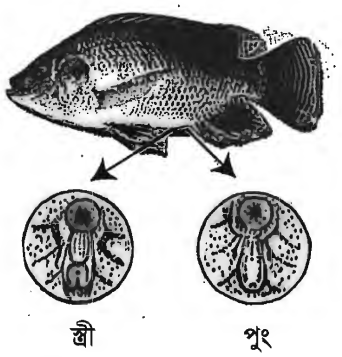

চিত্র-৩৭ : স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়ার জননেন্দ্রিয়

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ : পুকুরে প্রজননক্ষম মাছ ছাড়ার পরদিন থেকেই সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পুকুরে মজুদকৃত মাছের ওজনের ৫% হারে সম্পূরক খাদ্য সকালে এবং বিকেলে একই জায়গায় সরবরাহ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া ৫০% এবং সরিষার খৈল ৫০% একসাথে মিশিয়ে শুষ্ক

অবস্থায় পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রতি সপ্তাহে জাল টেনে কিছু মাছ ধরে তাদের গড় ওজন বের করতে হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে মাছের খাদ্যের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে। প্রজনন পুকুরে মাছ মজুদ করার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই স্ত্রী মাছ ডিম থেকে বাচ্চা ফুটায় বলে পুকুরের কিনারে ছোট রেণু পোনার ঝাঁক দেখা যায়। তখন প্রতিদিন মশারির কাপড়ের তৈরি জাল দিয়ে সকালে ও বিকেলে রেণুপোনাগুলো ধরে আঁতুড় পুকুরে স্থানান্তর করতে হবে।

আঁতুড় পুকুরে রেণু প্রতিপালন : প্রজনন পুকুরের মতো আঁতুড় পুকুরও তৈরি করে নিতে হবে। আঁতুড় পুকুর আয়তনে ছোট এবং কম গভীর হলে রেণু পোনার জন্য ভালো হয়। সাধারণত ২ থেকে ৫ শতাংশ এবং গভীরতা ৩ ফুট হলেই চলে। পুকুর প্রস্তুতির পরে পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হলে শতাংশপ্রতি ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০টি রেণু পোনা মজুদ করা যায়। আঁতড় পুকুরে ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত পোনা প্রতিপালন করা হয়। এ সময় রেণু পোনার দৈহিক ওজনের ১২% হারে সম্পূরক খাদ্য দিনে তিন-চার বার প্রয়োগ করা হয়। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ৭০% চালের কুঁড়া এবং ৩০% খৈল একসাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। খৈল চুর্ণ করে কুঁড়ার সাথে মিশিয়ে শুকনো খাদ্য পুকুরে ছড়িয়ে দিলে তেলাপিয়া পোনা দ্রুত খাদ্য খেয়ে ফেলে। এভাবে পরিচর্যার ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই পোনাগুলো যখন ২-৩ সে.মি. বা ১ গ্রাম ওজনের হয় তখন পোনাগুলোর মধ্যে থেকে বাছাই করে বড় আকারের পোনা লালন পুকুরে স্থানান্তর করতে হয়। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করতে পারলে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই তেলাপিয়া লালন পুকুরে মজুদ উপযোগী হয়ে থাকে।

লালন পুকুরে পোনা প্রতিপালন : লালন পুকুর ছোট আকারের অর্থাৎ ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে হলে ভালো হয়। লালন পুকুরও প্রজনন পুকুরের মতো যথারীতি প্রস্তুত করে পোনা মজুদের উপযোগী করে নিতে হবে। আঁতুড় পুকুর হতে বাছাইকৃত সুস্থ ও সবল পোনা শতাংশপ্রতি ১০০০-১২০০টি মজুদ করা যায়। পোনা মজুদের দিন হতে মাছের শরীরের ওজনের ১০% হারে সম্পূরক খাদ্য দিনে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রদত্ত খাদ্যের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ প্রদত্ত খাদ্য মাছ সবটুকু গ্রহণ করছে কি না। মাছ সবটুকু খাদ্য গ্রহণ না করলে অর্থ এবং খাদ্য দুটোর অপচয় হয়। এবং পরিশেষে পানি দূষিত হয়ে মাছের মড়ক দেখা দেবে। সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সপ্তাহে একবার জাল টেনে মাছের নমুনা সংগ্রহ করে মোট জীবভর হিসেব করে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এভাবে প্রায় ২ মাস পালনের পর যখন প্রতিটি পোনা প্রায় ১২-১৫ গ্রাম ওজনের হবে। তখন তাদের মধ্য থেকে একই আকারের বড় বড় সবল মাছগুলো বেছে নিয়ে মজুদ পুকুরে চাষ করার জন্য স্থানান্তর করতে হবে।

মজুদ পুকুরে নাইলোটিকা প্রতিপালন : উন্নত চাষ পদ্ধতিতে তেলাপিয়ার জন্য কয়েকটি মজুদ পুকুর থাকলে ভালো হয়ে। সাধারণত আদর্শ খামারের জন্য আঁতুড় পুকুর, লালন পুকুর এবং মজুদ পুকুরের অনুপাত ১ : ৫ : ১০ হলে ভালো হয় অর্থাৎ ১ শতাংশ আঁতুড় পুকুর হলে ৫ শতাংশ লালন পুকুর এবং ১০ শতাংশ মজুদ পুকুর দরকার হয়। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মজুদ পুকুরের আয়তন ১৫-২০ শতাংশ এবং গভীরতা ২-৩ ফুট হলে ভালো হয়। পুকুর প্রস্তত প্রণালি প্রজনন পুকুরের মতোই। পুকুর প্রস্তুতির পর শতাংশপ্রতি ৮০-১০০টি পোনা মজুদ করা যায়। পোনা মজুদের পরে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ৫ ভাগ হারে দিনে ২ বার সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ দিন পর পর শতাংশপ্রতি ২ কেজি গোবর কিংবা ৫ কেজি কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ৫ থেকে ৬ মাস প্রতিপালনের পর যখন প্রতিটি মাছের গড় ওজন প্রায় ১৫০-২০০ গ্রাম হবে তখন মাছগুলো বিক্রয়যোগ্য হবে। অর্থাৎ ৫-৬ মাসের মধ্যে প্রতি শতাংশে ১৫-২০ কেজি মাছ উৎপন্ন হবে। অনেক সময় মজুদ পুকুরে পোনা মজুদের তৃতীয় মাসের পর হতে পুকুরের কিনারে রেণুপোনার ঝাঁক দেখা যেতে পারে।

পুকুরের কিনারে রেণু পোনার ঝাঁক দেখা গেলে ঘন মেস সাইজের জাল দিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর পুকুর হতে অবশ্যই তা তুলে ফেলতে হবে। অন্যথায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না।

নাইলোটিকার রোগবালাই : সাধারণভাবে নাইলোটিকা মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। ফলে এদের রোগ বালাই হয় না বললেই চলে। তবে পানি দূষণ হলে অথবা পানির পরিবেশ খারাপ হলে এ মাছেরও নানা ধরনের রোগ হতে পারে, যেমন- পরজীবীঘটিত রোগ। বিশেষত শীতকালে পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস বা নানা ধরনের আবর্জনা জমে পুকুরের তলদেশের মাটি পচে দুর্গন্ধ হলে তথা মাটি ও পানির পরিবেশ নষ্ট হলে নানা ধরনের পরজীবী দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পুকুরের মাছ পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলে জরুরি ভিত্তিতে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন পানিতে গুলে নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও আক্রান্ত মাছগুলোকে একটি বড় ড্রামে অথবা গামলায় ৫০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে তাতে ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত রেখে দিতে হবে। তাতে মাছের শরীরের পরজীবী মারা যাবে বা মাছের দেহ থেকে পড়ে যাবে। পরে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানিতে পোনাগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া ফরমালিন মিশ্রিত পানি দিয়েও চিকিৎসা করা যেতে পারে। যেমন- একটি চৌবাচ্চায় ১০০০ লিটার পানিতে ৩০ মি.লি. ফরমালিন মিশিয়ে আক্রান্ত মাছগুলোকে ৩০-৪০ মিনিট পর্যন্ত গোসল করালে রোগ সেরে যায়।

মাছের উৎপাদন : আধা-নিবিড় ব্যবস্থাপনায় সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল ব্যবহার করা হলে প্রতি ৬ মাসে একরপ্রতি কমপক্ষে ৩-৩.৫ মে.টন মাছ উৎপাদিত হতে পারে।

মাছ আহরণ ও বাজারজতকরণ : বেড়জাল ব্যবহার করে তেলাপিয়া মাছ আহরণ করা যায়। তবে এ মাছ যেহেতু প্রজননের জন্য পুকুর পাড়ের কিনারে বা পুকুরের তলদেশে গর্ত করে ফলে জাল টানলে জালে সব মাছ আসে না। গর্তের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে। তাই সব মাছ আহরণ করতে হলে পুকুরের পানি কমিয়ে মাছ ধরতে হবে বা সেচ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে মাছ আহরণ করতে হবে। আর মাছ ধরার ক্ষেত্রে ভোর বেলায় মাছ ধরতে হবে। ভোর বেলায় মাছ ধরলে রোদ্রে বা গরমে মাছ পচে যাওয়ার আগেই বাজারজাত করা যায়। সম্ভব হলে জীবিত অবস্থায় মাছ বাজারজাতকরণ করতে হবে। এতে অনেক বেশি দাম পাওয়া যায়।

থাই সরপুঁটি বা রাজপুঁটির চাষ

আমাদের দেশে ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ড থেকে এ মাছ আমদানি করা হয় বলে একে থাই সরপুঁটি বলা হয়। আবার অনেকে এ মাছকে রাজপুঁটি নামেও অভিহিত করে থাকেন। থাই সরপুঁটি দেখতে অনেকটা দেশী সরপুঁটির মতো। তবে থাই সরপুঁটি দেশী সরপুঁটির চেয়ে উজ্জ্বল, বেশি প্রশস্ত। নিচে মৌসুমী পুকুরে থাই সরপুঁটি চাষের সুবিধা সমূহ বর্ণনা করা হলো।

থাই সরপুঁটি চাষের সুবিধা সমূহ–

- মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল, সুস্বাদু তাই বাজারে বেশ চাহিদা আছে;
- যেকোন আকারের ছোট-বড় ডোবা, পুকুর দিঘি ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়;
- প্রতিকূল পরিবেশে তুলনামূলকভাবে কম অক্সিজেন ও বেশি তাপমাত্রায়ও এ মাছ বাঁচতে পারে;
- ঘোলা পানির পুকুরেও এ মাছ চাষ করা যায়;
- মাছটির বর্ণ আকর্ষণীয় উজ্জ্বল রূপালী সাদা এবং এটি একটি শক্ত গড়নের মাছ ফলে সহজেই রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না;

- সব ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে অভ্যস্ত। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ, যেমন- ক্ষুদিপানা, সুজিপানা প্রভৃতি এদের প্রিয় খাদ্য। সম্পূরক বা বাড়তি খাদ্য খেতে এ মাছ খুব স্বাচ্ছন্দ বোধ করে;
- সম্পূরক খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র চালের কুঁড়া ব্যবহার করেই এ মাছটির ভাল ফলন পাওয়া যায়;
- ৬-৭ মাস পানি থাকে এমন জলাশয়ে খুব সহজেই এ মাছ চাষ করা যায়। কারণ এরা ৬-৭ মাসেই ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের হয় এবং বাজারজাত করা যায়;
- অপেক্ষাকৃত কম খরচে ও সহজ ব্যবস্থাপনায় অল্প সময়ে এ মাছটির অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়;
- একক বা মিশ্র উভয় পদ্ধতিতে এ প্রজাতির মাছচাষ করা যায়। তবে মিশ্রচাষের চেয়ে একক পদ্ধতিতে এ মাছচাষ উত্তম। এতে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়;
- একই পুকুরে বছরে দু'বার চাষ করা যায় ও
- হ্যাচারিতে অতি সহজেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

রাজপুঁটির শারীরিক গঠন : রাজপুঁটির দেহের বর্ণ উজ্জ্বল রূপালী এবং লেজ খাঁজ কাটা। পায়ু ও শ্রোণী পাখনার রং রক্তিম গোলাপি, বক্ষ পাখনার রং হালকা হলুদাভ ও অনেকটা বিবর্ণ। পৃষ্ঠদেশ কিছুটা প্রশস্ত। মুখ গহ্বরে তিন সারি দাঁত বিদ্যমান। এ মাছটির কোন পাকস্থলী নেই। অন্ত্রনালীর মধ্যেই এদের খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অন্ত্রনালীর দৈর্ঘ্য শরীরের দৈর্ঘ্যের দুই-তিন গুণ লম্বা হয়ে থাকে। এদের দেহ গোলাকার আঁইশ দ্বারা আবৃত। সাধারণ ব্যবস্থাপনায় এক বছরে থাই সরপুঁটি সাধারণত ২৫০-৪০০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। তবে সর্বোচ্চ এরা ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

চিত্র-৩৮ : থাই সরপুঁটি

রাজপুঁটির চাষ পদ্ধতি : সঠিকভাবে পুকুর নির্বাচন ও পুকুর প্রস্তুতির ওপর মাছচাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মাছচাষে সফলতা পেতে হলে সঠিকভাবে পুকুর নির্বাচন ও পুকুর প্রস্তুতি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। উক্ত কার্যক্রম কিভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে নিচে তার বর্ণনা দেয়া হলো।

পুকুর নির্বাচন : সারা বছর পানি থাকে অথবা মৌসুমী পুকুর এ দু'ধরনের পুকুরেই সরপুঁটি চাষ করা যায়। পুকুরের আয়তন ১-৩ বিঘা এর মধ্যে হলেই ভালো হয়। তবে এর চেয়ে বড় বা ছোট আকারের পুকুরেও এ মাছ চাষ করা যায়। পুকুরটি আগাছামুক্ত ও খোলামেলা এবং বন্যামুক্ত স্থানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুকুরের গভীরতা ৩-৫ ফুট হলে ভালো হয়। পুকুর পাড়ে বড় ধরনের গাছপালা এবং গাছের পাতা পানিতে পড়তে পারে এ জাতীয় গাছ না থাকাই ভালো। পুকুরের পানির উপর গাছের ছায়া পড়লে পুকুরে সূর্যালোকের অভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মাতে পারে না। তদুপরি গাছের পাতা পানিতে পচে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ বিনষ্ট করা সহ উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। সাধারণত দোঁ-আশ ও কাদাযুক্ত দোঁ-আশ মাটি পুকুরের জন্য উত্তম। মাছচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য পুকুরটি আয়তাকার হওয়া উচিত। সার্বিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পুকুরের অবস্থান বসতবাড়ির নিকটে হওয়া ভালো।

পুকুর প্রস্তুতি : পোনা মজুদের পূর্বে অবশ্যই ভালোভাবে পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। মাছের শারীরিক বৃদ্ধির স্বার্থে পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতির বিভিন্ন

পর্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে নিচে বর্ণনা করা হলো। যেমন- জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ, চুন ও সার প্রয়োগ ইত্যাদি।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ : পুকুরে কোনো প্রকার জলজ আগাছা থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জলজ আগাছা পুকুরের পুষ্টি শোষণ করে এবং পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা প্রদান করে ও জলজ কীটপতঙ্গসহ রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাই পুকুর হতে সকল প্রকার জলজ আগাছা দূর করতে হবে। তবে সরপুঁটি মাছ উদ্ভিদ ভোজী স্বভাবের হওয়ায় সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ভাসমান জলজ উদ্ভিদ, যেমন- ক্ষুদিপানা, সুজিপানা, নরম ঘাস ইত্যাদি রাখা যেতে পারে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ : জলজ আগাছা দূরীকরণের পর পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ আমরা বিভিন্নভাবে দূর করতে পারি। যেমন- পানি শুকিয়ে, ঘন ঘন জাল টেনে, মাছ মারার ঔষধ (বিষ) প্রয়োগ করে ইত্যাদি। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের পর পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

চুন প্রয়োগ : পুকুরের পানিকে মাছের বসবাসের জন্য পরিবেশ উপযোগী এবং মাছকে রোগমুক্ত রাখতে মাছচাষের পুকুরে অবশ্যই নিয়মিতভাবে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে যদি রোটেনন প্রয়োগ করা হয় তাহলে রোটেনন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং টিএসপি সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন আগে শতাংশপ্রতি সাধারণত ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের নিদিষ্ট বিরতির পর সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ : মাছের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করার জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সার প্রয়োগের ফলে পুকুরের পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা বৃদ্ধি পায় যা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চুন প্রয়োগের অন্তত ৫-৭ দিন পর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরোক্ত দু’ধরনের সার একত্রে একটি পাত্রে পানির সাথে ভালোভাবে গুলে সূর্যালোকিত দিনের প্রথম ভাগে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। টিএসপি সার ধীরে ধীরে গলে যায় বলে সার প্রয়োগের অন্তত ১২ ঘণ্টা পূর্বে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। আর ইউরিয়া সার সহজে গলে এবং উদ্বায়ী বলে পূর্বে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। প্রয়োগকালীন সময়ে অন্যান্য সারের সাথে মিশিয়ে নিলেই চলবে। উল্লেখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে ৪-৫ দিনের মধ্যে পানির রঙ হালকা সবুজ বা লালচে সবুজ ধারণ করে যা প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

সারের নাম	শতাংশ প্রতি ব্যবহার মাত্রা
গোবর অথবা	৫ কেজি
কম্পোষ্ট সার	১০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫ গ্রাম

প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষাকরণ : সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমিত পরিমাণে তৈরি হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে পোনা ছাড়ার উদ্যোগ নিতে হবে। পানির রং দেখে অথবা স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পানি নিয়ে প্ল্যাংকটনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেও তা পরিমাপ করা যেতে পারে। ঘোলা পানিতে এ পরীক্ষায় সঠিক ফল পাওয়া যাবে না। পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে পোনা মারা যাবে বিধায় পোনা ছাড়ার পূর্বে পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক কোনো পাত্রে পরিমাণমতো পানি নিয়ে তার মধ্যে ৫-৭টি পোনা রেখে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে অথবা পুকুরের পানিতে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে অন্তত ২৪ ঘণ্টা রাখার পর পোনা মারা না গেলে পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। পোনা

ছাড়ার আগের দিন পুকুরে ২-৩ বার হড়রা বা জাল টেনে নেয়া যেতে পারে। এতে করে তলদেশে জমা দূষিত গ্যাস দূর হবে।

পোনা মজুদ : একক চাষের ক্ষেত্রে ২-৩ ইঞ্চি (৮-১০ গ্রাম ওজনের) আকারের পোনা নির্বাচন করাই উত্তম। ছোট আকারের পোনা মজুদে পোনা মৃত্যুর হার বেশি হয় এবং আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা কম থাকে। পুকুরের পানিতে পরিমিত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকলে শতাংশপ্রতি ৭০-৭৫টি চারা পোনা মজুদ করা যায়। আর মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে কাতলা, রুই, মৃগেল, সিলভার কার্প, মিরর কার্প প্রভৃতি মিলে ৩০-৪০টি পোনার সাথে শতাংশপ্রতি অতিরিক্ত ১০-১৫ সরপুঁটি মজুদ করা যেতে পারে।

পোনা অভ্যস্তকরণ ও পুকুরে ছাড়া : পোনা মাছ সকালে বা বিকেলে পাড়ের কাছাকাছি ঠাণ্ডা পরিবেশে পুকুরে ছাড়াই উত্তম। অতি বৃষ্টিতে বা কড়া রোদের সময় পোনা ছাড়া উচিত নয়। পুকুরে পোনা বেঁচে থাকার হার বাড়ানোর জন্য পোনা টেকসই বা অভ্যস্তকরণ করে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে। নিকটবর্তী স্থানের জন্য পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে দূরবর্তী স্থানের জন্য অক্সিজেন ভর্তি পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহন করা অধিকতর নিরাপদ। পুকুরে পোনা ছাড়ার সময় পোনাভর্তি ব্যাগ বা পাত্রের অর্ধাংশ পুকুরের পানিতে ১০-১৫ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এর পর ব্যাগ বা পাত্রের মুখ খুলে কাত করে ধরতে হবে অতঃপর পাত্র বা ব্যাগের কিছু পানি বের করে এবং পুকুরের পানি ভিতরে ঢুকিয়ে উভয় পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হবে। যখন পাত্রের ভিতরের এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে তখন ব্যাগ বা পাত্রটিকে কাত করলে পোনাগুলো আপনা-আপনি পুকুরে চলে যাবে।

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ : পুকুরে পোনা মজুদের পর প্রয়োজনমতো নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের জন্য সেকিডিস্ক পাঠ দেখে নিতে হবে। সেকিডিস্ক পাঠ ৩০ সে.মি. এর বেশি হলে সার প্রয়োগ করা উচিত এবং কম হলে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। মজুদ পরবর্তী সময়ে ভালো ফল লাভের জন্য জৈব ও অজৈব সার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ১৫ দিন অন্তর অন্তর পুকুরের পানির বর্ণ দেখে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হলে শতাংশপ্রতি ১ কেজি গোবর অথবা ২ কেজি কম্পোস্ট সার, ২০ গ্রাম টিএসপি মিশিয়ে ৩ গুণ পানি দিয়ে একটি পাত্রে ১ রাত ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে। পরের দিন সকালে প্রয়োগের আগে ৪০ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে ভালো করে পানিতে গুলে নিয়ে প্রখর সূর্যালোকিত দিনে ১০-১১ টার মধ্যে সারা পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পুকুরের পানির বর্ণ যদি অত্যধিক সবুজ রঙ ধারণ করে তাহলে সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। উল্লেখ্য, ঘোলা পানির কারণে সেকিডিস্ক পাঠ এ সঠিক তথ্য নাও পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকেই সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ণয় করতে হবে।

পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ : পুকুরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয় বিধায় মাছের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। রাজপুঁটি মাছের জন্য মাছ ছাড়ার পর দিন হতে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মোট মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, সবুজ উদ্ভিদ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কুঁড়া বা ভুসি এবং সরিষার খৈল সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে ৭৫% চালের কুঁড়া বা গমের ভুসির সাথে ২৫% সরিষার খৈল ব্যবহার করা যেতে পারে। সরিষার খৈল কমপক্ষে ১ রাত ২ গুণ পরিমাণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে ভেজা খৈলের সাথে কুঁড়া বা ভুসি মিশিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করে সকালে বা বিকেলে খাদ্যদানিতে প্রয়োগ করতে হবে। এ

জাতীয় খাদ্য ছাড়াও রাজপুঁটি মাছের জন্য অনেক সময় ভাসমান খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র গমের ভুসি বা কুঁড়া শুকনো অবস্থায় পানির উপরে শতাংশ প্রতি নিম্নলিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করেও ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে ক্ষুদিপানা, সুজিপানা, নরম ঘাস, যেমন- পারা, নেপিয়ার, কলাপাতা প্রভৃতি সরপুঁটি মাছ আগ্রহ সহকারে খেয়ে থাকে। এসব সবুজ ঘাস ও পানা পুকুরে স্থাপিত ‘ফিডিং রিং’ -এ সকালে বিকেলে দিতে পারলে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। ঘাসের পরিমাণের ক্ষেত্রে কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। তবে সর্বদা 'ফিডিং রিং' ঘাস দ্বারা পূর্ণ রাখতে পারলে ভালো। সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য মাসে একবার জাল টেনে নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের গড় ওজন বের করে মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করে জীবভর নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে।

মাছের পরিচর্যা : পুকুরে মাটি ও পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে সার ও খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। মাছের শারীরিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও রোগবালাই পরীক্ষা করার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একবার জাল টেনে নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, কার্বন-ডাই অক্সাইড ও প্ল্যাংকটনের পরিমাণ নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা প্রয়োজন। মাছ ধরে পুনরায় পুকুরে ছাড়ার পূর্বে শোধন করে তথা জীবাণুমুক্ত করে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে। এ কাজে ২০ লিটার পানিতে ৫০ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা ২০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে ধৃত মাছগুলোকে ১ মিনিট গোসল করিয়ে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে। এর পরেও কোনো রোগ বালাই দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাছের রোগবালাই : রাজপুঁটি মাছ মূলত খুব শক্ত গড়নের মাছ এবং এরা প্রতিকূল পরিবেশেওসুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাই এদের রোগ-বালাই অন্যান্য মাছের তুলনায় কম। তবে অত্যধিক প্রতিকূল পরিবেশ তথা বিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে কিছু কিছু রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে, যেমন- ক্ষত রোগ, আঁইশ উঠে যাওয়া রোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ ইত্যাদি। সাধারণত শীতের শুরুতেই এসব রোগবালাই হয়ে থাকে। আর একবার রোগবালাই শুরু হলে রোগের চিকিৎসা করে তত ভালো ফল পাওয়া যায় না । তাই রোগ যেন না হয় তার জন্য পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি শতাংশপ্রতি ১ কেজি চুন এবং ১ কেজি লবণ ব্যবহার করলে ক্ষত রোগসহ অন্যান্য রোগের প্রকোপ থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : সময়মতো মাছ আহরণ ও বিক্রি সফল মাছচাষের জন্য অপরিহার্য। একই সময়ে মজুদ করা হলেও সব মাছ একই সাথে সমভাবে বাড়ে না। কিছু মাছ দ্রুত বাড়ে আবার বাকিগুলো ছোট থেকে যায়। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ বাজারজাত উপযোগী হলে অবশ্যই বাজারে বিক্রি করে দেয়া উচিত। এভাবে আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে কিছু মাছ ধরার পর আহরণকৃত মাছের সংখ্যা পূরণ করার জন্য বড় আকারের সমপরিমাণ পোনা পুকুরে ছাড়তে হবে। পোনা মজুদের ৩ মাসের মধ্যেই সরপুঁটি মাছ বিক্রি উপযোগী হয় অর্থাৎ ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে যায়। এভাবে আংশিক আহরণ এবং পুনঃমজুদ পদ্ধতিতে অল্প জায়গা হতে অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। থাই সরপুঁটি মাছ আহরণ করা বেশ সহজ। বেড় জাল, ঝাঁকি জাল, ফাঁস জাল ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজেই এ মাছ আহরণ করা যায়। আহরণের সাথে সাথে জীবিত অথবা তাজা অবস্থায় বাজারজাত করলে ভালো দাম পাওয়া যায়। জীবিত অবস্থায় বাজারজাত করলে উজ্জ্বল রূপালী চকচকে মাছ অতি সহজেই ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম। বর্ণিত পদ্ধতিতে চাষ করলে একক চাষের ক্ষেত্রে ৩-৪ মাসে শতাংশপ্রতি কমপক্ষে ৮-১০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। বাৎসরিক পুকুরে এ মাছের চাষ করা হলে বছরে ২টি ফসল তোলা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি উৎপাদন আরো বেড়ে যাবে।

অনুশীলনী-১০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৌসুমি পুকুর কাকে বলে?
২. মৌসুমি পুকুরে সাধারণত কত মাস পানি থাকে?
৩. মৌসুমি পুকুরে চাষযোগ্য মাছের দুইটি প্রজাতির নাম লিখ?
৪. তেলাপিয়া মাছের আদিনিবাস কোন দেশ?
৫. কোন বয়সে তেলাপিয়া নাইলোটিকা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে?
৬. স্ত্রী তেলাপিয়া তার লার্ভিগুলোকে কত দিন বয়স পর্যন্ত মুখে রেখে যত্ন ও নিরাপত্তা বিধান করে?
৭. পুকুরে মজুদকৃত প্রজননক্ষম তেলাপিয়ার দৈহিক ওজনের শতকরা কত ভাগ সম্পূরক খাদ্য দেয়া হয়?
৮. তেলাপিয়ার রেণু প্রতিপালনের জন্য সাধারণত আঁতুড় পুকুরের গভীরতা কত হয়?
৯. পোনা লালন পুকুরে শতাংশপ্রতি সাধারণত কতটি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা হয়?
১০. মজুদ পুকুরে শতাংশপ্রতি সাধারণত কতটি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা হয়?
১১. আমাদের দেশে থাই সরপুঁটি কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়?
১২. একক চাষের ক্ষেত্রে শতাংশপ্রতি কতটি থাই সরপুঁটির পোনা মজুদ করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তেলাপিয়া মাছের দুইটি উন্নত জাতের নাম লেখ।
২. নাইলোটিকা চাষের দুইটি সুবিধা লেখ।
৩. পুরুষ ও স্ত্রী তেলাপিয়ার দুইটি বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য লেখ।
৪. সম্প্রসারিত মাছচাষ পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?
৫. আধা নিবিড় মাছচাষ পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?
৬. থাই সরপুঁটি চাষের দুইটি সুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মৌসুমি পুকুরে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে নাইলোটিকার চাষ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. মৌসুমি পুকুরে রাজপুঁটির চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায়

সমন্বিত মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত মৎস্য চাষ (Integrated Fish Farming) হচ্ছে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খামারের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হওয়ার জন্যে একই জমিতে, একই সময়ে, একই সাথে একাধিক ফসল উৎপাদন করা। যেমন- ধান ও মাছ চাষ, মাছ ও হাঁস-মুরগি চাষ, মাছ ও শাক সবজি চাষ, মাছ ও গবাদি পশু পালন ইত্যাদি। খামারের বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবহার করে কম বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোই সমন্বিত মৎস্য চাষের মূল উদ্দেশ্য।

সমন্বিত মৎস্য চাষের সুবিধাসমূহ

- একই জমিতে একই সময়ে অল্প খরচে মাছের সাথে একাধিক ফসল পাওয়া যায়;
- উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- ধান ও মাছচাষে কুঁড়া মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- মাছ ও হাঁস মুরগি পালনে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য সরাসরি মাছের খাদ্য অথবা জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- ক্ষেতের আগাছা দমনের জন্য অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন হয় না;
- সারা বছরই নানা খাত থেকে আয় হয়;
- পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুন্দর থাকে;
- পরিবারের অতিরিক্ত জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- ঝুঁকি কম থাকে অর্থাৎ কোন উৎপাদন কার্যক্রম প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে ব্যহত হলে অন্য উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নেয়া যায়;
- পরিবেশের ভারসাম্য এবং জমির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকে;
- ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার কম হয় ফলে খরচ কমে যায়;
- পরিশেষে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় ফলে লাভের অংশ অনেক বেড়ে যায়।

সমন্বিত মৎস্য চাষের অসুবিধাসমূহ

- একক চাষ অপেক্ষা সমন্বিত চাষে অপেক্ষাকৃত বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়;
- এ ক্ষেত্রে ফসল নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূণ;
- চাষে শ্রমের নিবিড়তা অনেক বেশি;
- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অত্যন্ত নমনীয় ও
- সমন্বিত চাষের সফলতা ধীরে ধীরে আসে।

সমন্বিত মৎস্য চাষের ক্ষেত্রসমূহ : গ্রামীণ ছোট বা বড় পুকুরে মাছ চাষের সাথে অন্য একটি বা দুটি কার্যক্রম সমন্বয় করা যায়। তবে অপেক্ষাকৃত বড় খামারে দুই বা ততোধিক কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী সমন্বিত মাছ চাষকে নিম্নরূপে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

১. ধানক্ষেতে মাছচাষ
২. ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ
৩. মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ
৪. মাছ ও হাঁসের সমন্বিত চাষ
৫. মাছ ও সব্জির সমন্বিত চাষ

এ অধ্যায়ে সমন্বিত মৎস্য চাষের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা হলো।

ধান ক্ষেতে মাছচাষ

কৃষিনির্ভর জনবহুল এ দেশে চাষবাদের জমি অত্যন্ত সীমিত। প্রয়োজন তাই একই জমির বহুবিধ ব্যবহার। এ প্রয়োজন মেটানোর একটি উপায়, ধানক্ষেতে মাছচাষ। সার ও শ্রমিকের উচ্চ মূল্যের কারণে ক্রমেই কৃষকরা ধান চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। ধানক্ষেতে মাছচাষ করে কৃষকের এ আগ্রহ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সুবিধা

- ধানের সাথে মাছচাষ করলে একই জমি থেকে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে মাছ পাওয়া যায়;
- মাছ চাষের জন্য আলাদা কোন জায়গার দরকার হয় না;
- মাছ ধানের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলে এবং জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে;
- মাছের মল ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ধানক্ষেতে সার হিসেবে কাজ করে। এতে সারের খরচ অনেকাংশে কমে যায়;
- ধানক্ষেতে সাধারণত কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না;
- ধানের ফলন শতকরা ১০ ভাগ এবং খড়ের উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়;
- মাছকে খাদ্য সরবরাহ করা হলে অব্যবহৃত খাদ্য পচে গিয়ে ধানের সার হিসেবে কাজ করে;
- ধানক্ষেতে মাছচাষ বিশেষ করে কমন কার্প চাষ করলে মাছ ধান গাছের গোড়ার মাটি উলোট পালট করে। ধান গাছের গোড়া আন্দোলিত হয় ফলে ধান গাছ সতেজ হয় এবং ধানের ফলন বেড়ে যায়;
- ধানের সাথে মাছচাষ করলে পোনা ক্রয়ের খরচ ছাড়া তেমন কোনো বাড়তি পুঁজির প্রয়োজন হয় না;
- পরিশেষে ধানক্ষেতে মাছচাষ করলে অল্প শ্রম এবং অল্প খরচে বেশি আয় হয়।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের অসুবিধা : আর্থিক ও পরিবেশগত দিক থেকে লাভজনক সত্ত্বেও ধানক্ষেতে মাছ চাষের বেলায়ও কিছু বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন-

- গভীর/অগভীর নলকূপ নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় জমিতে পরিমাণ মতো পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না;
- বৃষ্টি না হলে এবং বাহির থেকে পরিমাণমতো পানির ব্যবস্থা করতে না পারলে পানি শুকিয়ে মাছ মারা যেতে পারে। আবার বেশি বৃষ্টি হলে ধানক্ষেত ভেসে গিয়ে মাছ চলে যেতে পারে;
- মাছ ছাড়ার পর রাসায়নিক সার বিশেষ করে দানাদার সার (ইউরিয়া, টিএসপি) পানিতে গুলে না দিয়ে সরাসরি দানাদার অবস্থায় ব্যবহার করলে সারের দানা খেয়ে অনেক সময় মাছ মারা যেতে পারে;
- ধানক্ষেতে খুব বেশি পোকা লাগলে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, যা মাছের জন্য ক্ষতিকর;
- ধানের জমিতে পানি কম থাকায় বা কম হয়ে গেলে সাপ, ব্যাঙ ও বক ছোট ছোট মাছ ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। তবে অপেক্ষাকৃত বড় পোনা ছাড়লে এ অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়;
- ধান ক্ষেতে পরিমাণমতো (৬"-৮") পানির চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি থাকলে ধানের কুশির সংখ্যা কমে যাবে।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের পদ্ধতিসমূহ : জমির ধরন অনুযায়ী ধান ক্ষেতে মাছ চাষের পদ্ধতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ধানের সাথে মাছের চাষ এবং
২. ধানের পরে মাছের চাষ ।

ধানের সাথে মাছের চাষ

এ পদ্ধতিতে একই জমিতে ধান ও মাছ একত্রে চাষ করা হয়। আমন মৌসুমে মাঝারি উঁচু জমিতে যেখানে ৪–৬ মাস বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত পানি জমে থাকে অথবা বোরো মৌসুমে যেসব জমি সেচ সুবিধার আওতাধীন সে সমস্ত জমিতে এ পদ্ধতি উপযোগী।

ধানের পরে মাছের চাষ

এ পদ্ধতিতে একই জমিতে ধান ও মাছ একটির পর অপরটি চাষ করা যায়। বাংলাদেশের যেসব জমি বর্ষাকালে প্লাবিত হয় এবং যেখানে গভীর পানির আমন ধান ছাড়া অন্য কোনো জাতের ধান চাষ করা যায় না যেখানে বোরো মৌসুমে ধানের চাষ করে পরে বর্ষা মৌসুমে এ পদ্ধতিতে মাছচাষ করা হয়। যেমন- ভালুকা ও টাংগাইলের নিম্নাঞ্চল। এ ধরনের জমিতে শুষ্ক (বোরো) মৌসুমের ফসল হিসেবে একমাত্র বোরো ধান উৎপন্ন করা হয় এবং বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানির জন্য ধান চাষ না করে মাছের চাষ করা হয়। নিচে আমন এবং বোরো ধানের সাথে মাছ চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

জমি নির্বাচন : জমি নির্বাচনের ওপর মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে। সব ধান ক্ষেতই মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়। তাই জমি নির্বাচনের সময় নিচে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

- যেসব জমি অতি উঁচু অর্থাৎ পানি ধরে রাখতে পারে না এবং যেসব জমি অধিক নিচু অর্থাৎ সহজেই প্লাবিত হয় সেসব জমি এ ধরণের সমন্বিত মাছ চাষের অনুপযোগী। বন্যার পানি প্রবেশ করে না কিন্তু পানি ধারণক্ষমতা বেশি এরূপ মাঝারি উঁচু জমিই মাছ চাষের উপযোগী;
- সাধারণত দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ এবং এঁটেল মাটির পানির ধারণক্ষমতা এবং উর্বরা শক্তি বেশি বিধায় এসব মাটির জমি ধানক্ষেতে এ ধরণের মাছ চাষের জন্য উপযোগী;
- নির্বাচিত জমি কৃষকের বাড়ির যতটা কাছাকাছি হয় ততই ভালো। এতে ধান ও মাছের যত্ন নেয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়;
- বোরো মৌসুমে চাষের ক্ষেত্রে সেচের সুবন্দোবস্ত থাকতে হবে;
- জমিতে অন্তত ৩ মাস কমপক্ষে ১২ ইঞ্চি পানি থাকতে হবে;
- আইল উঁচু করে বাঁধার কারণে পানি চলাচল বন্ধ হয়ে অন্য কৃষকের সমস্যা সৃষ্টি হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;
- ২/৩ জন কৃষক এক সাথে ধান ক্ষেতে মাছচাষ করতে পারে। এক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি থাকতে হবে, ও
- সঠিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জমির আয়তন ৫০-১০০ শতাংশ হলে ভালো হয়।

জমি প্রস্তুতকরণ : মাছ চাষের জন্য জমির প্রস্তুতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। জমির প্রস্তুতি যত ভালো হবে, তত বেশি ধান ও মাছ উৎপন্ন হবে। ধানক্ষেতে মাছ চাষের জন্য জমি প্রস্তুতির কাজগুলো নিম্নরূপ–

১. জমি সমতল করা;

২. আইল উঁচু করা;
৩. গর্ত ও নালা তৈরি করা;
৪. জমিতে পানি ও হাল চাষ দিয়ে কাদা তৈরি করা;
৫. সার প্রয়োগ করা।

জমি সমতল করা : জমি উঁচু নিচু থাকলে তা সমতল করে নিতে হবে। এতে করে পানির গভীরতা জমির সব স্থানে একই রকম হবে এবং মাছ সমস্ত ধানক্ষেতে চরে বেড়াতে পারবে। ধানের সাথে মাছ চাষের সময় ক্ষেতের সব অংশে কমপক্ষে ৫-৬ ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ ১২ ইঞ্চি পরিমাণ পানি ধরে রাখা আবশ্যক।

আইল উঁচু করা : বন্যার পানি যে পর্যন্ত উঠে তার থেকে ১-১১২ ফুট উঁচু করে ক্ষেতের চারপাশে আইল বা বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। তবে আইলের উচ্চতা নির্ভর করবে জমির অবস্থানের ওপর। ইঁদুর, কাঁকড়া অথবা অন্যান্য প্রাণী যাতে আইলে গর্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি জমে ক্ষেতে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশে আইলের কিছু জায়গা ভেঙে বাঁশের বানা বা ছাঁকনিযুক্ত পাইপ দিয়ে মাছ আটকিয়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। তাহলে পানির চাপে আইল ভাঙার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যাবে।

গর্ত ও নালা তৈরি করা : জমির যে অংশ অপেক্ষাকৃত নিচু সে অংশে জমির শতকরা ৫ ভাগ এলাকাজুড়ে কমপক্ষে ৩ ফুট গভীর গর্ত খনন করতে হবে। গর্তের গভীরতা এর বেশি হলে মাছ গর্ত ছেড়ে ধান ক্ষেতে যাবে না ফলে মাছের বৃদ্ধি কম হবে। ধান ক্ষেতের চারপাশে, মাঝখানে এবং এক কোনায় এক বা একাধিক নালা তৈরি করতে হবে যা গর্তের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকবে। এতে মাছ সমস্ত ধানক্ষেতে সহজে চলাচল করতে পারবে। নালাগুলো ১ থেকে দেড় ফুট চওড়া এবং ১ থেকে দেড় ফুট গভীর হতে হবে। ধান ক্ষেতের পানি গরম হয়ে গেলে মাছ এসব নালায় ও গর্তের ঠাণ্ডা পানিতে আশ্রয় নিতে পারবে। এছাড়া ক্ষেতে পোকার আক্রমণ বেশি হলে এসব নালার মাধ্যমে পানি কমিয়ে মাছকে গর্তে নিয়ে ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। মাছ ধরার সময় সব মাছকে সহজে একত্রিত করার ক্ষেত্রেও এসব নালা ও গর্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

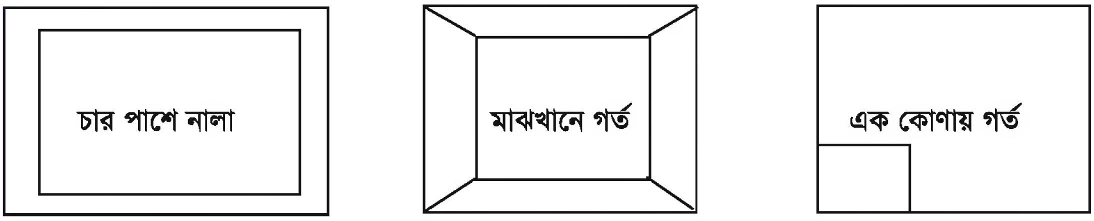

চিত্র-৩৯ : ধান ক্ষেতে মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের গর্ত ও নালার নকশা

জমিতে পানি ও হাল চাষ দিয়ে কাদা তৈরি করা : জমিতে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে মাটির প্রকারভেদ অনুসারে ২-৩টি চাষ ও মই দিতে হবে যেন মাটি থকথকে কাদাময় হয়। চাষ সরাসরি ধানের ফলন না বাড়ালেও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সহায়তা করে। প্রথম চাষের পর অন্তত ৭ দিন পর্যন্ত জমিতে পানি আটকিয়ে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে যাবে এবং যা পরবর্তীতে সার হিসেবে কাজ করবে। শেষ চাষের সময় অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমি যেন যথেষ্ট সমতল হয়।

সার প্রয়োগ : ধানক্ষেতে মাছ চাষের সময় নিম্নবর্ণিত মাত্রায় একর প্রতি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারের নাম	অনুমোদিত মাত্রা (কেজি)	মাছের জন্য বর্ধিত পরিমাণ (কেজি)	মোট পরিমাণ (কেজি)	প্রয়োগকাল (কিস্তি/সময়)
ইউরিয়া	৭০	১১	৮১	৩ কিস্তিতে
টিএসপি	৫৪	৮	৬২	শেষ চাষে
এমপি	২৭	৪	৩১	শেষ চাষে
জিপসাম	৪৫	৭	৫২	শেষ চাষে

অনুমোদিত মাত্রার ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে ধান রোপণের ৩০তম দিন, ৪৫তম দিন এবং ৬০তম দিন উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য সার জমিতে শেষ চাষ দিয়ে মাটি কাদা করার সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি : ধান গাছের বাড়-বাড়তির বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকের কুশি গজানোর সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে তা থেকে কাইচ থোর আসা পর্যন্ত অর্থাৎ ধানের ছড়ার বাড়-বাড়তির সময় গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পেলে প্রতি ছড়ায় পুষ্ট ধানের সংখ্যা বাড়ে। সবশেষে ফুল আসার পর ধান গাছ যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তা ধানের দানা পুষ্ট করতে সহায়তা করে। ফলে ধানের ওজন বৃদ্ধি পায়। ইউরিয়া সার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রথম দিকেই চারার কুশির সংখ্যা বাড়ানো, কারণ সাধারণত প্রথম দিকের কুশিতেই ছড়া ভালো হয়। তাই প্রথম দিকে কুশি বাড়ানো এবং সে সব কুশিকে সবল রাখার জন্য জমির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে কিছু ইউরিয়া সারসহ অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে বা চারা মাটিতে শক্ত করে দাঁড়ানোর পর পরই ব্যবহার করতে হবে। সার দেয়ার সময় অবশ্যই মাটিতে প্রচুর রস থাকা দরকার। শুকনো মাটিতে কিংবা জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে অথবা ধান গাছের পাতায় পানি জমে থাকলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

ধানের জাত নির্বাচন : ধানের সাথে মাছ চাষের জন্য আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত নির্বাচন করা উচিত। দেশী বা স্থানীয় জাতের ধান না লাগানোই ভালো। কারণ এ জাতের ধান গাছগুলো লম্বা হয় ফলে পানিতে নুয়ে পড়ে। এতে পানিতে রোদ পড়তে বাধার সৃষ্টি করে ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাংকটন জন্মে না। তাছাড়া মাছের চলাচলেও অসুবিধার সৃষ্টি করে। নিচে ধান ক্ষেতে চাষ উপযোগী কিছু উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত, ধানের জীবনকাল এবং হেঃ প্রতি ফলন দেয়া হলো।

ধানের জাত	জীবনকাল (দিন)	ধানের গড় ফলন (টন/হেঃ
বিআর-২ (মালা)	১৬০	৪
বিআর-৩ (বিপ্লব)	১৭০	৩
বিআর-৮ (আশা)	১৬০	৬.৫
বিআর-১১ (মুক্তা)	১৪৫	৫
বিআর-১২ (ময়না)	১৭০	৫
বিআর-১৪ (গাজী)	১৬০	৫
বিআর-১৬ (শাহী বালাম)	১৬৫	৩
বিআর-২০ (নিজামী)	১১৫	৪
বিআর-২৬ (শ্রাবণী)	১১৫	৪.৫

বীজ তলায় বীজ বপন : কমপক্ষে শতকরা ৮০টি বীজ গজায় এ রকম পুষ্ট ও পরিষ্কার বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ডুবিয়ে রেখে পরে পানি থেকে উঠিয়ে এনে ঘরের এক কোনায় বস্তাবন্দি অথবা কোন বড় মাটির পাত্রে বা ড্রামে জাগ দিয়ে রাখলে ধানের মুখ ফেটে অঙ্কুর বের হয়ে আসবে। এ অঙ্কুর বের হওয়ার পর বোনার উপযুক্ত সময়

আমন মৌসুমে ২ দিন এবং বোরো মৌসুমে ৩ দিন।

সার প্রয়োগ : উর্বর ও মাঝারি উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করলে কোন সারের প্রয়োজন হয় না। অনুর্বর ও স্বল্প উর্বর জমিতে প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি গোবর বা পচা আবর্জনা সার প্রয়োগ করলেই চলে। এছাড়াও যদি চারা গাছ হলদে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চারা গজানোর দুই সপ্তাহ পর প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে গন্ধকের অভাব রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করা দরকার। ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগের পর বীজতলার পানি নিষ্কাশন করা উচিত নয়। বোরো মৌসুমে অনেক সময় শীতে চারা লালচে বা হলদে হয়ে যায় যাকে টুংরো রোগ বলে অনেকেই ভুল করেন।

চারা উঠানো : চারা উঠানোর আগে বীজ তলায় বেশি করে পানি দিতে হবে যাতে বীজতলায় মাটি ভিজে একেবারে নরম হয়ে যায়। বেশ যত্নসহকারে বীজতলা থেকে চারা উঠাতে হবে যাতে চারা গাছের কান্ড ভেঙে না যায়। টানা হেঁচড়া করে তোলার পর আছাড় দিয়ে মাটি পরিষ্কার করলে চারার খুবই ক্ষতি হয় এবং রোপণের পর চারার বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, চারাগাছের শিকড় ছিঁড়ে গেলে রোপণের পর চারার বৃদ্ধির কোনোরূপ অসুবিধা হয় না।

চারা পরিবহন : অনেক সময় বন্যা বা অন্য কোনো কারণে এক এলাকায় চারার অভাব হলে অন্য এলাকা থেকে চারা এনে এ ঘাটতি পূরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বস্তাবন্দি অবস্থায় ধানের চারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, বস্তাবন্দি অবস্থায় চারা যেন ৫-৬ দিনের বেশি না থাকে।

ধানের চারা রোপণ পদ্ধতি : ধানের সাথে মাছের চাষ করার সময় ধানের চারা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে এবং সমান দূরত্বে রোপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে এক সারি থেকে আরেক সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি এবং ধানের গোছা (চারা) থেকে গোছার দূরত্ব ৮ ইঞ্চি রাখতে হবে। তবে মাছের জন্য পর্যাপ্ত আলোবাতাস এবং চলাচলের সুবিধার জন্য জোড়া সারি পদ্ধতিতে ধান রোপন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুটি সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি থেকে কমিয়ে ৬ ইঞ্চিতে আনা যেতে পারে। এতে জোড়া সারি হতে অন্য জোড়া সারির দূরত্ব ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতিতে যেহেতু ধানের গুছির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় একই থাকে, তাই ধানের ফলনের ক্ষেত্রে কোনো হেরফের হবে না অথচ মাছের চলাচলের জন্য কিছু ফাঁকা জায়গা বের হবে, ফলে মাছ স্বাচ্ছন্দ্যভাবে চলাচল করতে পারবে। প্রতিটি গোছায় ধানের চারার সংখ্যা হবে ৬-৮টি।

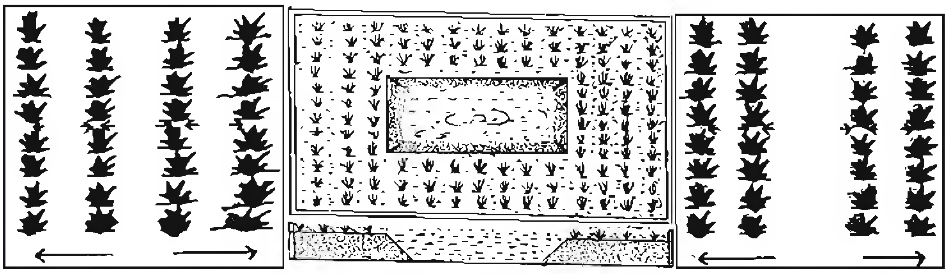

প্রচলিত পদ্ধতি কেন্দ্রীয় পুকুর পদ্ধতি জোড়া লাইন পদ্ধতি

চিত্র-৪০ : ধানক্ষেতে চারা রোপণের বিভিন্ন পদ্ধতি

চারার বয়স : বিপ্লব, চান্দিনা, আশা এবং সুফলা প্রভৃতি ধানের চারার বয়স আউশ মৌসুমে ২০-৩০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ৪০-৪৫ দিন হওয়া উচিত।

ধান ক্ষেতের যত্ন : ধান ও মাছ চাষের জমি সব সময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ধান গাছে যাতে পোকামাকড়ের আক্রমণ না হয় সেজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

- ক্ষেতে কঞ্চি বা ডাল পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা;
- রাতের বেলায় ক্ষেতের পাশে বা ধান ক্ষেতের গর্তে হারিকেন জালিয়ে আলোর ফাঁদ পাতা;
- পোকা দ্বারা আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে ফেলা বা হাত দ্বারা পোকার ডিম সংগ্রহ করা;
- বিশেষ ধরনের জালের (সুইপ নেট) সাহায্যে পোকা ধরে ক্ষতিকর পোকাগুলোকে মেরে ফেলা;
- জমিতে সব সময় পরিমাণমতো পানি রাখা;
- ধান গাছ যখন আইলের চেয়ে ছোট থাকে তখন পানি সেচ দিয়ে আধ ঘণ্টার জন্য ধান গাছগুলোকে ডুবিয়ে দিলে ধানের পোকা পানিতে ভেসে উঠবে এবং মাছ সে পোকাগুলো খেয়ে ফেলতে পারবে;
- পোকার আক্রমণের তীব্রতা খুব বেশি হলে সেক্ষেত্রে ক্ষেতের পানি সেচে মাছগুলোকে গর্তে এনে হেক্টর প্রতি ২-৩ কেজি ফুরাডান, ৩ কেজি ইউরিয়া সারের সাথে মিশিয়ে ক্ষেতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ৭-৮ দিন পর কীটনাশকের বিষক্রিয়া কমে গেলে ক্ষেতে পানি ঢুকিয়ে মাছগুলোকে ধানক্ষেতে নিতে হবে।

ধানের রোগ এবং ব্যবস্থাপনা : এত সব সাবধানতা বা সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও ধান গাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে। নিচে ধানের কতিপয় রোগের নাম, রোগের লক্ষণ এবং তার ব্যবস্থাপনা কৌশল আলোচনা করা হলো।

রোগের নাম	কারণ ও লক্ষণ	ব্যবস্থাপনা
টুংরো রোগ	ভাইরাসজনিত যা সবুজ পাতা ফড়িং দ্বারা বিস্তার লাভ করে।	রোগের উৎস যেমন- ঘাস, রোগাক্রান্ত গাছ প্রভৃতি তুলে ধ্বংস করা।
পাতা মোড়া রোগ	জীবাণুজনিত যা ধানের কচি পাতা, হলদে রং ধারন করে ও আস্তে আস্তে মরে যায়।	সুষম সার প্রয়োগ, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, রোগাক্রান্ত গাছের পাতা তুলে ধ্বংস করা।
উফরা রোগ	ক্ষুদ্র কৃমি দ্বারা আক্রান্ত যা ধান গাছ থেকে রস শোষণের দরুণ পাতার গোড়ায় সাদা ছিটে ফোটা দাগ দেখা দেয়।	রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর পাতা পুড়িয়ে ফেলা, জমি আগাছামুক্ত রাখা, উন্নত বীজ ব্যবহার করা।
ব্লাস্ট	ছত্রাকজনিত রোগ, যা ধান গাছের পাতা গিট ও শিষের গোড়ায় আক্রমণ করে।	জমিতে পানি ধরে রাখা, বীজ শোধন করে ব্যবহার করা, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ প্রভৃতি।

সেচ ব্যবস্থাপনা : সাধারণত ধানের কুশি হওয়ার শেষ পর্যায়ে কাইচ থোর আসে এবং প্রায় ২৫ দিন পরে ফুল ফোটে। এ ফুল ফোটা থেকে শুরু করে ধানের দুধ হওয়া সময় পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পানি দরকার হয়। সুতরাং এ সময়ে যদি জমিতে পানির অভাব হয় তাহলে ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ফসলের ফলন কমে যেতে পারে। কাজেই ধানের ভালো ফলন পেতে হলে বাড়তি সেচের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। চারা লাগানোর পর থেকে ধান গাছের কোন অবস্থার জন্য কতটুকু পানির দরকার তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো–

ধান গাছের অবস্থা বা সময়	পানির পরিমাণ
চারা লাগানোর সময়	২-৩ সেন্টিমিটার
চারা লাগানো থেকে পরবর্তী ১০ দিন পর্যন্ত	৩-৫ ”
চারা লাগোনোর ১১ দিন পর থেকে কাইচ থোড় আসা পর্যন্ত	২-৩ ”
কাইচ থোড় আসার পর থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত	৫-১০ ”
ধান কাটার ১০ দিন পূর্বে	পানি বের করে দিতে হবে

প্রজাতি নির্বাচন : ধান ক্ষেতে খুব বেশি পানি থাকে না এবং মাছ চাষের জন্য খুব বেশি সময়ও পাওয়া যায় না। এ সব কারণে ধান ক্ষেতে সব জাতের মাছের ভালো ফলন পাওয়া যায় না। তাই কম পানিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, উচ্চ তাপমাত্রা সহ্যক্ষম, ধানক্ষেতে বিদ্যমান খাদ্য খায়, ধানের কোনো ক্ষতি করে না, স্বল্প অক্সিজেনে বাঁচতে পারে–এরূপ দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মাছ নির্বাচন করতে হবে। মিরর কার্প, কার্পিও, গিফট তেলাপিয়া, সরপুঁটি প্রভৃতি ধান ক্ষেতে চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী প্রজাতি। তবে দেশী জাতের মাছের পোনাও মজুদ করা যেতে পারে। রুই, কাতলা, মৃগেল বিশেষ করে সিলভার কার্প প্রভৃতি মাছ ধান ক্ষেতের কম গভীরতায় এবং খোলা পানিতে তেমন বাড়ে না। আবার গ্রাসকার্প দ্রুত বাড়লেও ধান গাছ খেয়ে ফেলে এজন্য গ্রাসকার্প ধানক্ষেতে চাষ করা যায় না।

পোনা মজুদ : জুলাই মাসে যখন বৃষ্টির পানি ধান ক্ষেতে জমতে শুরু করে এবং জমিতে খননকৃত নালা বা পুকুরে পর্যাপ্ত পানি থাকে তখনই মাছের পোনা মজুদের উপযুক্ত সময়। তবে ধানের জাত, পোনা প্রাপ্তি ও পানি সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে যে কোন সময়ই ধানের সাথে মাছের চাষ করা যেতে পারে। তবে পোনা ছাড়ার আগে দেখতে হবে ধানের চারা মাটিতে ভালোভাবে লেগেছে কিনা। সাধারণত চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে যখন চারা মাটিতে ভালোভাবে লেগে যাবে এবং দুই একটি কুশি ছাড়বে তখন জমিতে ৭-৮ ইঞ্চি পানি ঢুকিয়ে মাছের পোনা ছাড়া যাবে। তা না হলে মাছের চলাফেরার ফলে ধানের চারা উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পোনা ছাড়ার দুই একদিন আগে জমিতে পানি ঢুকানো ভাল, এ সময়ে মাছের জন্য কিছু খাবার তৈরি হতে পারে।

ধানের সাথে মাছচাষ বা যুগপৎ পদ্ধতিতে পোনা মজুদের হার : এ ক্ষেত্রে একক চাষে শতাংশপ্রতি পোনা মজুদের হার নিচে দেয়া হলো-

প্রজাতি	পোনার সংখ্যা
কমন কার্প অথবা	১০-১৫টি
সরপুঁটি অথবা	২০-২৫টি
গিফট তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা	২০-২৫টি

মিশ্রচাষে শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের হার নিচে দেয়া হলো–

নমুনা-১		নমুনা-২		নমুনা-৩	
প্রজাতি	সংখ্যা	প্রজাতি	সংখ্যা	প্রজাতি	সংখ্যা
কমন কার্প	৮	কমন কার্প	১০	সরপুঁটি	৮
সরপুঁটি	১২	গিফট তেলাপিয়া	১০	গিফট তেলাপিয়া ও কমন কার্প	৪ + ৮
মোট	২০		২০		২০

ধানের পরে মাছের চাষ বা পর্যায়ক্রম পদ্ধতিতে পোনা মজুদের হার : এ ক্ষেত্রে মিশ্রচাষে শতাংশপ্রতি পোনা মজুদের হার নিচে দেয়া হলো-

প্রজাতি	পোনার আকার	পোনার সংখ্যা
সিলভার কার্প	৩ -৪	৫
রুই	৩ -৪	৪
মৃগেল	৩ -৪	৩
সরপুঁটি	১ -২	১০
কমন কার্প	৩ -৪	৩
গ্রাসকার্প	৩ -৪	২
মোট		২৭

ধান ক্ষেতে দীর্ঘ সময় ধরে পানি থাকলে মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। মজুদ ঘনত্ব অধিক হলে ভালো উৎপাদনের জন্য ক্ষেতে পরিমিত খাবার ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : ধানক্ষেতে সুপারিশকৃত ঘনত্বে মাছ মজুদ করলে সম্পূরক খাদ্যের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন খাবারই (পোকামাকড়, বিভিন্ন পোকার ডিম ও শুক, কেঁচো জাতীয় পোকা, শেওলা প্রভৃতি) মাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। প্রাকৃতিক খাবারের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজন বোধে মাছের খাবার হিসেবে খৈল এবং চালের কুঁড়া ১ : ১ অনুপাতে মাছের মোট দৈহিক ওজনের ৩-৫% হারে প্রত্যেক দিন একই স্থানে, একই সাথে, দিনের একই সময়ে ধান ক্ষেতের গর্তে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

মাছ আহরণ : ধানক্ষেতে মাছ চাষের মেয়াদকাল প্রায় ৪ মাস তবে ধান কেটে নেওয়ার পরও ক্ষেতে যদি পানি থাকে অথবা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরবর্তী ফসল শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত মাছ চাষ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন বেশি হবে। তা না হলে ধান পাকার পর ক্ষেতের পানি কমিয়ে নিয়ে ধান কেটে ফেলতে হবে। ধান ক্ষেতের পানি কমে গেলে মাছ চতুর্দিকে নালা বা মধ্যবর্তী পুকুরে আশ্রয় নেবে তখন জাল দিয়ে মাছ ধরতে হবে।

মাছের ফলন : ধানক্ষেতে মাছ চাষের বেলায় মাছের বেঁচে থাকার হার প্রায় ৬০ ভাগ। যদি ধান লাগাবার ১৫ দিনের মধ্যে পোনা ছাড়া হয় এবং সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া ও খাদ্য দেয়া হয় এবং মাছ ছাড়ার অন্তত ৯০ দিন পর মাছ ধরা হয় তাহলে প্রজাতিভেদে গড়ে প্রতিটি মাছের যে ওজন হবে তা হলো।

প্রজাতি	গড় ওজন
কমন কার্প	১৬০ গ্রাম
সরপুঁটি	৮০ ”
গিফট তেলাপিয়া	৮০ ”

এ হিসেবে একক বা মিশ্র প্রজাতির মাছ চাষে হেঃ প্রতি মাছের মোট উৎপাদন ২২৫-২৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

ধানক্ষেতে পোনা মাছের চাষ : বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে ধানক্ষেতে পোনা উৎপাদন করা যেতে পারে। মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা অনুসরণপূর্বক প্রতি বিঘায় ৮০,০০০ থেকে ১,০০০০০টি বিভিন্ন প্রজাতির রেণু অথবা

৪০,০০০টি বিভিন্ন প্রজাতির ধানীপোনা বা ছোট পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পোনা মাছের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে কুঁড়া, খৈল, ভুসি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধানক্ষেতে শিং/মাগুরের চাষ : ধানক্ষেতে পোনার প্রাপ্যতা অনুযায়ী শিং অথবা মাগুরের চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ১৩০০-১৪০০টি শিং অথবা মাগুরের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত নির্দেশাবলি সঠিকভাবে পালন করলে বিঘা প্রতি বছরে ১৬৮ কেজি মাছ, ১৭৩৬ কেজি ধান এবং ৩০৭৫ কেজি খড় উৎপাদন হতে পারে বলে আশা করা যায়।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের আয়-ব্যয় : ধানের সাথে মাছচাষ করতে মাছের কারণে যে বাড়তি খরচ হয় তা পরিমাণের দিক দিয়ে তত বেশি নয়। কিন্তু মাছের কারণে যে বাড়তি লাভ হয় তা অনেক বেশি। অর্থাৎ ধানক্ষেতে মাছচাষ করে একই জমি থেকে একই সময়ে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। নিচে সারণি-১১ এ এক হেক্টর আয়তনবিশিষ্ট ধানক্ষেতে মাছ চাষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো–

সারণি-১১ ধানক্ষেতে মাছ চাষের আয় ব্যয়ের হিসেব

কাজের ধরন/প্রকৃতি	কাজের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
ক. জমি প্রস্তুতকরণ		
নালা/পুকুর খনন	১০ শ্রম দিবস	৩০০০/-
পাড় তৈরিকরণ	৫ ” ”	১৫০০/-
নির্গম নালা তৈরি	২ ” ”	৬০০/-
খ. মাটি কর্ষণ ও সার প্রয়োগ		
মাটি কর্ষণ	১০ জন শ্রমিক	৩০০০/-
সার প্রয়োগ	১ ” ”	৩০০/-
ইউরিয়া	২০০ কেজি	২৪০০/-
টিএসপি	১৫০ ”	৪৮০০/-
এমপি	৫০ ”	১৫০০/-
জিপসাম	১০০ ”	১৫০০/-
গ. ধান চাষ		
বীজ ধান	২৫ কেজি	১০০০/-
চারা উৎপাদন ব্যয়	থোক	১০০০/-
রোপণজনিত ”	১০ জন শ্রমিক	৩০০০/-
পরিচর্যা	১০ ” ”	৩০০০/-
রোগ দমন	৩ ” ”	৯০০/-
ধান কাটার ব্যয়	১৫ ” ”	৪৫০০/-
ধান মাড়ানো এবং শুকানো	৫ ” ”	১৫০০/-
ঘ. মাছচাষ		
সরপুঁটি	২৫০০টি	৫০০০/-
মিরর কার্প	২৫০০টি	১০০০০/-
সম্পূরক খাবার	থোক	৭০০০/-
খাবার প্রদান	৬ জন শ্রমিক	১৮০০/-
মাছ ধরা	৪ জন জেলে	১২০০/-

ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ

পুকুরের পাশাপাশি ধান ক্ষেতেও চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ করে ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। চিংড়ির জন্য কোনো বাড়তি খাবার না দিয়ে ধানক্ষেতে তিন চার মাসে হেক্টরপ্রতি ১০০-২০০ কেজি এবং বাড়তি খাবার দিয়ে ২৫০-৩৫০ কেজি গলদা চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

চিংড়ির চাষের আকর্ষণীয় দিকগুলো হলো -

- চিংড়ি কাঁটাবিহীন ও সুস্বাদু বলে সবার কাছে খুবই প্রিয়;
- এটি পানির তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার বিরাট তারতাম্য সহ্য করতে পারে;
- এর বৃদ্ধি খুবই দ্রুত;
- এককভাবে কিংবা অন্য কোন মাছের সাথে চাষ করা যায় ও
- দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময়েই এর পোনা পাওয়া যায়।

চাষ পদ্ধতি ঃ ধানক্ষেতে লাভজনকভাবে চাষ করার জন্য গলদা চিংড়ি সবচেয়ে ভালো। যেসব ধানী জমিতে পাঁচ-ছয় মাস বন্যার পানি থাকে সেখানে বোরো ধানের পর গলদা চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে। ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষের এ কার্যক্রম যুগপৎ পদ্ধতি বা পর্যায়ক্রম পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।

ধানের সাথে চিংড়ি চাষ ঃ বোরো ধানের সাথে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাময় স্থানগুলো কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওর এলাকাসমূহে। এসব স্থানে যেখানে জমিতে ৪-৬ মাস পানি থাকে সেসব জমিতে ধানের সঙ্গে সেচ ব্যবস্থা ছাড়াই চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে।

ধানের সাথে চিংড়ি চাষ করতে সব কাজকে চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো–

১. জমি প্রস্তুতকরণ;
২. মাটি কর্ষণ ও সার প্রয়োগ;
৩. ধানের চাষ;
৪. চিংড়ি চাষ।

উল্লেখিত কাজগুলোর মধ্যে এক হতে তিন পর্যন্ত ধানক্ষেতে মাছ চাষের অনুরূপ হবে। তবে চিংড়ির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্গম নালা তৈরি, নালা বা চোঙের মুখে তারের জাল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

চিংড়ির পোনার আকার : কমপক্ষে ৫ সে.মি.।

পোনা মজুদের হার : হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ হাজার (৪০-৬০টি প্রতি শতাংশ)

পানি ব্যবস্থা : প্রথম দিকে পানি ৪-৬ ইঞ্চি গভীর হলে চলবে এবং এ গভীরতা ধান ও চিংড়ির বৃদ্ধির সাথে বাড়াতে হবে। শেষের দিকে পানির গভীরতা ১২ ইঞ্চি হবে। আগাছা পরিষ্কার করা এবং সার প্রয়োগের জন্য ক্ষেতের পানি কমাতে হবে। তখন চিংড়িগুলোকে নালা ও গর্তের পানিতে রাখতে হবে।

খাবার প্রদান : ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষে কোন বাড়তি খাবার না দিয়েও চিংড়ি উৎপাদন হতে পারে। চিংড়ি ধান ক্ষেতের শ্যাওলা, পোকা-মাকড়, লার্ভি ও পচনশীল দ্রবাদি খেয়ে থাকে। তবু কিছু খাবার প্রয়োগ করলে

উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি ছাড়ার মাস খানেক পর থেকে দেহের ওজনের ৩-৫% হারে খৈল ও ভুসি বা কুঁড়া ১ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে একদিন অন্তর অন্তর নালা বা গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

চিংড়ি আহরণ : ধান পাকা শুরু হলে ক্ষেতের পানি ধীরে ধীরে কমাতে হবে। এতে চিংড়িগুলো নালা ও গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তখন প্রথমে ধান কেটে পরে চিংড়ি ধরতে হবে। চিংড়ি হাত দ্বারা, জাল দিয়ে ও ফাঁদ পেতে ধরা যায়। চিংড়ি বিক্রির আকারে না পৌছলে অর্থাৎ প্রতিটি অন্তত ৩৫ গ্রাম ওজনের না হলে ধান কাটার পরও চিংড়ি ক্ষেতে রেখে বড় করে নেয়া যেতে পারে।

চিংড়ির ফলন : বোরো ধানক্ষেতে (হাওর এলাকায়) চিংড়ি চাষ করলে বাড়তি খাবর ছাড়াই এর উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ২০০ কেজি। খাবার দিলে উৎপাদন ৩৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমন ধান ক্ষেতে বাড়তি খাবার ছাড়া চিংড়ির উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ১০০-১৫০ কেজি হয়। খাবার দিলে উৎপাদন ২০০-৩০০ কেজি হতে পারে।

সাবধানতা

- ধানক্ষেতের পানি যেন শুকিয়ে না যায়, কিংবা এত কমে না যায় যে পানি বেশ গরম হয়ে ওঠে। উভয় অবস্থাতেই চিংড়ি মারা যেতে পারে;
- অতি বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে যেন পানি জমে আইল উপচে না যায়। পানি উপচে পড়লে পানির সাথে চিংড়ির বের হয়ে যাবে;
- পানি নির্গমণ পথে যেন তারের জাল বা বাঁশের বানা দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। অন্যথায় চিংড়ি পানির সাথে চলে যেতে পারে;
- ক্ষেতের পানি কমে গেলে সাপ, বড় ব্যাঙ, ইঁদুর, শিয়াল ইত্যাদি প্রাণী চিংড়িকে খেয়ে ফেলতে পারে ও
- চিংড়ি অধিক অক্সিজেন সংবেদনশীল। তাই সব সময় খেয়াল রাখতে হবে খড়কুটা বা অব্যবহৃত খাদ্য পচে যেন অক্সিজেন কমে না যায়।

পর্যায়ক্রম পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ : পর্যায়ক্রম চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাযুক্ত স্থানগুলো হলো বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার নিচু বাইদ জমিগুলো। এসব জমি সচরাচর উঁচু আইল কিংবা জমি দ্বারা বেষ্টিত এবং বোরো ধান কাটার পর পতিত অবস্থায় থাকে। এরূপ সুবিধাপন্ন অন্যান্য এলাকাতেও পর্যাক্রমে ধান ও চিংড়ি চাষ করা যাবে। এ ধরনের চাষে চিংড়িকে এককভাবে অথবা অন্যান্য মাছের সাথে মিশ্রচাষরূপে উৎপাদন করা যেতে পারে। ধানের পরে চিংড়ির চাষ করতে সব কাজকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়, এগুলো হলো-

১. জমি প্রস্তুতকরণ;
২. ধানের চাষ এবং
৩. চিংড়ি চাষ।

উল্লেখিত কাজগুলোর মধ্যে জমি প্রস্তুতকরণ এবং ধানের চাষ দু'টি বিষয় ধানক্ষেতে মাছ চাষের প্রায় অনুরূপ হবে। এক্ষেত্রে যেহেতু জমিতে প্রচুর পানি থাকে সেহেতু জমিতে গর্ত খননের প্রয়োজন নেই। তবে চিংড়ি ধরার সুবিধার জন্য জমির নিচু স্থানে গর্ত রাখলে ভালো হয়। ধান কাটার সময় ধান এমনভাবে কাটতে হবে যাতে ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণ ধান গাছের গোড়া বা নাড়া থেকে যায়। এগুলো পরে পচে গিয়ে চিংড়ির খাবার তৈরি হবে।

পোনার আকার : চিংড়ি … … … … ২ ইঞ্চি।

রুই জাতীয় পোনা … ৩-৪ ইঞ্চি।

প্রতি শতাংশে পোনা মজুদের হার : চিংড়ি … … … … …৬০-৭২টি।

সরপুঁটি … …… … …৮টি

রুই … … … … … ২টি

পর্যাক্রম পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ : পর্যাক্রম পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পরিচর্যার ধরন যুগপৎ পদ্ধতির ন্যায়।

চিংড়ির ফলন : এ পদ্ধতিতে এককভাবে গলদা চিংড়ির চাষ করলে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৪০০ কেজি চিংড়ি পাওয়া যাবে। মিশ্রচাষে প্রতি হেক্টর ১৫০-২০০ কেজি চিংড়ি এবং ৪০০-৫০০ কেজি মাছ পাওয়া যেতে পারে।

অনুশীলনী-১১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছের সাথে একই সময়ে একাধিক অন্যান্য ফসল উৎপাদন পদ্ধতিকে কী বলা হয়?
২. ধানক্ষেতে মাছচাষ করলে ধানের ফলন কী পরিমাণ বাড়ে?
৩. ধানক্ষেতে মাছের জন্য কী পরিমাণ জায়গায় গর্ত করা দরকার?
৪. ধানক্ষেতে চাষ উপযোগী দুইটি মাছের প্রজাতির নাম লেখ?
৫. ধানক্ষেতে চাষের জন্য প্রতি শতাংশে কতটি তেলাপিয়াা মজুদ করা যায়?
৬. ধানের চারা রোপণের কত দিন পরে মাছের পোনা ছাড়া যায়?
৭. আলোর ফাঁদ কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমন্বিত মৎস্য চাষের সুবিধাগুলো কী কী?

২. ধানক্ষেতে মাছ চাষের তিনটি সুবিধা লেখ।

৩. ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষের সুবিধা লেখ।

৪. ধানক্ষেতে মাছ চাষের জন্য গর্ত ও নালা তৈরি করার নিয়ম বর্ণনা কর।

৫. পর্যায়ক্রমে ধান ও মাছ চাষের জন্য পোনা মজুদের ঘনত্ব বর্ণনা কর।

৬. ধানক্ষেতে মাছ চাষের সময় ধানের পোকা-মাকড় কীভাবে দমন করা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধানক্ষেতে মাছ চাষে জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতির বিবরণ দাও।

২. ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩. ধানক্ষেতে মাছচাষ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

চাষযোগ্য মাছের সাধারণ রোগ, রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

জীবমাত্রই মরণশীল। মাছ এর বাইরে নয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগের কারণে অস্বাভাবিকভাবে ব্যাপক হারে মাছের মৃত্যু ঘটে। তাই রোগ প্রতিকার বা প্রতিরোধকল্পে রোগ কী, কেন মাছ রোগাক্রান্ত হয়, রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ, রোগ নিরাময়ের উপায় বা প্রতিরোধে করণীয় কী, ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে চাষযোগ্য মাছের সাধারণ রোগ, রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

রোগ কী : রোগ হলো দেহ ও মনের অস্বাভাবিক অবস্থা, যা বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ, চিহ্ন বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন- ক্ষতরোগ হলে মাছের গায়ে লাল দাগ ও ক্ষত দেখা যায়। পরবর্তীতে এ দাগে পচন ধরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। আবার আরগুলোসিস বা মাছের উকুনজনিত রোগ হলে মাছ অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করে। অনেক সময় পরজীবীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মাছ শক্ত কোন কিছুর সঙ্গে গা ঘষতে থাকে, ইত্যাদি। উল্লেখিত লক্ষণসমূহ দেখে বুঝা যায় মাছ রোগাক্রান্ত হয়েছে।

কেন মাছ রোগাক্রান্ত হয় : রোগ সৃষ্টির জন্য ৩টি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক দায়ী। এগুলো হলো- রোগজীবাণু, রোগজীবাণুর জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং পোষক। পোষক, রোগজীবাণু এবং পরিবেশ যখন সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে তখন রোগ সৃষ্টি হয় না। অথচ এগুলোর মধ্যে যখন ভারসাম্য নষ্ট হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার অবনতি ঘটে তখনই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও রোগজীবাণুর সংখ্যাধিক্য ঘটে। এরূপ অবস্থায় রোগজীবাণু মাছের দেহে আশ্রয় নেয় এবং সুযোগ পেলেই মাছকে আক্রমণ করে, তখন মাছ রোগাক্রান্ত হয়। রোগজীবাণুর মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, আক্রমণের তীব্রতা ততই বাড়তে থাকে।

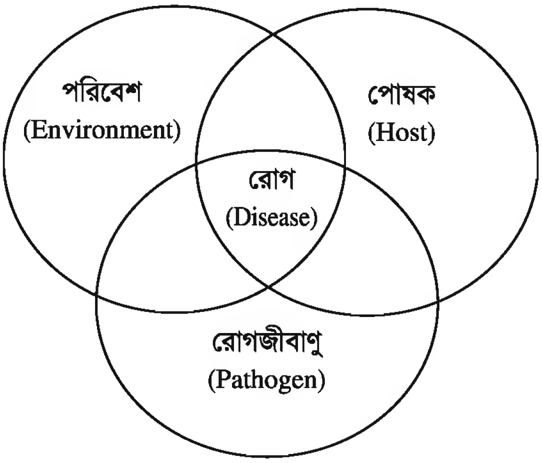

চিত্র-৪১ ঃ পোষক, পরিবেশ ও রোগজীবাণুর মধ্যে আন্তঃ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

মাছে রোগ সৃষ্টির কারণসমূহ ঃ মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

- অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করা;
- পর্যাপ্ত পরিমাণ সুষম খাদ্যের অভাব;

- বসবাসরত পরিবেশ দূষিত হওয়া;
- পরিবহনের সময় পোনার ওপর পরিবহনজনিত চাপ পড়া, পোনা দুর্বল হওয়া বা পোনা আহত হওয়া;
- বিভিন্ন বয়সের পোনা একসাথে মজুদ করা;
- চাষকৃত পুকুরে বাজে মাছ বা জলজ আগাছা থাকা ও
- অক্সিজেন, পিএইচ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, তাপমাত্রা, ক্ষারত্ব প্রভৃতি সর্বানুকূল অবস্থায় বিদ্যমান না থাকা ইত্যাদি।

মাছকে রোগমুক্ত রাখার উপায়সমূহ ঃ চাষকৃত মাছকে রোগমুক্ত রাখতে হলে অবশ্যই নিম্নোক্ত নির্দেশাবলি সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

- জলজ পরিবেশের বিভিন্ন গুণাবলি, যেমন- দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, তাপমাত্রা, মোট ক্ষারত্ব প্রভৃতি মাছচাষের অনুকূলে রাখা;
- সঠিক মজুদ ঘনত্ব বজায় রাখা তথা চাষকৃত মাছের প্রজাতি, বয়স, পুকুরের ভৌত-রাসায়নিক অবস্থা, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন, খাদ্যের মান প্রভৃতি বিবেচনা করে পোনা মজুদ করা;
- পোনা পরিবহনের সময় পোনা যেন কোনো আঘাত বা চাপের সম্মুখীন না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে পোনা শোধন করে পরে পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির সমতা আনয়ন করে পুকুরে পোনা মজুদ করা;
- বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথকভাবে লালন পালন করা, কারণ সব বয়সের মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এক নয়। আবার মাছ যেহেতু দলবদ্ধভাবে বসবাস করে তাই মাছের ক্ষেত্রে এক মাছ রোগাক্রান্ত হলে, অন্য মাছও সংক্রমিত হতে পারে। সম্ভব হলে বিভিন্ন বয়সের মাছ অবশ্যই আলাদাভাবে চাষ করতে হবে। কোন ক্রমেই ব্রুড মাছের পুকুরে ছোট পোনা রাখা যাবে না;
- মাছের বসবাসরত পরিবেশের উন্নয়ন সাধনকল্পে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে পুকুরকে জীবাণুমুক্ত করে মাছকে রোগমুক্ত রাখা যেতে পারে;
- প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুষম সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা;
- রোগাক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত উপকরণাদি (জাল, পরিবহন পাত্র ইত্যাদি) প্রয়োজন হলে জীবাণুমুক্ত করে পরে তা অন্য পুকুরে ব্যবহার করা;
- মৃত বা মৃতপ্রায় রোগাক্রান্ত মাছকে পুকুর হতে অপসারণ করা;
- সম্ভব হলে প্রতি বছর বা ২/৩ বছর পর পর পুকুর শুকিয়ে তলার অতিরিক্ত পঁচা কাদা তুলে ফেলা;
- মাঝে মাঝে হড়রা টেনে বা জিয়োলাইট প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত দূষিত গ্যাস দূর করা;
- পুকুরে পানি পরিবর্তন করে বা আংশিক কমিয়ে ফেলে নতুন পানি সরবরাহ করা;
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা;
- বাইরে থেকে নোংরা পানি ঢুকতে না দেয়া;
- রোগজীবাণু ও পরজীবীমুক্ত মাছ প্রজননের জন্য নির্বাচন করা;
- পুকুরে পাখি বসতে না পারে সেজন্য বাঁশ বা ডালজাতীয় কোন অবলম্বন না রাখা। তবে অনেকক্ষেত্রে ডালে জন্মানো শ্যাওলা রুই জাতীয় মাছের প্রিয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- সম্ভব হলে পুকুরে গবাদি পশু গোসল এবং রোগাক্রান্ত মাছ ধোয়া থেকে বিরত থাকা।

উল্লিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করে সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করে পুকুরের চাষকৃত মাছকে রোগমুক্ত রাখা যেতে পারে।

মাছের রোগমুক্তির জন্য সাবধানতা অবলম্বন করার পরেও অনেক সময় দেখা যায় মাছ রোগাক্রান্ত হয়েছে। তখন রোগাক্রান্ত মাছের চিকিৎসা প্রয়োজন। তবে চিকিৎসা শুরুর পূর্বে রোগাক্রান্ত ও সুস্থ মাছের কী ধরনের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান তা নির্ণয় করতে হবে। নিচে রোগাক্রান্ত ও সুস্থ মাছের সাধারণ কিছু লক্ষণ উল্লেখ করা হলো।

সুস্থ ও রোগাক্রান্ত মাছের সাধারণ লক্ষণসমূহ ঃ মাছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসঙ্গতি বা বিকৃতি এবং শারীরবৃত্তীয় বিঘ্নতা বা জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সুস্থ মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ রোগাক্রান্ত মাছের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি রোগাক্রান্ত মাছ চিনতে হলে প্রথমে একটি সুস্থ মাছের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা থাকতে হবে।

সুস্থ মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- মাছের বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক থাকবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে মাছ কাঙ্ক্ষিত আকার ও ওজন অর্জন করবে;
- বিভিন্ন অঙ্গের আকারগত অনুপাত ঠিক থাকবে। যেমন- দেহের তুলনায় মাথা মানানসই দেখাবে; লম্বার তুলনায় প্রশস্ততা যথাযথ থাকবে;
- ত্বক বা আঁইশের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকবে;
- দেহের কোন অংশে ঘা, ক্ষত বা রক্তক্ষরণ থাকবে না;
- পাখনা দুমড়ানো বা পাখনা ও ফুলকায় পচন দেখা যাবে না;
- দেহের কোথাও কোন পরজীবী থাকবে না;
- মাছ স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং স্বাভাবিক আচরণ দেখাবে;
- মাছ পানির উপর ভেসে বা পাড়ের কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না ও
- ভয় পেলে মাছ দ্রুত পানির নিচে চলে যাবে।

রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ : একটি রোগাক্রান্ত মাছে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণ সমূহকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ক. আচরণগত অসঙ্গতি ও
খ. শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ।

ক. আচরণগত অসঙ্গতি : বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মাছ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আচরণগত অসঙ্গতি প্রকাশ করে । যেমন-

- মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। এমনকি সম্পূরক খাদ্য গ্রহণেও অনীহা দেখায়;
- শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে;
- পানির উপর অলসভাবে ভেসে থাকে;
- দ্রুত গতিতে ও অস্থিরভাবে সাঁতার কাটে ও
- মাছ পুকুরে অবস্থিত শক্ত কোন কিছুতে গা ঘষতে থাকে।

খ. শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ : রোগাক্রান্ত মাছে নিম্নলিখিত শারীরবৃত্তীয় লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যেমন-

- দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখাতে পারে;
- মাছের দেহ হতে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থ (Mucus) নির্গত হতে পারে;

- প্রয়োজনীয় মিউকাসের অভাবে মাছের দেহ খসখসে হতে পারে;
- মাছ তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে;
- আঁইশ, ত্বক বা পাখনায় এবং ফুলকায় ক্ষত বা পচন দেখা দেয়;
- আঁইশ ফুলে উঠে বা খসে পড়ে;
- আঁইশের গোড়া, ত্বক, পায়ুপথ, ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়;
- মাছের ত্বক বা পাখনায় বিন্দুর মতো সাদা দাগ দেখা দেয়;
- মাছের দেহে, পাখনায়, ফুলকায় পরজীবী বা সিষ্ট পরিলক্ষিত হয়;
- মাছের দেহে সূক্ষ্ম সূতার মত বস্তু দেখা দেয়;
- মাছের দেহ গহ্বরে ঘোলাটে, সাদা বা পরিষ্কার তরল জমা হয়;
- পায়ুপথ বা ফুলকায় প্রদাহ হয়;
- ফুলকার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাকাশে বা রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে;
- মাছের চোখ অক্ষিকোঠর থেকে বেরিয়ে আসে;
- পরিশেষে হঠাৎ ব্যাপক হারে মাছে মড়ক দেখা দেয়।

বাহ্যিক লক্ষণ দেখে মাছের রোগ নির্ণয় : বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মাছ বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে। এসব লক্ষণ দেখে মাছ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। লক্ষণ দেখে কীভাবে মাছের রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি রোগের মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে নিচে তার জন্য অনুসরণীয় পদক্ষেপসমূহ দেয়া হলো।

১. পুকুর পর্যবেক্ষণ;
২. আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং
৩. মাছের দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

১. পুকুর পর্যবেক্ষণ : পুকুর পর্যবেক্ষণকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. পানির গুণাবলি পরীক্ষা ঃ এ ক্ষেত্রে পানির বিভিন্ন গুণাবলি, যেমন- দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা, মোট ক্ষারত্ব প্রভৃতি মাছচাষের অনুকূলে আছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

খ. মাছের মৃত্যুর প্রকৃতি যাচাই : মাছের রোগ মড়ক হিসেবে দেখা দিলে বিশেষ কোনো প্রজাতির মাছ মারা যাচ্ছে, নাকি সব প্রজাতির মাছই মারা যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয় পরিবীক্ষণ করা উচিত। সাধারণত পরিবেশগত পীড়নে এবং ভাইরাসজনিত রোগে মাছের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

গ. পুকুরের ইতিহাস পর্যালোচনা : কীভাবে পুকুর সৃষ্টি হয়েছে বা কী কারণে পুকুর কাটা হয়েছে, পুকুরের বয়স কত? সারা বছর পুকুরে পানি থাকে না বছরের কয়েক মাস পানি থাকে, পুকুর শুকানো হয়েছিল কি না? পুকুরের তলদেশে কাদার অবস্থা কেমন? ইত্যাদি বিষয় পুকুরে বিদ্যমান প্রাণী ও অণুজীব সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা মাছের রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করে।

ঘ. উৎপাদন উপকরণ যাচাই করা : পানি, পোনা, খাদ্য প্রভৃতির উৎস, খাদ্য গুদামজাতকরণের অবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় মাছের রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ : সাধারণত মাছের ত্বক, ফুলকা, অন্ত্র, চোখ ইত্যাদির আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। মৃত মাছের চেয়ে জীবিত মাছ পর্যবেক্ষণ অধিকতর কার্যকর ফল দেয়। আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগজীবাণু শনাক্তকরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

৩. মাছের দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ : এক্ষেত্রে মাছের আচরণ এবং বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসঙ্গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেমন-

- নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাছ প্রত্যাশিত আকার এবং ওজন অর্জন করেছে কি না?
- মাছের বিভিন্ন অঙ্গের আকারগত অনুপাত, যেমন- মাথার তুলনায় দেহ স্বাভাবিক কি না? দেহের তুলনায় মাথা বড় দেখাচ্ছে কি না?
- মাছের কোন অঙ্গ, যেমন- লেজ, পাখনা, আঁইশ, ফুলকা ইত্যাদির কোন বিকৃতি দেখা যায় কি না?
- মাছের দেহের কোন একটি বিশেষ অঙ্গে ঘা, ক্ষত বা পচন দেখা দিয়েছে কি না? দেখা দিলে তার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি কীরূপ?
- মাছ স্বাভাবিক মাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করছে, না কী খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা মন্থরতা প্রদর্শন করছে?
- মানুষের উপস্থিতিতে মাছ দ্রুত পানির নিচে চলে যায় কি না?
- মাছের স্বাভাবিক বর্ণ ফ্যাকাশে দেখায় কি না?
- মাছ অস্বাভাবিক আচরণ, যেমন- দ্রুত সাঁতার কাটা, একাকী থাকা, শক্ত কোনো কিছুতে গা ঘষা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে কি না এসব আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাছের স্বাভাবিক আচরণ ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তুলনা করে মাছ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করা যায়। মাছ সাধারণত নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমন-

১. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
২. ছত্রাকজনিত রোগ
৩. ভাইরাসজনিত রোগ
৪. পরজীবীঘটিত রোগ
৫. পুষ্টিজনিত রোগ
৬. ক্ষতরোগ

১. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

মাছচাষের পুকুরে সাধারণত যেসব রোগ দেখা যায় তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগই প্রধান। নিচে কতিপয় ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম, রোগের কারণ ও বিস্তার, আক্রান্ত প্রজাতি ও লক্ষণসমূহ, রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে করণীয় কাজের দিক নির্দেশনা দেয়া হলো।

ক. লেজ ও পাখনা পচা রোগ (Tail and Finrot Disease) বা কলামনারিস রোগ

রোগের কারণ : ফ্লেক্সিব্যাক্টার কলামনারিস (Flexibacter Columnaris) বা ফ্লেভোব্যাকটেরিয়াম কলামনারি (Flavobacterium Columnare) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার : পরিবেশগত বিভিন্ন পীড়ন, যেমন- পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে, তলদেশে পচা জৈব পদার্থ জমা হলে বিশেষ করে তাপমাত্রার অধিক বৃদ্ধিতে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : রুইজাতীয় মাছ, শিং, মাগুর, ইত্যাদি। তবে সম্প্রতি পাঙ্গাশ মাছও এ রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- রুইজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে পাখনার গোড়া থেকে ক্ষত শুরু হয় এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে;

- লেজ ও পাখনার পর্দা ছিঁড়ে পাখনার প্রতিটি কাঁটা আলাদা হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়;
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়, কোনো কোনো সময় পাখনার কাঁটার গোড়ায় রক্ত জমে যায় ফলে পরবর্তীতে সেখানে ঘা হয়;
- দেহের ভারসাম্য হারায় ও খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়;
- এটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৫০-৭০% মাছ মারা যেতে পারে।

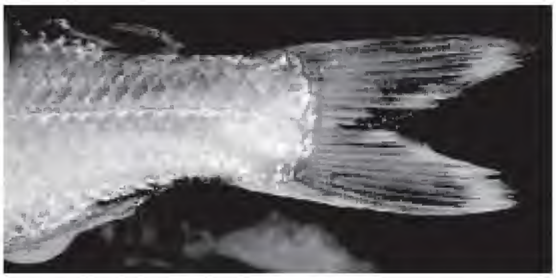

চিত্র-৪২ লেজ ও পাখনা পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

চিকিৎসা

- বড় মাছের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি মাছের দৈহিক ওজনের জন্য ১৫ মিলিগ্রাম হারে জেন্টামাইসিন ইনজেকশান সপ্তাহে ১ দিন মোট ৩ সপ্তাহে ৩টি ইনজেকশন মাংসপেশিতে দিলে মাছ দ্রুত ভালো হয়ে যায়।
- মাছ যদি ছোট হয় তাহলে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৫০ মিলিগ্রাম জেন্টামাইসিন এন্টিবায়োটিক পাউডার মিশিয়ে মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে। অথবা
- প্রতি কেজি মাছের জন্য ০.২৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন পাউডার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে। অথবা
- প্রতি কেজি মাছের জন্য ০.২৫ গ্রাম সালফাডায়াজিন পাউডার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে। অথবা
- ১ লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে গুলে নিয়ে উক্ত দ্রবণে মাছকে ১ মিনিট গোসল করিয়ে পরে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে ১৫ দিন পর পর ৩ বার দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- এ অবস্থায় পুকুরে সার ও কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত পচনশীল জৈব পদার্থ থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে।
- রোগের তীব্রতা বেশি হলে পানি বদলানো অত্যাবশ্যক।

খ. ব্যাকটেরিয়াজনিত ফুলকা পচা রোগ

রোগের কারণ : মিক্সোকক্কাস পিসিকলাস (Mixococcus Piscicolus) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এ রোগ দেখা দেয়।

রোগের বিস্তার : সাধারণত গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ২৮ ডিগ্রী থেকে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে গেলে এ রোগ সাধারণত হয় না। তবে ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এ উঠলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। জলজ পরিবেশের অবনতিশীল অবস্থা, যথা-অক্সিজেন স্বল্পতা, অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি, খাদ্যাভাব, তলদেশে ক্ষতিকর জৈব পদার্থ জমা হওয়া এবং মাছের অধিক ঘনত্ব এ রোগের সহায়ক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি সংক্রামক রোগ, কোনো পুকুরে এ রোগ দেখা দিলে ৩-৭ দিনের মধ্যে প্রায় ৬০-৭০% মাছ মারা যেতে পারে।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : দেশী কার্পজাতীয় মাছ, গ্রাসকার্প এবং কমন কার্পের আঙ্গুলে পোনায় এ রোগ বেশি দেখা দেয়। গ্রাসকার্পের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- এ রোগে আক্রান্ত মাছের ফুলকা ফুলে যায় এবং ফুলকা থেকে অতিরিক্ত মিউকাস নিঃসৃত হয়;
- মাছের ফুলকাগুলো একত্রে জমাট বেঁধে যায় এবং পরে পচে যায়। ফলে মাছের শ্বাসকষ্ট হয়;
- ফুলকা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়।

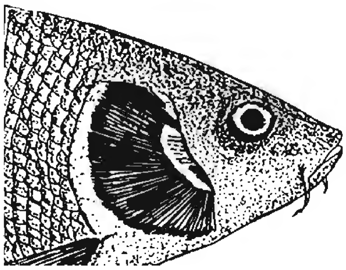

চিত্র-৪৩ ফুলকা পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

চিকিৎসা

- স্বাভাবিক গভীরতা বিশিষ্ট পুকুরে শতাংশপ্রতি ১ কেজি চুন ২ বারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ১ লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ৫ মিনিট গোসল করিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। অথবা
- ১ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে মিশ্রিত দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সহ্য করার মত সময় (৫ মিনিট) গোসল করিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয় : লেজ ও পাখনা পচা রোগের ক্ষেত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

গ. সেপটিসেমিক রোগ

রোগের কারণ : সাধারণত এরোমোনাস হাইড্রোফিলা (Aeromonas hydrophila) ও সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স (Pseudomonas fluorescens) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মাছে সেপটিসেমিক রোগ হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার : পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার দরুন অথবা অন্য কোনো কারণে মাছ চাপের মধ্যে থাকলে এ রোগের আক্রমণের আশংকা থাকে। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই কম-বেশি এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : কার্প ও ক্যাট ফিশ-সহ প্রায় সব ধরনের মাছই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে সিলভার কার্প মাছ এ রোগে ব্যাপকভাবে মারা যায়। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে যখন তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় বিশেষ করে কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড রোদ হচ্ছে ঠিক তখনই এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

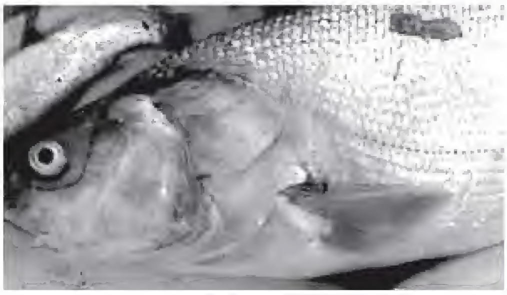

চিত্র-৪৪ : সেপটিসেমিক রোগে আক্রান্ত সিলভার কার্প

- ত্বকের বিভিন্ন স্থানে ও পাখনার গোড়ায় রক্তক্ষরণ ঘটে;
- কখনও কখনও দেহের বিভিন্ন স্থানে ঘা বা ক্ষত দেখা দিতে পারে;
- পায়ুপথে রক্ত জমাট বেঁধে যায়;
- প্লীহা ও বৃক্ক আকারে বড় হয়ে যায়;
- দেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গে (বৃক্ক, প্লীহা; অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি) রক্তক্ষরণ হয় এবং ধীরে ধীরে এসব অঙ্গ পচে যায়;
- মৃত বা মৃতপ্রায় মাছকে পানি থেকে উঠালে পায়ুপথ দিয়ে রক্তের ন্যায় তরল পদার্থ বের হয়ে আসে,
- মাছের গায়ে ঘন সাদাটে তীব্র অম্লীয় গন্ধযুক্ত প্রচুর মিউকাস দেখা যায়,
- মাছের ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। অর্থাৎ মাছ কোন কিছু খেতে চায় না। ফলে মাছের গায়ের মাংস কমে যায়। মাছ দেখতে লম্বাটে মনে হয়;
- মাছের আঁইশ উঠে যায় ফলে সে স্থানে সাদাটে ঘায়ের মত দেখা যায়,
- আক্রান্ত মাছের কানকো এবং বিভিন্ন পাখনার গোড়ায় রক্ত জমে লাল হয়ে যায় এবং ফুলকা ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করে;
- চোখে রক্ত জমে লাল হয়ে যায় এবং ফুলে মনে হয় যেন অক্ষিকোঠর থেকে বের হয়ে আসছে;
- সিলভার কার্প মাছে এ সমস্যা দেখা যায় তবে একই সঙ্গে চাষকৃত অন্য প্রজাতির মাছে দেখা যায় না।

চিকিৎসা

- প্রতি কেজি মাছের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন পাউডার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে। অথবা
- বড় মাছের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি মাছের দৈহিক ওজনের জন্য ১০০ মিলিগ্রাম হারে টেরামাইসিন ইনজেকশান সপ্তাহে ১টি করে ৩ সপ্তাহে ৩টি ইনজেকশান মাংসপেশীতে দিলে মাছ ভাল হয়ে যায়।
- প্রতি কেজি মাছের জন্য ০.২৫ গ্রাম সালফাডায়াজিন পাউডার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয় : লেজ ও পাখনা পচা রোগের ক্ষেত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ঘ. এডওয়ার্ডসিলোসিস রোগ

রোগের কারণ : সাধারণত এডওয়ার্ডসিয়েলা (Edwardsiella sp.) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগটি বিস্তার লাভ করে।

রোগের বিস্তার : পচা জৈবিক পদার্থসমৃদ্ধ পুকুরে এ জীবাণু সহজেই বংশবিস্তার এবং রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : সাধারণত ক্যাট ফিশ, যেমন- শিং, মাগুর, পাংগাস ইত্যাদি মাছে এ রোগ বেশি দেখা যায়। অনেক সময় তেলাপিয়া মাছেও এ রোগ হয়ে থাকে।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- প্রথমে মাছের ত্বকে ছোট ক্ষত দেখা দেয়। এ ক্ষত দ্রুত মাংশপেশীতে ছড়িয়ে পড়ে;
- আক্রান্ত স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং শেষ পর্যায়ে উক্ত স্থানে পচন ধরে;
- আক্রান্ত স্থান থেকে দুর্গন্ধ বের হয়;
- আক্রান্ত মাছের বৃক্ক ও যকৃৎ পচে যায় বা কখনো কখনো যকৃতে পুঁজ জমতে দেখা যায়।

চিত্র-৪৫ : এডওয়ার্ডসিলোসিস রোগে আক্রান্ত পাঙ্গাশ মাছ

চিকিৎসা

- প্রতি কেজি মাছের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ৭ দিন প্রয়োগ করতে হবে। অথবা
- প্রতি কেজি মাছের জন্য ১২৫ মিলিগ্রাম সালফারজাতীয় ওষুধ (যেমন-কট্রিম) খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ৭ দিন মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয় : জলাশয়ের পানির গুণাগুণের প্রতি যত্নবান হলে এবং সঠিক ঘনত্বে মাছ চাষ করলে এ রোগ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ঙ. পেটফোলা বা ড্রপসি (Dropsy) রোগ

রোগের কারণ : ভিব্রিও এনকুইলেরাম (Vibrio anquilarum) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার : গরমকালে এ রোগ বেশি হয়। তবে সাধারণত এ রোগে ব্যাপক হারে মাছ মারা যায় না।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- দেহের অভ্যন্তরে তরল পদার্থ জমে পেট ফুলে বেলুনের মতো হয়ে যায়;
- কখনও কখনও স্ফীত উদর ও পায়ুর উপর লাল দাগ দেখা যায়;
- মাছের প্লীহা ও বৃক্ক বড় হয়ে যায় এবং এ সব অঙ্গে পানি জমা হয়;
- পায়ু ফুলে উঠে এবং লাল বর্ণের হয়;

- হালকা চাপ প্রয়োগে কখনো কখনো পায়ু থেকে হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়, চোখ ঠেলে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়;
- মাছ ভারসাম্যহীনভাবে চলাচল করে এবং পানির উপর ভেসে থাকে;
- ফুলকা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং আক্রান্ত মাছ ধীরে ধীরে মারা যায়।

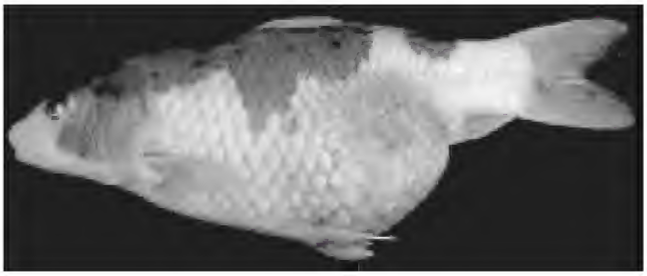

চিত্র-৪৬ : ড্রপসি রোগে আক্রান্ত গোল্ডফিশ

চিকিৎসা

- প্রতি কেজি মাছের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ৭ দিন প্রয়োগ করতে হবে, অথবা
- প্রতি কেজি মাছের জন্য ০.২৫ গ্রাম সালফাডায়াজিন পাউডার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ৭ দিন প্রয়োগ করতে হবে।
- ব্রুড মাছের ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জের সাহায্যে মাছের পেটে জমাকৃত তরল পদার্থ বের করে পরে প্রতি কেজি মাছের দৈহিক ওজনের জন্য ১০০ মিলিগ্রাম হারে জেন্টামাইসিন ইনজেকশান সপ্তাহে ১ দিন মোট ৩ সপ্তাহে ৩টি ইনজেকশান মাংসপেশিতে দিলে মাছ দ্রুত ভালো হয়ে যায়।
- আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতাংশ জলায়তনে প্রতি ফুট গভীরতার জন্য ১২ গ্রাম হারে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- মাছকে সুষম খাদ্য সরবরাহ বা খাবারের সাথে ফিশমিল ব্যবহার করা যেতে পারে;
- প্রাকৃতিক খাবার হিসাবে প্ল্যাংকটনের স্বাভাবিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে;
- পানির গুণাগুণ সঠিকভাবে রাখতে হবে ও
- পুকুরের তলদেশে কোন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস জমতে দেয়া যাবে না।

২. ছত্রাকজনিত রোগ

মিঠা পানির প্রায় সব মাছই ছত্রাকজনিত রোগের প্রতি সংবেদনশীল। মোল্ডজাতীয় ছত্রাক এ ধরনের সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। ছত্রাক মাছের রোগ সৃষ্টিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবীর আক্রমণে মাছের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পরে ক্ষতস্থানে ছত্রাকের সংক্রমণে রোগ সৃষ্টি হয়। ত্বকের রোগকে

ডারমাটোমাইকোসিস (Dermatomycosis) এবং ফুলকায় হলে ফুলকা পচা রোগ যথাক্রমে ব্রাঙ্কিওমাইকোসিস এবং স্যাপ্রোলেগনিয়াসিস হিসেবে পরিচিত।

ক. ব্রাঙ্কিওমাইকোসিস (Branchiomycosis) বা ফুলকা পচা রোগ
খ. স্যাপরোলেগনিয়াসিস (Saprolegniasis) বা ছত্রাক রোগ
ক. ব্রাঙ্কিওমাইকোসিস বা ফুলকা পচা রোগ

রোগের কারণ : ব্রাঙ্কিওমাইকোসিস গণের ২টি ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। যথা- ব্রাঙ্কিওমাইসেস সেঙ্গোইনিস (Branchiomyces sanguinis) এবং ব্রাঙ্কিওমাইসেস ডিমিগ্রান্স (Branchiomyces demigrans) ।

রোগের বিস্তার : গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে এবং পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন উৎপাদিত হলে এ রোগের সংক্রমণ বেশি ঘটে থাকে। মাছের অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব এ রোগের একটি অন্যতম সহায়ক কারণ।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : কার্পজাতীয় মাছের প্রায় সব প্রজাতিই এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। আবার কোনো কোনো প্রজাতির ক্যাট ফিশেও এ রোগের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ১ বছরের বেশি বয়সের কার্পজাতীয় মাছে এ রোগের সংক্রমণের মাত্রা বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- ফুলকা স্বাভাবিক রং এবং ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে;
- সংক্রমণের শুরুতে ফুলকা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং পরে ফুলকায় গাঢ় লাল বর্ণের দাগ দেখা যায়;
- আক্রান্ত ফুলকা ধীরে ধীরে হলদে-বাদামি বর্ণ ধারণ করে;
- ফুলকায় পচন ধরে এবং ফুলকারশ্মি খসে পড়ে ও
- পরিশেষে মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

খ. স্যাপরোলেগনিয়াসিস বা ছত্রাক রোগ

রোগের কারণ : এ রোগ প্রধানত স্যাপরোলেগনিয়াসিস গণের ৩টি প্রজাতির সংক্রমণে ঘটে থাকে। যথা- স্যাপরোলেগনিয়া ফেরাক্স (Saprolegnia ferax), স্যাপরোলেগনিয়া প্যারাসাইটিকা (S. parasitica) এবং স্যাপরোলেগনিয়া ডিকলিনা (S. diclina)।

রোগের বিস্তার : এ রোগ সারা বছরব্যাপী সব প্রজাতির এবং সব বয়সের মাছেই দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পরিবেশগত পীড়নে অথবা ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবীর সংক্রমণে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : কার্পজাতীয় মাছের সব প্রজাতির ক্ষেত্রেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ব্রুড মাছ প্রজননের পর সাধারণত এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। মাছের ডিম এবং রেণুর এটি একটি প্রধান রোগ। বিশেষ করে চাইনিজ কার্পের পোনা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- মাছের দেহে বা ডিমে মিহি সুতার মতো উজ্জ্বল বস্তু দেখা দেয়। আবার কখনও কখনও আক্রান্ত মাছের মুখে, ঠোঁটে, পাখনায়, লেজে বা ক্ষতস্থানে তুলার ন্যায় সাদা ছত্রাক খালি চোখেই দেখা যায়;
- মাছের দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের উপস্থিতি দেখা দেয়;
- সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাছের আক্রান্ত অংশে পচন ধরে।

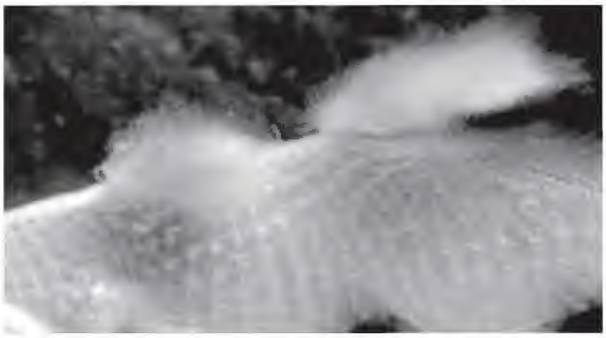

চিত্র-৪৭ : ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত মাছ

চিকিৎসা

- ১ লিটার পানিতে ২ মিলিগ্রাম ম্যালাকাইট গ্রিন যোগ করে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে ১ বার করে মোট ৩ বার সহ্য করার মতো সময় রেখে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। অথবা
- ১ লিটার পানিতে ০.৫ মিলিগ্রাম মিথিলিন ব্লু যোগ করে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ বার সহ্য করার মতো সময় গোসল করিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। অথবা
- ১ লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম লবণ যোগ করে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ বার সহ্য করার মতো সময় গোসল করিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- মাছ বা মাছের পোনা পরিবহন/স্থানান্তর বা জাল টানার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মাছের গায়ে কোন প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি না হয়;
- পোনা মজুদের পূর্বে পোনাকে শোধন করে জীবাণুমুক্ত করে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে;
- মাছের অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব এ রোগের একটি অন্যতম সহায়ক কারণ, তাই কোনো ক্রমেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা যাবে না;
- পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে এবং পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন উৎপাদিত হলে এ রোগের সংক্রমণ বেশি ঘটে থাকে। তাই এ ব্যাপারে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভাইরাসজনিত রোগ

কমন কার্প এবং গ্রাসকার্পে প্রধানত ভাইরাসজনিত রোগ দেখা যায়। ভাইরাসজনিত রোগ হলে মাছ ব্যাপকহারে মারা যায়। স্প্রিং ভাইরেমিয়া ভাইরাসজনিত রোগ।

ক. স্প্রিং ভাইরেমিয়া (Spring Viraemia of Carp-SVC)

রোগের কারণ : র‍্যাবডোভাইরাস কার্পিও (Rhabdovirus carpio) নামক ভাইরাসের সংক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার : এ রোগের ভাইরাস মাছের মল এবং মূত্রের সাথে পানিতে অবমুক্ত হয়। রক্ত শোষণকারী বহুকোষী পরজীবী জোঁক (Piscicola geomatra) এবং আরগুলাস (Argulus foliaceus) র‍্যাবডোভাইরাসের পোষক হিসেবে কাজ করে। এ ভাইরাস পানির সাথে ছড়ায় এবং মাছের ফুলকায় বংশবিস্তার করে। এ রোগে আক্রান্ত মাছ প্রজননে ব্যবহার করা হলে উৎপাদিত পোনা মাছেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত মাছ নিরাময় হলে দ্বিতীয়বার আর এ রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু দেহে সারা জীবন এ ভাইরাস বহন করে চলে। এটি একটি সংক্রামক রোগ। সাধারণত গ্রীষ্মের শুরুতে এবং বসন্তকালে এ রোগের প্রকোপ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আক্রান্ত প্রজাতি : কমন কার্প

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- মাছের ত্বক, ফুলকা, অন্ত্র ও এয়ার ব্লাডারে রক্ত ক্ষরণ হয়;
- মাছের দেহ গহ্বরে লালচে ঘন তরল পদার্থ জমা হয় ও পেট ফুলে যায়;
- পায়ুপথে প্রদাহ হয়;
- দেহ গাঢ় বর্ণ ধারণ করে;
- চোখ ফুলে যায় এবং অক্ষিকোটর থেকে মনে হয় যেন বের হয়ে আসছে।

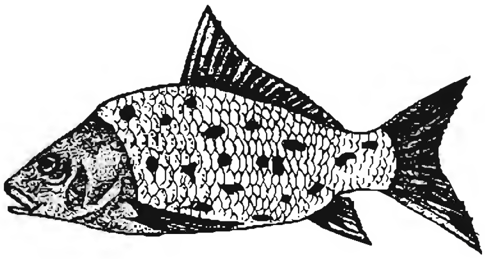

চিত্র-৪৮ : র‍্যাবডোভাইরাস রোগে আক্রান্ত

পরজীবীঘটিত রোগ

রোগ জীবাণুর ধরন অনুযায়ী পরজীবীঘটিত রোগকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. এককোষী পরজীবীঘটিত রোগ (Protozoan disease)
খ. বহুকোষী পরজীবীঘটিত রোগ (Metazoan disease)

ক. এককোষী পরজীবীঘটিত রোগ

কার্পজাতীয় মাছে প্রধানত এককোষী পরজীবীঘটিত রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এটা মাছের বহিঃ এবং অন্তঃ উভয় ধরনের পরজীবী হিসেবে রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এ ধরনের পরজীবীতে আক্রান্ত মাছে অনেক সময় কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আক্রান্ত মাছ আস্তে আস্তে মারা যায়। চাষকৃত মাছে সাধারণত নিম্নলিখিত রোগসমূহ দেখা যায়।

১. ইকথায়োপথেরিয়াসিস বা সাদা দাগ রোগ (Ichthyopthiriasis)

২. মিক্সোসপরিডিয়াসিস (Myxosporidiasis)।

১. সাদা দাগ রোগ (White spot disease)

রোগের কারণ : ইকথায়োপথিরিয়াস মালটিফিলিস (Ichthyopthirius multiphilis) নামক এককোষী পরজীবী এ রোগ ঘটায়।

রোগের বিস্তার : এ রোগের সংক্রমণ ও তীব্রতার মাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রীষ্ম ও বসন্ত কাল এ রোগের জন্য সবচেয়ে অনুকূল।

আক্রান্ত প্রজাতি : দেশীয় কার্পজাতীয় মাছের আঙ্গুলে পোনায় এ রোগের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হয়ে থাকে। এ ছাড়া শিং, মাগুর, কৈ প্রভৃতি মাছও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোয় বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা বা ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়;
- রোগের তীব্রতা খুব বেশি হলে মাছের ত্বক সাদা ঝিল্লীতে ঢাকা পড়ে যায়;
- মাছের গায়ের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায় এবং মাছ তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে;
- পরজীবী সংক্রমণের শুরুতে মাছ পানিতে লাফালাফি শুরু করে এবং কোনো কিছুতে গা ঘসতে থাকে;
- মাছ অলসভাবে চলাফেরা করে এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়;
- দেহ হতে অতিরিক্ত মিউকাস বের হয়ে যায়;
- মাছ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

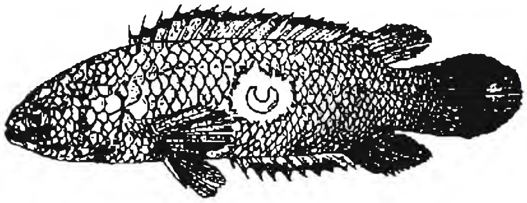

চিত্র-৪৯ : সাদা দাগ রোগে আক্রান্ত কৈ মাছ

চিকিৎসা

- ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ ।
- ২৫ গ্রাম/লিটার লবণ দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ বার সহ্য করার মতো সময় রেখে পরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।
- ০.১০ পিপিএম ম্যালাকাইট গ্রিন দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ৩০ সেকেন্ড রেখে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- পুকুর শামুক/ঝিনুক মুক্ত রাখতে হবে;
- পুকুরে নিয়মিত (৩ মাস অন্তর অন্তর) চুন প্রয়োগ করতে হবে;
- পোনা মজুদের পূর্বে পোনাকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে;
- মাত্রাতিরিক্ত পোনা মজুদ যেহেতু এ রোগের একটি অন্যতম কারণ তাই কোনো ক্রমেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা যাবে না;
- পানি পরিবর্তন করে জীবাণুমুক্ত পানি দিয়ে পানির তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস এ উন্নীত করলে কোন ঔষধ ছাড়াই এ পরজীবী ধ্বংস হবে।

২. মিক্সো স্পোরিডিয়াসিস

রোগের কারণ : মিক্সোবোলাস সাইপ্রিনি (Myxobolus Cyprini) এবং মিক্সোবোলাস ডিসপার (M. dispar) নামক প্রজাতির সংক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এটি একটি এককোষী পরজীবীঘটিত রোগ যা বহিঃ এবং অন্তঃপরজীবী হিসেবে মাছকে আক্রান্ত করে।

রোগের বিস্তার : পুকুরের পানিতে ক্লোরাইডের মাত্রা ৪০০ পিপিএম এর চেয়ে কম হলে এ ধরনের পরজীবীর অধিক সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত অক্টোবর মাসে এ রোগের তীব্রতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : এ রোগ সাধারণত কার্পজাতীয় মাছের পোনা ও বড় মাছে দেখা যায়। দেশীয় কার্পের মধ্যে কাতলা মাছ এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এ পরজীবী কাতলা মাছের ফুলকা আক্রান্ত করে। ফলে ফুলকা পচে যায় এবং মাছের ব্যাপক মড়ক দেখা যায়। এটি সংক্রমিত রোগ এবং এর নিয়ন্ত্রণ খুবই কষ্টকর।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

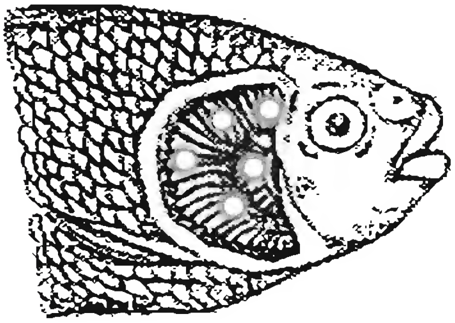

চিত্র-৫০ : মিক্সোবোলাস রোগে আক্রান্ত

- কাতলা মাছের ফুলকার উপরে সাদা কিংবা হালকা বাদামি গোলাকার গুটি তৈরি করে এ রোগের জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে। ক্রমান্বয়ে ঐ গুটির প্রভাবে ফুলকায় ঘা দেখা যায় এবং ফুলকা খসে পড়ে;
- মাছের ত্বকে ফোড়া বা বুদবুদ দেখা দেয়;
- ফুলকায় ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং ফুলকা পচতে শুরু করে;
- মাছের পায়ুতে সিস্ট দেখা যায় এবং পায়ু বিকৃত হয়ে যায়;
- মাছ ক্ষীণকায় হয়ে খুব দুর্বল হয়ে যায়;
- মাছের আঁইশ উঠে যায়, আঁইশ উঠে যাওয়ার কারণে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে;
- মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং মাছ অস্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করে ও
- শেষ রাতে মাছে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়।

রোগাক্রান্ত মাছের চিকিৎসা

- ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম লবণ নিয়ে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে মাছকে সহ্য করার মতো সময় রেখে পরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- ২০-২৫ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সহ্য করার মতো সময় রেখে পরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- ৫০০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- মাঝে মাঝে পুকুর শুকানো;
- ৩ মাস অন্তর অন্তর চুন প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

খ. বহুকোষী পরজীবীঘটিত রোগ

সাধারণত মনোজেনেটিক এবং ডাইজেনেটিক ট্রিমাটোড (Dactylogyrus Sp. & Gyrodactylus Sp.), জোঁক এবং ক্রাস্টাসিয়া পর্বের কতিপয় বহুকোষী পরজীবী এ ধরনের রোগের কারণ। যেমন- আরগুলাস দ্বারা সৃষ্ট আরগুলোসিস রোগ হলো একটি বহুকোষী বা মেটাজোয়ান পরজীবীঘটিত রোগ। নিচে ক্রাস্টাসিয়া পর্বের আরগুলাস দ্বারা সংক্রমিত আরগুলোসিস রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১. আরগুলোসিস বা মাছের উকুনজনিত রোগ

রোগের কারণ : আরগুলাস ফলিয়াসিয়াস *(Argulus foliaceus)* এবং আরগুলাস করিগনি *(A. coregoni)* নামক এক ধরনের বহিঃ পরজীবীর সংক্রমণে প্রধানত বড় মাছে এ রোগ দেখা দেয়।

আক্রান্ত প্রজাতি : কার্পজাতীয় মাছ, বিশেষ করে রুই মাছ এ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- সংক্রমণের মাত্রা বেশি হলে মাছ অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে;
- পরজীবীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মাছ শক্ত কোনো কিছুর সঙ্গে গা ঘষতে থাকে;
- মাছের গায়ে পরজীবী হুল ফুটিয়ে আটকে থাকে, যা খালি চোখেই দেখা যায়;
- আক্রান্ত স্থানের চারপার্শ্বে লালচে বর্ণ ধারণ করে। পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে সেখানে ঘায়ের সৃষ্টি হয়;

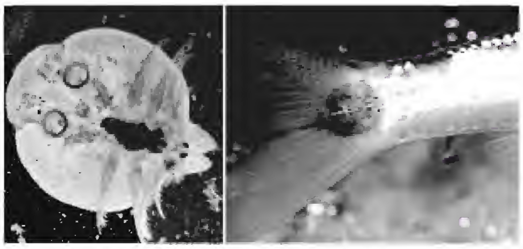

চিত্র-৫১ : আরগুলাস ও আক্রান্ত মাছের লেজ

- মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায় ফলে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং মাছ ক্ষীণকায় হয়ে পরিশেষে মারা যায়।

চিকিৎসা

- ডিপটারেক্স ১০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে ১৫ দিন অন্তর অন্তর কমপক্ষে ২ বার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে, অথবা
- সুমিথিয়ন ৩ মিলিগ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে ১৫ দিন অন্তর অন্তর কমপক্ষে ২ বার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে, অথবা
- ৬ মিলি/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে নেগুভন সপ্তাহে একবার করে মোট ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- এ রোগ সংক্রামক বিধায় আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল রোদে ভালোভাবে না শুকিয়ে অন্য পুকুরে ব্যবহার না করা,
- পুকুর পুরনো হলে এবং তলদেশে অতিরিক্ত পচা কাদা থাকলে এ পরজীবীর সংক্রমণের মাত্রা ও তীব্রতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। তাই কোনক্রমেই পুকুরে ৬ ইঞ্চি এর বেশি কাদা না রাখা;

- কম ঘনত্বে মাছ মজুদ করা ও
- জৈব সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা।

পুষ্টিজনিত রোগ

পুষ্টি উপাদানসমূহের স্বল্পতা, আধিক্য এবং পুষ্টিবিরোধী উপাদানসমূহের যথাযথ ভারসাম্যের অভাবে যেসব রোগ সৃষ্টি হয় তাকে পুষ্টিজনিত রোগ বলে। পুষ্টিজনিত রোগ বিভিন্ন লক্ষণ বা উপসর্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নিচে কিছু পুষ্টিজনিত রোগ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলো।

ক. পুষ্টির অভাবজনিত রোগ;
খ. পুষ্টির আধিক্যজনিত রোগ;
গ. খাদ্যস্থিত পুষ্টি বিরোধী উপাদানের কারণে সৃষ্ট রোগ এবং
ঘ. অন্যান্য কারণে সৃষ্ট পুষ্টিজনিত রোগ।

ক্ষতরোগ (Epizootic Ulcerative Syndrome)

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে চাঁদপুরের মেঘনা-ধনাগোদা বাঁধ প্রকল্প এলাকায় প্রথম মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সারা দেশে এ রোগের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে। Epizootic Ulcerative Syndrome সংক্ষেপে EUS রোগ বা মাছের ক্ষতরোগ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে বলে বিজ্ঞানীরা এ রোগকে এ নামে অভিহিত করেছেন। Epizootic হচ্ছে অস্থায়ীভাবে মহামারী আকারে প্রাণীজগতে যে রোগ ছড়িয়ে পড়ে, Ulcer ক্ষতেরই প্রতিশব্দ এবং Syndrome- লক্ষণসমূহ যার কারণ এখনও নিশ্চিতরূপে বের করা সম্ভব হয়নি।

রোগের সম্ভাব্য কারণ : অ্যাফানোমাইসেস ইনভাডেন্স *(Aphanomyces invadans)* নামক এক প্রকার জলজ ছত্রাককে এ রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ছত্রাক *(Aphanomyces)* যেহেতু নিজে মাছের ত্বক ভেদ করতে পারে না, তাই প্রথম পর্যায়ে ভাইরাস *(Rhabdovirus)* এবং পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া *(Aeromonus hydrophils)* এর সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয় বলে এখন পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী ধারণা পোষণ করছেন। তবে পরিবেশ দূষণের ফলে পানির গুণাবলীর নিম্নরূপ পরিবর্তনে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যথা-

- অম্লের (Acidity) বৃদ্ধি (১২ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি, স্বাভাবিক মাত্রা ৬ মিলিগ্রাম/লিটার এর কম)
- ক্ষারের ঘাটতি (৬০ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি, স্বাভাবিক মাত্রা ৭৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর উপরে)
- ক্ষরতার (Hardness) বৃদ্ধি (৮০ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি, স্বাভাবিক মাত্রা ৬৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর কম)
- ক্লোরাইডের কমতি (৬ মিলিগ্রাম/লিটার এর কম, স্বাভাবিক মাত্রা ৭ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি)
- অকস্মাৎ প্রাকৃতিক তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য ।

প্রাকৃতিক তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সে. এর নিচে গেলেই মাছের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। আর ১০ ডিগ্রী সে. এর নিচে গেলে তা মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়। উল্লেখিত কারণে জলজ পরিবেশের ভারসাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে অ্যারোমোনাস হাইড্রোফিলা এবং অ্যারোমোনাস সোবরিয়া মাছের

দেহের বহিরাংশে ক্ষতের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে উক্ত ক্ষতস্থানসমূহ ছত্রাক, অন্যান্য রোগজীবাণু ও পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পরিশেষে ক্ষত রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগ শীতকালে বেশি দেখা যায় এবং আক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যায়।

আক্রান্ত প্রজাতিসমূহ : শোল, গজার, টাকি, পুঁটি, বাইম, কৈ, মেনি, মৃগেল, কার্পিও এবং তলায় বসবাসকারী অন্যান্য প্রজাতির মাছ।

আক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ

- প্রাথমিকভাবে মাছের গায়ে লাল দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে লাল দাগের চারপাশে পচন ধরে উক্ত স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়;
- আক্রান্ত স্থানে পরে ঘা হয় এবং ঘা থেকে পুঁজ ও তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়;
- মারাত্মক আক্রান্ত মাছের লেজ ও পাখনা খসে পড়ে,
- মাছ অস্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটে;
- আক্রান্ত মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।

চিত্র-৫২ : ক্ষতরোগে আক্রান্ত পুঁটি

চিকিৎসা

- প্রতি কেজি মাছের জন্য ০.২৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন পাউডার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর ১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে। অথবা
- বড় মাছের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি মাছের জন্য ২৫ মিলিগ্রাম জেন্টামাইসিন ইনজেকশান সপ্তাহে ১ দিন করে ৩ সপ্তাহে ৩টি ইনজেকশন মাংসপেশিতে দিলে মাছ দ্রুত ভালো হয়ে যায়।
- শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন এবং ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে উক্ত মাত্রায় চুন এবং লবণ একসঙ্গে প্রয়োগ না করে প্রথমে ১/২ কেজি চুন এবং ১/২ কেজি লবণ প্রয়োগ করে এক সপ্তাহ পরে আবারও ১/২ কেজি চুন এবং ১/২ কেজি লবণ প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ৩/৪টি চালতা ছেঁচে তার রস সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- শীত শুরুর আগেই ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করে মাছের বসবাসরত পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে;
- রোগাক্রান্ত মাছের পুকুরে ব্যবহৃত জাল রোদে না শুকিয়ে অন্য পুকুরে ব্যবহার না করা,
- জৈব সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা;
- পুকুর পরিষ্কার রাখা;
- সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা ও
- মজুদ ঘনত্ব খুব বেশি হলে আংশিক আহরণের মাধ্যমে ঘনত্ব কমিয়ে ফেলা।

মাছের রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি কেন তত বেশি ফলপ্রসূ নয়?

মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে 'চিকিৎসা নয় , রোগ প্রতিরোধই উত্তম' (Prevention is better than cure)। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। যেমন-

- পানিতে বসবাস করে বিধায় মাছের বিভিন্ন কার্যাবলি ও আচরণ পর্যবেক্ষণ কষ্টসাধ্য। এ কারণে নির্ভুলভাবে মাছের রোগ নিরূপণ এবং রোগ সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য;
- মাছ পানিতে বসবাস করে বিধায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ যখন নিরাময়যোগ্য অবস্থা পেরিয়ে যায়, তখন রোগ ধরা পড়ে। সে সময় মৎস্যচাষির তেমন কিছু করার থাকে না;
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছের নয়, মাছের বসবাসরত পরিবেশের উন্নয়ন সাধনকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে চিকিৎসার খরচ অনেক বেড়ে যায়। এটিও মাছের রোগ নিরাময়ে অন্যতম অন্তরায়;
- রোগাক্রান্ত মাছকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক দ্রবণে ডুবানো বা গোসল করানো প্রয়োজন যা বড় বড় পুকুরের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না;
- মাছের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই আক্রান্ত মাছকে এককভাবে চিকিৎসা করা যায় না;
- মাছ নিম্নশ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণী বিধায় মাছের দেহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ (কিডনী, লিভার, ফুসফুস প্রভৃতি) কোনো উন্নত প্রাণীর (মানুষের) ন্যায় সুগঠিত নয় বিধায় এদের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি ততবেশি ফলপ্রসূ নয়;
- মুখে ঔষধ খাওয়ানোর পদ্ধতি মাছের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ততটা কার্যকর নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ রোগাক্রান্ত হলে খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়;
- মাছের ক্ষেত্রে যেহেতু রোগের লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করতে হয়, তাই নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় না হলে চিকিৎসা পদ্ধতি ততটা ফলপ্রসূ হয় না।

অনুশীলনী-১২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কেন মাছ রোগাক্রান্ত হয়?
২. মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মাছের দুটি রোগের নাম লেখ?
৪. ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মাছের একটি রোগের নাম লেখ?
৫. ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছের রোগ কোনটি?
৬. পরজীবীর সংক্রমণে সৃষ্ট মাছের দুইটি রোগের নাম লেখ।
৭. লেজ ও পাখনা পচা রোগের লক্ষণ লেখ।
৮. লেজ ও পাখনা পচা রোগে ব্যবহৃত ১টি এন্টিবায়েটিকের নাম লেখ।
৯. পেট ফুলা রোগ কোন মাছে বেশি হয়?
১০. পেট ফুলা রোগের চিকিৎসা কী?
১১. আমাদের দেশে প্রথম কোন বছর ক্ষতরোগ দেয়া যায়?
১২. কোন সময় ক্ষতরোগ হয়?
১৩. ক্ষতরোগ প্রতিকারের জন্য কী পরিমাণ চুন প্রয়োগ করা দরকার?
১৪. ছত্রাকজনিত ফুলকা পচা রোগের লক্ষণ কী?
১৫. ছত্রাকজনিত ফুলকা পচা রোগে ব্যবহৃত হয় এমন দুটি ঔষধের নাম লেখ।
১৬. স্যাপরোলেগনিয়াসিস রোগের একটি লক্ষণ লেখ।
১৭. পরজীবীঘটিত রোগকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
১৮. সাদা দাগ রোগ প্রতিকারে কী ওষধ ব্যবহার করা হয়?
১৯. গাইরোড্যাকটাইলোসিস রোগের লক্ষণ কী?
২০. আরগুলাসের আক্রমণ কোন ধরনের মাছে বেশি দেখা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেট ফুলা রোগের দুইটি লক্ষণ বর্ণনা কর।
২. এককোষী পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগের দুইটি লক্ষণ বর্ণনা কর।
৩. ক্রাস্টাশিয়ান পরজীবীঘটিত দুইটি রোগের নাম লেখ। যে কোনো একটি রোগের দুইটি লক্ষণ বর্ণনা কর।
৪. মাছে ফুলকা পচা রোগের লক্ষণ কী কী?
৫. EUS শব্দের পূর্ণাঙ্গরূপ ইংরেজিতে লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাছের রোগের লক্ষণ সমুহ কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তা আলোচনা কর।
২. ক্ষতরোগের উৎপত্তি ও প্রকৃতি আলোচনা কর। কীভাবে এ রোগ দমন করা যায়?
৩. মাছের পরজীবীঘটিত রোগের বিবরণ দাও। কীভাবে পরজীবীজনিত রোগ প্রতিকার করা যায়?
৪. ব্যাকটেরিয়াজনিত যে কোনো একটি রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. মাছের রোগে চিকিৎসা পদ্ধতি কেন তত বেশি ফলপ্রসূ নয় তা বর্ণনা কর।

ব্যবহারিক

জব নং- ১ : মাছের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছের দেহকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা -

ক. মাথা খ. উদর, ও গ. লেজ।

ক. মাথা : মুখছিদ্র হতে কানকো পর্যন্ত অংশকে মাথা বলা হয়। মাছের মাথা শরীরের প্রধানতম অঙ্গ। মাথায় মুখ, চোখ, ফুলকা প্রভৃতি অঙ্গাদি অবস্থিত।

খ. উদর : কানকুয়া থেকে পায়ু পর্যন্ত অংশকে উদর বলে। মাছের দেহের মধ্যে উদর অংশ বেশি প্রশস্ত। উদর সাধারণত স্ফীত হয় কারণ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রতঙ্গ উদরের ভিতরে থাকে।

গ. লেজ : পায়ুর পশ্চাতের অংশকে লেজ বলা হয়। লেজ মাছের চলাচলে সাহায্য করে। মাথা, উদর ও লেজ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক অঙ্গের মধ্যে আঁইশ ও পাখনা অন্যতম। আঁইশ মাছের শরীরকে ঢেকে রাখে। অনেক মাছের আঁইশ থাকে না। মাছের শরীরে জোড় বা বিজোড় সংখ্যক পাখনা থাকে। পাখনা দ্বারা মাছ পানিতে চলাচল করে। কোনো কোনো মাছের শুঁড় থাকে। এসব শুঁড় দিয়ে মাছ খাদ্যবস্তু খুঁজে বেড়ায়। শুঁড়ওয়ালা মাছকে Cat fish বলে।

উপকরণ

১. ট্রে	২. আতশ কাচ
৩. নিডল	৪. রুইজাতীয় একটি তাজা মাছ
৫. স্পেসিমেন জার ও	৬. ফরমালিন ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার হতে ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের তাজা বা সদ্যধৃত রুই বা কাতলা মাছ সংগ্রহ করি।

২. মাছের বাহ্যিক অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করি এবং চিত্র অনুযায়ী শনাক্ত করি।

৩. পর্যবেক্ষণের সময় আতশ কাচ ও নিডল ব্যবহার করে আঁইশ, পার্শ্বরেখা, নাসারন্দ্র ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। ব্যবহারিক খাতায় মাছের ছবি এঁকে বাহ্যিক অঙ্গপ্রতঙ্গসমূহ চিহ্নিত করি।

৪. অনুশীলনের পর মাছকে স্পেসিমেন জারে ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ করি।

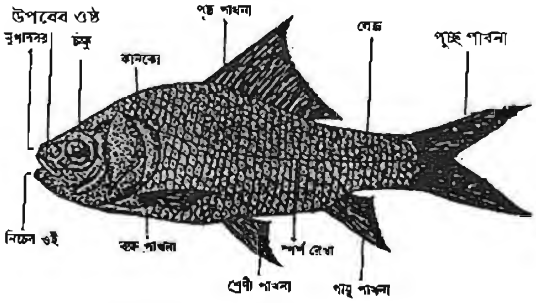

চিত্র-৫৩ : মাছের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ

জব নং - ২ : মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছের স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগবালাই, খাদ্যগ্রহণ, খাদ্যের উপাদান প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যেসব অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় সেগুলো হলো–

ক. ফুলকা
খ. পাকস্থলী
গ. অন্ত্র
ঘ. হৃৎপিন্ড
ঙ. গল ব্লাডার বা পিত্তথলি
চ. বৃক্ক
ছ. পটকা
জ. যকৃৎ
ঝ. ডিম্বাশয় ও
ঞ. অগ্ন্যাশয়।

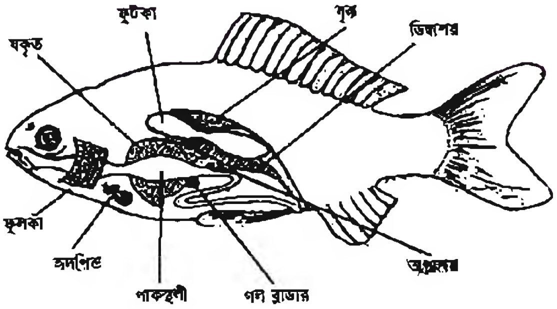

চিত্র-৫৪ : মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ

ক. ফুলকা : মাছের মাথায় কানকোর নিচে ফুলকার অবস্থান। মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ফুলকা ব্যবহৃত হয়। মাথার দুই পাশে কানকোর নিচে ৪ থেকে ৫ জোড়া ফুলকা দেখতে পাওয়া যায় যা টকটকে লাল রঙের।

খ. পাকস্থলী : মাছের উদর ব্যবচ্ছেদ করলে নাড়ি-ভুঁড়ি দেখা যায় এ নাড়ি-ভুঁড়ি হচ্ছে মাছের খাদ্যনালী। খাদ্যনালীর যে অংশ মুখগহ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে পাকস্থলী বলে। খাওয়ার পরে প্রাথমিকভাবে পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু জমা হয়।

গ. অন্ত্র : খাদ্যনালীর পাকস্থলীর পরের অংশ থেকে পায়ু পর্যন্ত অংশকে অন্ত্র বলে। অন্ত্রে হজমকৃত খাদ্য থেকে পুষ্টি শোষিত হয়।

ঘ. হৃৎপিণ্ড : পাকস্থলীর কাছাকাছি ছোট্ট যে অঙ্গের অবস্থান তা হৃৎপিণ্ড। মাছের দেহে রক্ত সঞ্চালনের মূল কেন্দ্র হিসেবে হৃৎপিণ্ড কাজ করে।

ঙ. গলব্লাডার : সব মাছের গলব্লাডার বা পিত্তথলি সহজে চেনা যায় না। বড় বড় আকারের মাছে পাকস্থলীর নিচে গলব্লাডারের অবস্থান বুঝা যায়। পিত্তরস সরবরাহ করা গলব্লাডারের কাজ।

চ. যকৃত : হৃৎপিণ্ড ও গলবল্লাডারের মাঝখানে যকৃতের অবস্থান। তামা রঙের যকৃত মাছের রক্তে বিভিন্ন নির্যাস নিঃসৃত করে।

ছ. পটকা : মাছের দেহ গহ্বরে বেলুন সদৃশ্য পটকা খুব সহজে চেনা যায়। পটকার সাহায্যে মাছ পানির মধ্যে ভেসে থাকতে পারে।

জ. বৃক্ক : পটকার উপরে মাছের মেরুদণ্ডের সাথে লেগে থাকে। বৃক্ক শরীরের মধ্যে হতে বর্জ্য পদার্থ মল মূত্রের সাথে বের করতে সাহায্য করে।

ঝ. ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় : প্রজননযোগ্য মাছের দেহাভ্যন্তরে ডিম্বাশয় (স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে) বা শুক্রাশয় (পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে) সহজেই চেনা যায়। প্রজনন পরবর্তী সময়ে এ অঙ্গ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ডিম্বাশয়ে ডিম এবং শুক্রাশয়ে শুক্র তৈরি হয়।

ঞ. অগ্ন্যাশয় : যকৃতের সাথে সংযুক্ত খুব ছোট গ্রন্থিকে অগ্ন্যাশয় বলে। মাছের দেহে বিভিন্ন রস নিঃসরণ করা অগ্ন্যাশয়ের কাজ।

উপকরণ

১. ব্যবচ্ছেদ ট্রে
২. আতশ কাচ
৩. কাঁচি
৪. চিমটা
৫. নিডল
৬. স্কালপেল
৭. ব্রাশ/তুলি
৮. স্পেসিমেন জার
৯. ফরমালিন দ্রবণ
১০. রুইজাতীয় তাজা মাছ

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার হতে আনুমানিক আধা কেজি ওজনের দুইটি রুই ও মৃগেল মাছ সংগ্রহ করি।
২. ব্যবচ্ছেদ ট্রের উপর মাছকে পেটের অংশ উপরের দিকে এবং পিঠের অংশ নিচের দিকে দিয়ে শায়িত করি।
৩. এবার ধারালো কাঁচির সাহায্যে পায়ুপথের সামনে থেকে চোয়াল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করি।
৪. যথাযথ ব্যবচ্ছেদের পর উন্মুক্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত করি।
৫. অনুশীলনকৃত নমুনাটি (মাছ) স্পেসিমেন জারে ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ করি।
৬. অনুশীলনকৃত কার্য পদ্ধতি ছবিসহ ব্যবহারিক খাতায় লিখি এবং কাজ শেষে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে ল্যাবে জমা দেই।

জব নং-৩ : গলদা ও বাগদা চিংড়ি পর্যবেক্ষণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গলদা ও বাগদা চিংড়ি আমাদের দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক সম্পদ। তাই এদের পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

উপকরণ

১. গলদা চিংড়ি
২. বাগদা চিংড়ি
৩. আতশ কাচ
৪. খাতা
৫. পেন্সিল
৬. ট্রে ও বালতি

কাজের ধারা

১. বাজার বা খামার থেকে সংগৃহীত চিংড়ি সাবধানে বালতিতে করে নিয়ে আসি।
২. চিংড়ি গুলোকে ট্রেতে স্থাপন করি এবং আতশ কাচের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করি।
৩. চিত্র অঙ্কন করি এবং বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

পর্যবেক্ষণ : নমুনা - ১

ক. বর্ণ হালকা সবুজ থেকে কালচে বাদামি।
খ. রোস্ট্রাম লম্বা ও বাঁকানো এবং উপরে নিচে খাঁজ কাটা।
গ. শিরোবক্ষ বেশ বড়।
ঘ. রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১২-১৫টি ও নিম্নভাগে ১১-১৪টি দাঁত আছে।
ঙ. উপরের দ্বিতীয় জোড়া পা বেশ শক্ত, মোটা ও চিমটা যুক্ত।

সিদ্ধান্ত : এটি গলদা চিংড়ি

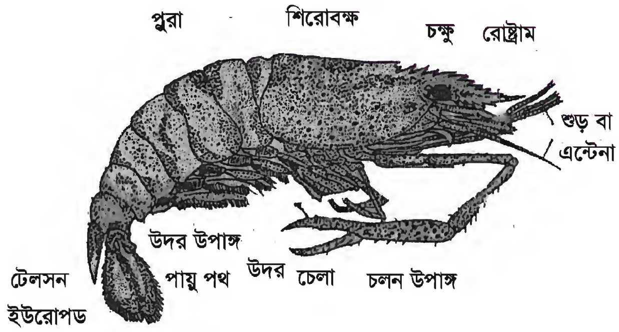
পুরা
শিরোবক্ষ
চক্ষু
রোষ্ট্রাম
শুড় বা
এন্টেনা
উদর উপাঙ্গ
টেলসন
পায়ু পথ
উদর
চেলা
চলন উপাঙ্গ
ইউরোপড

চিত্র-৫৫ : গলদা চিংড়ি

পর্যবেক্ষণ : নমুনা - ২

ক. বর্ণ হালকা বাদামি বা হালকা সবুজ।
খ. রোস্ট্রাম বাঁকা ও প্রশস্ত।
গ. গায়ে ডোরাকাটা কালচে দাগ আছে।
ঘ. রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৬-৮টি ও নিম্নভাগে ২-৩টি দাঁত আছে।

সিদ্ধান্ত : এটি বাগদা চিংড়ি

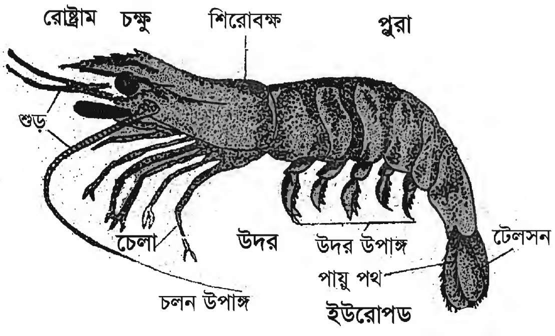
রোষ্ট্রাম
চক্ষু
শিরোবক্ষ
পুরা
শুড়
চেলা
উদর
উদর উপাঙ্গ
টেলসন
পায়ু পথ
চলন উপাঙ্গ
ইউরোপড

চিত্র-৫৬ : বাগদা চিংড়ি

জব নং-৪ : একটি আর্দশ পুকুরের প্রতিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন উপাদান শনাক্তকরণ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের প্রতিবেশ হলো পানি, মাটি, সূর্যালোক, তাপমাত্রা, প্রাণী ও উদ্ভিদের সমষ্টি। প্রতিবেশে জীবন্ত ও অজীবন্ত উভয় প্রকার উপাদান বিদ্যমান। জীবন্ত উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, জলজ প্রাণী, যেমন- মাছ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, প্রাণী প্ল্যাংকটন, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি বিদ্যমান। অজৈব উপাদানের মধ্যে আলো, তাপমাত্রা, মাটি ও পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার অজৈব পদার্থ বিদ্যমান। প্রতিবেশের জীব উপাদানের সাথে অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আন্তক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে।

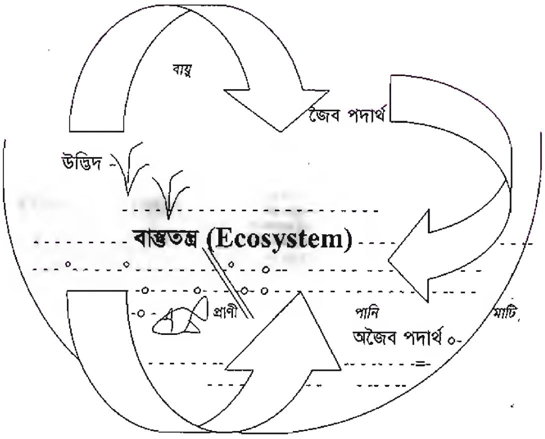

চিত্র-৫৭ : পুকুরের প্রতিবেশে বিভিন্ন উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্ক

উপকরণ

১. খেপলা জাল
২. স্পেসিমেন জার বড়- ২টা, ছোট- ৪টা
৩. ফরমালিন
৪. বিকার
৫. গামছা
৬. খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ একটি পুকুরের কাছে যাই।
২. পুকুরের প্রতিবেশে জৈব ও অজৈব উপাদান পর্যবেক্ষণ করি।
৩. জৈব উপাদানের অংশ হিসেবে জাল দিয়ে উপর ও নিম্নস্তরের মাছ সংগ্রহ করি।
৪. গামছা দিয়ে ছেঁকে কিছু প্ল্যাংকটন সংগ্রহ করি এবং বিকারে নিয়ে সূর্যের আলোর বিপরীতে দেখি।
৫. পানিতে বিদ্যমান শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করি।
৬. পুকুরের তলার কাদা হতে শামুক, ঝিনুক, পোকা ইত্যাদি সংগ্রহ করি।
৭. সংগৃহীত সব নমুনা ফরমালিন দ্রবণে পৃথক পৃথক জারে সংরক্ষণ করি।
৮. ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ অনুশীলনকৃত কার্যক্রম লিখি।
৯. অনুশীলন শেষে জাল, প্ল্যাংকটন নেট, গামছা ইত্যাদি পরিষ্কার করে রেখে দেই।

জব নং- ৫ : পুকুর নির্মাণ কৌশল অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্মাণ করা হয়। নতুন পুকুর নির্মাণ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। তাই পুকুর নির্মাণের সময় বিভিন্ন

বিষয় বিবেচনা করা হয়। যেমন- পুকুরের অবস্থান, মাটির প্রকৃতি, পুকুরের আকার, গভীরতা, পাড়, তলদেশ প্রভৃতি। মাছ চাষের প্রকার ও পানির উৎস অনুযায়ী উপরের বিষয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

একটি পুকুরের ৪টি অংশ থাকে। যেমন–

ক. পাড়
খ. বকচর
গ. পাড়ের ঢাল
ঘ. তলদেশ।

পাড় : পাড় পানির উপরে ৬০ সে.মি. উঁচু এবং পাড়ের চূড়া ০.৫-১.৫ মিটার প্রশস্ত হলে ভালো হয়। মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী পাড়ের ঢাল বাহিরের দিকে ১.২ বা ১.৫ হতে হবে।

বকচর : পাড়ের স্থায়িত্ব, জাল টানার সুবিধা ও মাছের বিচরণের সুবিধার জন্য বকচর রাখা হয়। ১.৫-২.০ মিটার গভীর পুকুরের জন্য ১ মিটার প্রশস্ত বকচর থাকা ভালো।

পাড়ের ঢাল বা দেয়াল : পুকুর খননের সময় পাড় বরাবর খাড়াভাবে নিচের দিকে খনন না করে এবং ক্রমে ঢালু করে নিচের দিকে খনন করাকে ঢাল রাখা বলে। মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী পুকুরের ভিতর চারিদিকের ঢাল ১ঃ১ বা ১ঃ২ হতে পারে।

তলদেশ : পুকুরের তলদেশ সমতল তবে একদিকে সামান্য ঢালু হলে ভালো হয়।

উপকরণ

১. ঝুড়ি
২. কোদাল
৩. মাপার ফিতা
৪. বাঁশের খুঁটি
৫. সুতলী

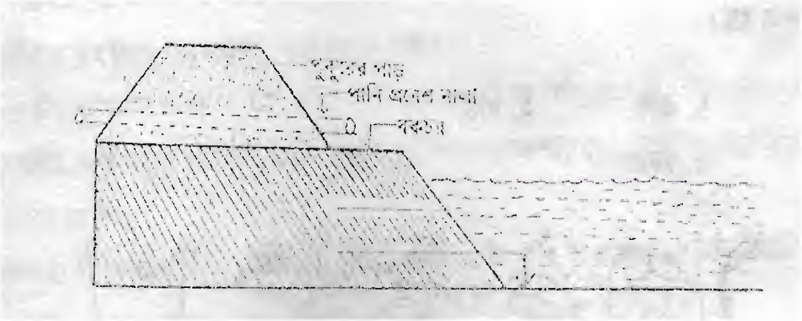

চিত্র-৫৮ পুকুর খনন

কাজের ধারা

১. খনন করা হচ্ছে এমন একটি পুকুরের কাছে যাই।
২. কাছে গিয়ে পুকুরের ভিন্ন অংশ শনাক্ত করি।
৩. ঝুড়ি, কোদাল দ্বারা মাটি কেটে ঢাল তৈরি করি এবং মাপন ফিতা দিয়ে মেপে দেখি।
৪. খনন হচ্ছে পুকুরের অভাবে বিদ্যালয়ের আশপাশে কোনো ছোট জায়গায় নমুনা পুকুর বা মিনি পুকুর খনন করে বিভিন্ন অংশ সঠিকভাবে শনাক্ত করি।
৫. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-৬ : পুকুরের বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের প্রতিবেশে বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ ও শ্যাওলা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এসব উদ্ভিদ মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর। এসব উদ্ভিদ পানি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দ্রব্য শোষণ করে, পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা প্রদান করে এবং মাছের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

পুকুরের প্রতিবেশের উদ্ভিদকুলকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ;
২. অর্ধডুবন্ত উদ্ভিদ;
৩. ভাসমান উদ্ভিদ;
৪. নির্গমনশীল উদ্ভিদ ও
৫. লতানো উদ্ভিদ ।

উপকরণ

১. বড় মুখওয়ালা কাচের বোতল বা বয়াম ৫-৭টি
২. ফরমালিন
৩. খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১. যথেষ্ট পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ আছে এমন একটি পুকুর নির্বাচন করি এবং সেখানে যাই।
২. পুকুরের পাড় থেকে, পানির উপর ভাসমান, লতানো বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করি এবং শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী শনাক্ত করি।
৩. প্রতিটি শ্রেণির দুই একটি করে নমুনা ফরমালিন দ্রবণে লেবেল যুক্ত বোতলে সংরক্ষণ করি।
৪. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

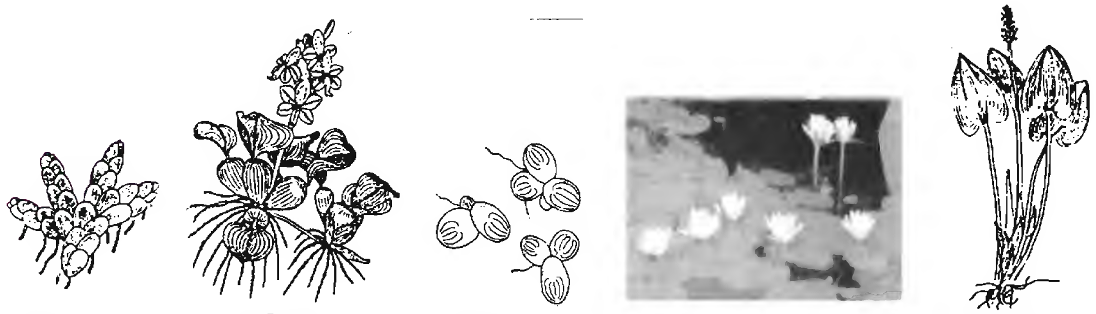

কুটি পানা কচুরি পানা ক্ষুদি পানা এরোহেড

চিত্র-৫৯ : বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ

জব নং-৭ : বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত মাছ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চাষের জন্য পুকুরে ছাড়া হয় না এমন মাছকে অবাঞ্ছিত মাছ বা আমাছা বলে। কারণ এরা চাষকৃত মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে, দ্রুত প্রজনন করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য চাষকৃত মাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এসব মাছ আকারে ছোট, বৃদ্ধির হার কম এবং বাজারে মূল্য ও চাহিদা কম। তাই চাষির জন্য লাভজনক হয় না। পুঁটি, চান্দা, বইচা, দারকিনা, চেলা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত মাছের উদারণ।

উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রকার গুঁড়ামাছ
২. ২৫০ এম এল আকারের কাচের জার
৩. ফরমালিন ও
৪. খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার থেকে বিভিন্ন প্রকার গুড়া মাছ তাজা অবস্থায় সংগ্রহ করি।
২. সংগৃহীত মাছ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির অবাঞ্ছিত মাছ শনাক্ত করি।
৩. প্রতি প্রকারের মাছ পৃথক করে লেভেল সম্বলিত গ্লাসজারে ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ করি।
৪. ব্যবহারিক খাতায় বিভিন্ন প্রজাতির অবাঞ্ছিত মাছের ছবিসহ গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করি।

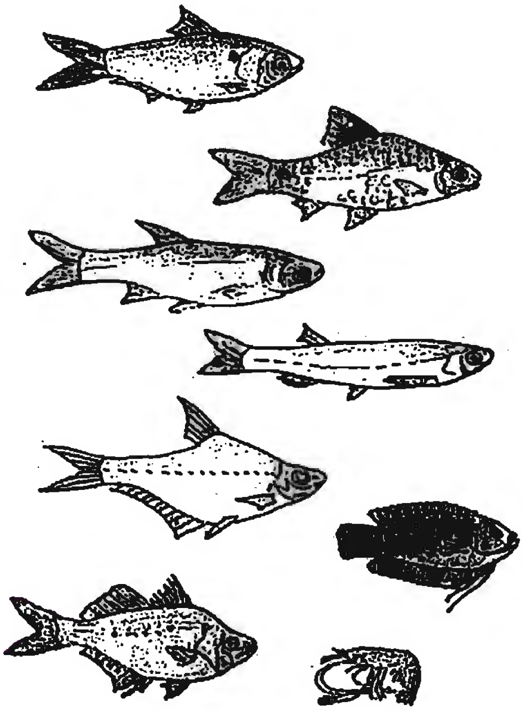

চিত্র-৬০ : অবাঞ্ছিত মাছ

জব নং-৮ : বিভিন্ন প্রকার রাক্ষুসে মাছ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

যেসব মাছ চাষকৃত মাছের পোনা খেয়ে ফেলে তাদের রাক্ষুসে মাছ বলে। যেসব পুকুর বন্যার সময় ডুবে যায় বা বাইরে থেকে খাল বিলের মাছ ঢুকতে পারে সেসব পুকুরে রাক্ষুসে মাছ থাকার আশঙ্কা বেশি। শোল, বোয়াল, গজার, টাকি, চিতল, ভেটকি, বেলে ইত্যাদি রাক্ষুসে প্রকৃতির মাছ। অবাঞ্ছিত মাছের তুলনায় রাক্ষুসে মাছ পুকুরে মাছ চাষের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রজাতির রাক্ষুসে মাছ
২. বড় আকারে কাচের জার-১-২ লিটার মাপের
৩. ফরমালিন দ্রবণ ও
৪. খাতা ও পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার থেকে বিভিন্ন প্রকার রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, বোয়াল, গজার, টাকি প্রভৃতি মাছ জীবিত অথবা তাজা অবস্থায় সংগ্রহ করি।
২. প্রতিটি রাক্ষুসে মাছের আকৃতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করি ও শনাক্ত করি।
৩. বিভিন্ন প্রজাতির রাক্ষুসে মাছ লেবেল এঁটে কাচের জারে ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষণ করি।
৪. প্রতিটি শনাক্তকৃত রাক্ষুসে মাছের ছবি খাতায় আঁকি ও নাম লিখি।

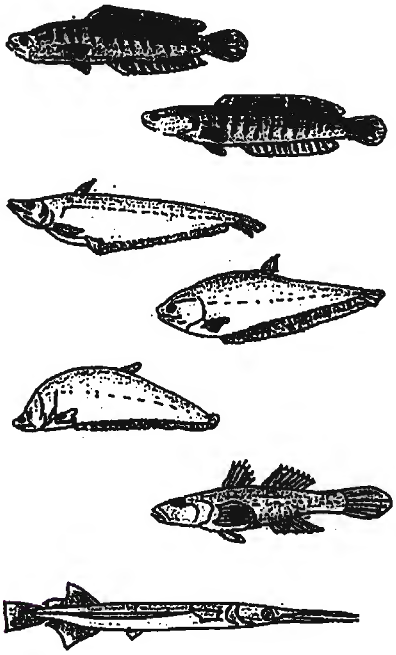

চিত্র-৬১ : বিভিন্ন প্রকার রাক্ষুসে মাছ

জব নং-৯ : রোটেনন প্রয়োগে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

রোটেনন ডেরিস গাছের শিকড় থেকে তৈরি এক ধরনের বাদামি রঙের পাউডার। যা পানিতে প্রয়োগ করলে মাছ মারা যায়। পানিতে রোটেনন প্রয়োগ করলে মাছ পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা হারায়। ফলে মাছ ফুলকার সাহায্যে পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না বলে মাছ অক্সিজেন গ্রহণের জন্য পানির উপরিতলে চলে আসে। সচরাচর ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে রোটেনন ব্যবহার করা হয়। রোটেনন দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যায়। রৌদ্রময় সময়ে রোটেননের কার্যকারিতা বেশি।

উপকরণ

১. রোটেনন পাউডার
২. বড় বালতি
৩. মগ
৪. বড় গামলা
৫. মাপন ফিতা
৬. টানা জাল
৭. খাতা ও পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১. রোটেনন প্রয়োগের জন্য নিকটস্থ একটি পুকুর নির্বাচন করি।

২. পুকুরে জলায়তন নির্ণয়ের জন্য মাপন ফিতা ব্যবহার করে পানি বরাবর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা মেপে নিই।

৩. এবারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গুণ করে জলায়তন নির্ণয় করি। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ফুটে দেয়া থাকলে তাকে ৪৩৫.৬ দ্বারা ভাগ করে শতাংশ বের করি (৪৩৫.৬ বর্গফুটে ১ শতাংশ)।

৪. এবার ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে মোট রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় করি। ব্যবহারিক খাতায় ছকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, জলায়তন ও রোটেননের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করি।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	মোট জলায়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা (ফুট)	রোটেননের পরিমাণ (গ্রাম)
৫০	৩৫	৪.০২	৫	৫০৩ গ্রাম

৫. মোট রোটেননের ৩ ভাগের ২ ভাগ রোটেনন (৩০০ গ্রাম) বালতিতে করে যথেষ্ট পরিমাণে পানিতে গুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

৬. বাকি ৩/১ ভাগ রোটেনন (২০২ গ্রাম) অল্প পানি দিয়ে গামলায় এমনভাবে গুলাই যেন শুকনা শুকনা দলা বানানো যায়। এভাবে তৈরিকৃত দলাকে ছোট ছোট বল আকারে তৈরি করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দেই ।

৭. জাল টেনে পুকুরের পানি উলটপালট করে দেয়ার ব্যবস্থা করি ।

৮. ৫-১০ মিনিট পর জাল টেনে আক্রান্ত মাছ ধরে ফেলি।

৯. গৃহীত কাজের ধারাটি ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-১০ : পুকুরে চুন প্রয়োগ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুর প্রস্তুতি ও চাষের সময় পুকুরে চুন প্রয়োগ করা হয়। চুন পানির অম্লত্বকে নিরপেক্ষ করে ফলে পুকুরে দেয়া সার দ্রুত কাজ করে। অনেক সময় চুন প্রয়োগ করলে সার প্রয়োগ না করেই পানিতে যথেষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। চুন প্রয়োগের ফলে মাছের রোগবালাই দূর হয়, বাজে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ হয়। তাই সচেতন মৎস্য চাষি পুকুর প্রস্তুতির সময় এবং শীতের প্রাক্কালে চুন প্রয়োগ করে থাকেন। সাধারণত প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়।

উপকরণ

১. চুন, ২. মাটির চাড়ি বা অর্ধেক কাটা ব্যারেল, ৩. ছোট বালতি, ও ৪. ছোট মগ বা বাটি।

কাজের ধারা

১. চুন প্রয়োগের জন্য আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্দিষ্ট পুকুরের পাড়ে মজুদ রাখি।

২. মাপন ফিতা দিয়ে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিটারে বা ফুটে মাপি এবং নিচের হিসাব অনুযায়ী পুকুরের আয়তন নির্ণয় করি।

দৈর্ঘ্য (মিটার) X প্রস্থ (মিটার) X ৪০.৪৮ = শতাংশ
অথবা, দৈর্ঘ্য (ফুট) X প্রস্থ (ফুট) X ৪৩৫.৬ = শতাংশ

৩. আয়তন অনুযায়ী শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন কাটা ব্যারেলে রাখি। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চুনের মধ্যে পানি ঢালি। চুনে পানি দিলে সহসা গরম হয়ে চুন টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে। এ সময় চুনের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। কারণ যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৪. চুন ঠাণ্ডা হলে ব্যারেলে বেশি করে পানি মেশাই। এবারে তরল চুন বালতিতে নিয়ে বাটির সাহায্যে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেই।

৫. পুকুর শুকনো হলে ব্যারেলের পরিবর্তে সমতল মাটিতে চুন রেখে হালকা করে পানি আগের দিন রাতে ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি। কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চুন ফেটে যাবে এবং সব চুন গুঁড়া পাউডারের মতো হবে। চুন যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলে পরে ঝুড়িতে করে পাড়সহ সারা পুকুরে ছিটিয়ে দেই।

৬. চুন ভেজানোর জন্য প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার না করি।

৭. চুন ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাই। বাতাসের বিপরীতে ছিটালে চোখে মুখে এসে চুন লাগতে পারে। সম্ভব হলে চুন ছিটানোর সময় নাকে মুখে গামছা বেঁধে নিই।

৮. গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

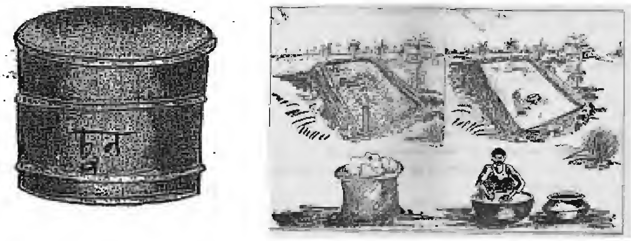

চিত্র-৬২ : পুকুরে চুন প্রয়োগ

জব নং-১১ঃ পুকুরে সার প্রয়োগ :

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিদ্রব্য থাকা আবশ্যক। পুকুরে সার প্রয়োগের দ্বারা পুষ্টির যোগান দেয়া হয়। অজৈব সারের মধ্যে ইউরিয়া অথবা টিএসপি, জৈব সারের মধ্যে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, কম্পোস্ট প্রভৃতি মাছের পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। পুকুর প্রস্তুতির সময় একটু বেশি মাত্রায় এবং পোনা মজুদের পর দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক মাত্রায় মিশ্রসার প্রয়োগে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। পুকুরে সার দিতে হবে কিনা তা বুঝার জন্য সেকিডিস্কের সাহায্য নিতে হবে। সার ব্যবহারের জন্য নিচের ছক অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রতি শতাংশ পুকুরের জন্য সারের মাত্রা

সার	পুকুর প্রস্তুতকালীন মাত্রা	দৈনিক মাত্রা	সাপ্তাহিক
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম	৪-৫ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম	৩ গ্রাম	২০ গ্রাম
গোবর সার অথবা	৫-৭ কেজি	২০০-২৫০ গ্রাম	১.৫-২.০ কেজি
কম্পোস্ট সার	৮-১০ কেজি	৩০০-৪০০ গ্রাম	২.০-২.৫ কেজি

উপকরণ

১. ইউরিয়া
২. টিএসপি
৩. গোবর
৪. পালস্না ও বাটখারা
৫. বালতি বা গামলা
৬. মগ
৭. মাপন ফিতা
৮. সেকিডিস্ক

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ একটি পুকুরের নিকট যাই। সেকিডিস্কের সাহয্যে পুকুরের গভীরতা পরিমাপ করি। সেকিডিস্ক গভীরতা ৩৫ সে.মি. এর বেশি হলেই সার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

২. মাপন ফিতার সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করে জলায়তন নির্ণয় করি।

৩. আয়তন অনুযায়ী ইউরিয়া, টিএসপি ও গোবর সারের পরিমাণ নির্ণয় করি।

৪. টিএসপি এবং গোবর সার একটি গামলা বা বালতিতে ৩-৪ গুণ পানির মধ্যে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখি। অতঃপর প্রয়োগকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইউরিয়া সার মিশিয়ে নেই।

৫. ভেজানো সার একটি কাঠি দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নেই।

৬. সূর্যালোকিত দিনে ১০-১১ টার মধ্যে মিশ্রিত সার সারা পুকুরে ছিটিয়ে দেই।

৭. গৃহীত কার্যক্রম চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং- ১২ : পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নির্ণয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পোনা মজুদের আগে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা হয়। পানির রং সবুজাভ বা বাদামি সবুজ হলে খালি চোখে বুঝা যায় যে, পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা। পানিতে কী পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য আছে তা নিম্নলিখিত পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

১. সেকিডিস্ক ব্যবহার করে : সেকিডিস্ক একটি লোহার থালা যার ব্যাস ২০ সেন্টিমিটার। থালাটি সাদা ও কালো রঙে রং করা এবং একটি সুতা দ্বারা বাঁধা যাতে একে পানিতে ঝুলিয়ে দেয়া যায়। সকাল ১০-১১টায় রৌদ্রময় অবস্থায় সেকিডিস্কটি পানিতে ডুবিয়ে দিতে হবে। এবার উপর হতে দেখার চেষ্টা করতে হবে কখন ডিস্কটি পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। যখন চাকতিটি পানিতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় সেই বিন্দুতে সুতা বরাবর পানির গভীরতা পরিমাপ করা হয়। সেকিডিস্কটির গভীরতা ২৫ সেন্টিমিটার বা তার কম হলে বুঝতে হবে পানিতে অতিরিক্ত খাদ্য আছে। যদি এ গভীরতা ২৬ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয় তবে বুঝতে হবে পানিতে পরিমিত পরিমাণ মাছের খাদ্য আছে। আর যদি এ গভীরতা ৩৫ সেন্টিমিটার এর বেশি হয় তখন বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা কম আছে। তবে পানি কোনো কারণে ঘোলাটে থাকলে সেকিডিস্ক গভীরতা পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা নির্দেশ করে না।

২. হাত ব্যবহার করে : পানিতে হাত ডুবিয়ে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায়। সূর্যালোকিত দিনে সকাল ১০-১১টার দিকে পানিতে হাত আস্তে আস্তে ডুবাতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোথায় যেয়ে হাতের তালু অদৃশ্য হয়। যদি কনুই পর্যন্ত যাওয়ার পর হাতের তালু অদৃশ্য হয় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে পরিমিত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

৩. কাচের গ্লাস ব্যবহার করে : স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পুকুরের পানি নিয়ে সূর্য্যের আলোর দিকে দেখলে গ্লাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

উপকরণ :
১. সেকিডিস্ক
২. মিটার স্কেল
৩. কাচের গ্লাস
৪. গামছা
৫. আতশ কাচ
৬. খাতা, পেন্সিল।

কাজের ধারা

সেকিডিস্ক ব্যবহার করে

১. মাছ চাষ হয় এমন একটি পুকুরের কাছে রৌদ্রময় দিনে সকাল ১০-১১টার মধ্যে যাই।

২. পানি ঘোলা হয়নি এমন স্থানে ধীরে ধীরে উরু সমান পানিতে নামি।

৩. সেকিডিস্ককে আস্তে আস্তে পানিতে ডুবাতে থাকি এবং উপর থেকে দেখতে থাকি কখন চাকতিটি পানির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪. এবারে সেকিডিস্ক বাঁধা সুতা মিটার স্কেল দিয়ে মেপে সেকিডিস্কের গভীরতা নির্ণয় করি।

৫. এভাবে পুকুরের আরও দুইটি স্থানে ঘোলাত্ব এড়িয়ে সেকিডিস্ক গভীরতা নির্ণয় করি।

হাত ব্যবহার করে

১. পুকুরে পানি ঘোলা হয়নি এমন স্থানে রৌদ্রময় দিনে ১০-১১টায় ধীরে ধীরে উরু সমান পানিতে নামি এবং নিজের একটি হাত সোজা করে পানিতে ডুবিয়ে দেই ।

২. এবারে উপর হতে হাতের তালু দেখার চেষ্টা করি। যদি হাতের তালু দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে । পানি ঘোলা হলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।

কাচের গ্লাস ব্যবহার করে

১. একটি গামছা দুইজনে কিছুদূর পানির মধ্যে টানি। মাছ ধরার মতো করে পানি আস্তে আস্তে কমাই।

২. এবারে গামছার মধ্য থেকে স্বচ্ছ গ্লাসে এক গ্লাস পানি নেই।

৩. এবারে গ্লাসটি সূর্যের আলোর দিকে ধরি এবং পানির মধ্যে ভাসমান খাদ্যকণা দেখার চেষ্টা করি।

৪. যদি গ্লাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুজির মত খাদ্যকণা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে গ্লাসের পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। খাদ্যকণাগুলো বড় দেখার জন্য আঁতশ কাচের সাহায্যে নেয়া যেতে পারে।

৫. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

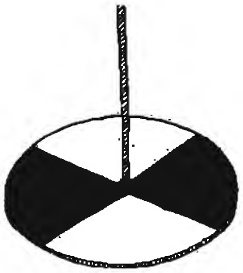

চিত্র-৬৩ : সেকিডিস্কের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

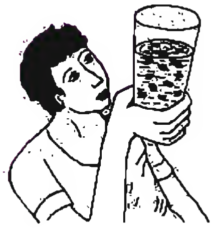

চিত্র-৬৪ : কাচের গ্লাসের মাধ্যেমে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

চিত্র-৬৫ : হাতের সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

জব নং-১৩ : সুস্থ ও সবল পোনা নির্বাচন কৌশল ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরে মাছ চাষের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সুস্থ ও সবল পোনা মজুদের ওপর। পোনা ব্যবসায়ী দূরদূরান্ত থেকে পাতিলে করে মাছের পোনা নিয়ে আসে। অনেক সময় এসব পোনা দুর্বল, রোগাক্রান্ত ও সঠিক আকারের হয় না। এ জন্য পোনা ক্রয়ের আগে একটি সাদা গামলায় কিছু পোনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভালো পোনা চঞ্চল, লাফালাফি করবে। পোনার গায়ের রং ঝকঝকে উজ্জ্বল হবে। আঁইশ স্বাভাবিক থাকবে, গায়ে কোনো দাগ থাকবে না, পাখনা অক্ষত থাকবে। ভাল পোনা হাত দিয়ে ধরলে শরীর পিচ্ছিল মনে হবে। সাধারণত ৮-১০ সে.মি. আকারের পোনা পুকুরে মজুদের জন্য ভালো। এ আকারের পোনাকে আঙ্গুলে পোনা বলে।

উপকরণ

১. মাছের পোনা

২. সাদা গামলা

৩. স্কেল

৪. আতশ কাচ

৫. খাতা ও পেন্সিল

কাজের ধারা

১. পূর্বে থেকে একজন পোনা ব্যবসায়ীকে ঠিক করে রাখি যাতে অনুশীলনের সময় পোনা নিয়ে আসে।

২. একটা বড় সাদা গামলায় কতগুলো পোনা পাতিল থেকে নেই।

৩. হাতের আঙ্গুল দিয়ে পোনার আকার ৮-১০ সে.মি. কিনা অনুমান করি। স্কেল ব্যবহার করে ২-১টা পোনার সঠিক আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হই।

৪. মাছের পোনা লাফালাফি করে কিনা এবং যথেষ্ট প্রাণশক্তি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করি।

৫. পোনার গায়ের রং স্বাভাবিক উজ্জ্বল কিনা, আঁইশ উঠা কিনা বা শরীরে কোনো দাগ আছে কিনা তা আঁতশ কাচ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি।

৬. পোনার পাখনা অক্ষত কিনা, কোনটা ভাঙা, ছেড়া কিনা আঁতশ কাঁচ দিয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য করি।

৭. পোনার গা পিচ্ছিল কিনা অর্থাৎ গায়ে শ্লেষ্মা আছে কিনা অথবা খসখসে কিনা হাত দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি।

৮. প্রতিটি পোনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, হৃষ্টপুষ্ট আছে না রোগাক্রান্ত, দুর্বল বা চিকন তা লক্ষ্য করি।

৯. গৃহীত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং - ১৪ : পোনা পরিবহন ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

দূরদূরান্ত হতে মাছের পোনা জীবন্ত পরিবহন বা স্থানান্তর করা হয়। এরকম স্থানান্তর বা পরিবহনের সময় পোনা মাছ যথেষ্ট ধকলের সম্মুখীন হয়। পোনা ওয়ালাদের কাছ থেকে পুকুরে মজুদের জন্য পোনা ক্রয় করা হয়। তবে কেহ কেহ নিকটস্থ সরকারি বা বেসরকারি পোনা উৎপাদন খামার হতে সরাসরি পোনা ক্রয় করে পুকুরে মজুদ করে থাকে। পোনা উৎপাদন খামার হতে অক্সিজেন দিয়ে পলিথিন ব্যাগে পোনা সরবরাহ করা হয়। পোনা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে মজুদের জন্য নির্বাচিত পোনা পুকুরে ছাড়ার আগে অভ্যস্থকরণ এবং শোধন করে পুকুরে ছাড়া হয়। পক্ষান্তরে পুকুরের মালিক পোনা উৎপাদন খামার থেকে মজুদের জন্য পোনা সংগ্রহ করলে পোনা উৎপাদন খামারেই পোনা শোধন করে পরে পরিবহন করা হয়।

উপকরণ

১. মাছের পোনাসহ পোনা বিক্রেতা
২. থার্মোমিটার
৩. মাঝারি বালতি
৪. লবণ বা পটাশ
৫. হাত জাল।

কাজের ধারা

১. হাঁড়িতে করে আনা পোনা পুকুর পাড়ে ছায়ায় বা ঠাণ্ডা স্থানে রাখি, থার্মোমিটার দিয়ে হাড়ির পানির তাপমাত্রা মাপি। ঐ সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা মেপে দেখি।
২. হাঁড়ির পানির এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি হলে ধীর ধীরে পুকুরের পানি হাড়ির পানিতে মিশাই এবং ১৫-২০ মিনিটি অপেক্ষা করি।
৩. প্রথমে হাড়ি হতে এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ (২০%) পানি ঢেলে ফেলি এবং পুকুরের পানি দিয়ে হাঁড়ি পূর্ণ করে দেই এবং ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করি। মাছের হাঁড়ির পানি পুকুরের মধ্যে না ফেলি।
৪. এভাবে ২০% পানি পরিবর্তনের ফলে যখন হাঁড়ির পানির তাপমাত্রা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হয় তখন পোনা পুকুরে ছাড়তে হবে। তবে পোনা ছাড়ার আগে শোধন করা ভালো।
৫. অক্সিজেন সমৃদ্ধ পলিথিন ব্যাগে পরিবহনকৃত পোনা কিছুক্ষণ পুকুরের পানিতে রেখে উভয় তাপমাত্রা সমান হলে ব্যাগের মুখ খুলে আস্তে আস্তে পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

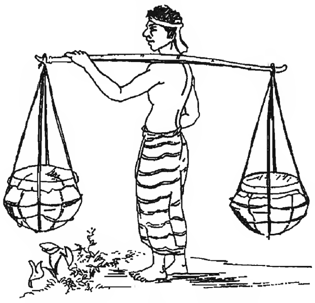

চিত্র-৬৬ : পোনা পরিবহন

জব নং-১৫ : পোনা টেকসইকরণ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পোনার দৈর্ঘ্য ৭-১০ সে.মি. হলেই এদের বিক্রি শুরু হয়। লালন পুকুর হতে দূরদূরান্তে ছোট পোনা পরিবহনের আগে পরিবহনকালীন ধকল সহ্যের জন্য টেকসই করে নিতে হবে। পুকুরে জাল টেনে পোনাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে পানির ঝাঁপটা দিয়ে পোনাকে টেকসই করা হয়। টেকসই করা পোনা দূর দূরান্তে পরিবহন করা সহজ।

কাজের ধারা

১. পোনা ধরার জন্য চট জাল বা গুজরী জাল নিয়ে নার্সারি পুকুরে যাই।

২. জাল টেনে সব পোনা এক জায়গায় এনে আস্তে আস্তে পানির ঝাঁপটা মারতে থাকি।

৩. ঘণ্টা খানেক ধরে এভাবে পানির ঝাঁপটা দিয়ে স্রোত সৃষ্টি করি।

৪. পরপর দুই দিন এভাবে জাল টেনে পোনা একত্রিত করে পানির ঝাঁপটা দিয়ে কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করি।

৫. স্রোতের বিপরীতে আসা পোনা গুলো যথেষ্ট টেকসই বলে ধরে নেওয়া হয়।

৬. এভাবে টেকসই করা পোনা দূরদূরান্তে পরিবহনের জন্য উপযুক্ত হয়।

৭. কাজ শেষে চট জাল, বালতি ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখে দেই।

৮. গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-১৬ : পোনা শোধন অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরে পোনা ছাড়ার আগে পোনাকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য শোধন করে নেয়া দরকার। একটি পাত্রে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশাতে হবে। এবারে হাত জালে বা মশারির কাপড়ের মধ্যে ৩০০-৪০০ পোনা নিয়ে ঐ মিশ্রণে আধা মিনিট গোসল করিয়ে পুকুরে ছাড়া যায়। মশারি বা হাতজালের অনুপস্থিতে পাতলা গামছা ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাজের ধারা

১. একটি বালতির মধ্যে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পরিমাণ পটাশ (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশাই ।

২. এবার অভ্যস্তকরণকৃত পোনা হতে হাত জাল দিয়ে পোনা উঠিয়ে বালতির মিশ্রণে ৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে পুকুরে ছাড়ি। প্রজাতি অনুযায়ী পোনা গণনার কাজ এ সময় করে নিই ।

৩. ৩০০-৫০০টি পোনা শোধনের পর আরেক বালতি মিশ্রণ তৈরি করি এবং আরও পোনা শোধন করে পুকুরে মজুদ করি ।

৪. পুকুরে পোনা মজুদের কাজটি মৃদু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সম্পন্ন করি। এজন্য সকালে পোনা ছাড়া সবচেয়ে ভাল। তবে বিকালেও ছাড়া যেতে পারে। মেঘলা দিনে বা ভ্যাপসা গরমের সময় পোনা ছাড়া উচিত নয়।

৫. পুকুরে পোনা ছাড়ার ৬-১২ ঘন্টা পর পাড়ের কাছে যেয়ে পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি। মৃত পোনা পাড়ের কাছে ভেসে থাকতে দেখা যাবে। বেশি পোনা মারা গেলে সমসংখ্যক পোনা আবার পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করি ।

৬. গৃহীত কার্যপ্রণালি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

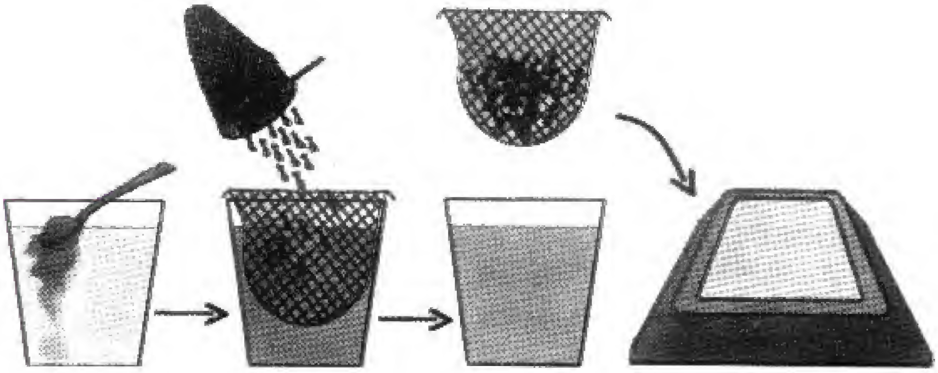

চিত্র-৬৭ : পোনা শোধন

জব নং- ১৭ : পুকুরে পোনা মজুদ কৌশল অনুশীলন ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

দূরদূরান্তে মাছের পোনা জীবন্ত পরিবহন বা স্থানান্তর করা হয়। এরকম স্থানান্তর বা পরিবহনের সময় পোনা যথেষ্ট ধকলের সম্মুখীন হয়। পোনা মাছ সাধারণত পাতিল বা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করা হয়। পোনা পরিবহনের পর পরই যদি পুকুরের পানিতে সরাসরি ঢেলে দেয়া হয় তাহলে অনেক পোনা মারা যাবে। তাই মজুদকৃত পোনার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য পুকুর পাড়ে এনে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে অভ্যস্ত করে পুকুরে ছাড়া হয়।

কাজের ধারা

১. পাতিল বা ব্যাগে করে আনা পোনা ছায়ায় বা ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হবে।
২. থার্মোমিটার দিয়ে পাতিলের বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের তাপমাত্রা মেপে নিতে হবে।
৩. উভয় পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি হলে ধীরে ধীরে পুকুরের পানি নিয়ে পাতিলের পানিতে মিশাতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।
৪. এবার পাতিল থেকে এক-পঞ্চমাংশ পানি (২০%) ফেলে দিয়ে পুকুরের পানি নিয়ে পাতিল পূর্ণ করতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
৫. এভাবে ২০% হারে পানি পরিবর্তনের ফলে পানির তাপমাত্রা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হলে ব্যাগের মুখ পুকুরের পানিতে কাত করে ধরে ব্যাগের ভিতর হাত দিয়ে পানির স্রোত দিতে হবে।
৬. স্রোতের বিপরীতে পোনাগুলো পাতিল থেকে বের হয়ে পুকুরে চলে যাবে।
৭. এবার হাঁড়ি বা পাতিল দিয়ে পানিতে ঢেউ দিতে হবে ফলে পোনাগুলো সারা পুকুরে ছড়িয়ে পড়বে।
৮. মেঘলা দিনে বা প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পুকুরে পোনা ছাড়া যাবে না।
৯. সকাল অথবা বিকেল বেলায় পোনা ছাড়া ভালো।
১০. পুরা কার্যক্রমটি ধৈর্য সহকারে করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

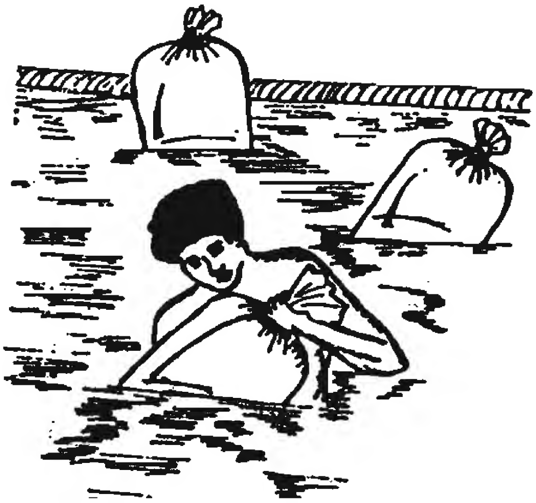

চিত্র-৬৮ : পোনা মজুদ

জব নং- ১৮ : মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিকরণ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন খাদ্য মাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের খাদ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। তাই আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়ার জন্য মাছকে সম্পূরক খাদ্য দেয়া হয়। সম্পূরক খাদ্য দুই প্রকার, যথা-

১. প্রাকৃতিক সম্পূরক খাদ্য : চাল, গম, ডাল এদের কুড়া বা ভুসি, খৈল, সবুজ ঘাস, পাতা, ক্ষুদিপানা, শামুক, ঝিনুক, পশুর রক্ত, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি।

২. তৈরি সম্পূরক খাদ্য : বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও কিছু কিছু রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণে যান্ত্রিকভাবে এ খাদ্য তৈরি করা হয়। যেমন- ফিশমিল, ব্লাডমিল, খৈল, কুঁড়া, ভুসি ইত্যাদি মিশিয়ে বল বা পিলেট আকারে এ খাদ্য তৈরি করা হয়।

উপকরণ

১. চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, ফিশমিল ইত্যাদি
২. প্লাস্টিকের গামলা ২টি, মগ ১টি
৩. ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা।

কাজের ধারা

১. এক কেজি খাদ্য তৈরি করার জন্য ৪০০ গ্রাম চালের কুঁড়া, ২০০ গ্রাম গমের ভুসি, ২৫০ গ্রাম সরিষার খৈল ও ১৫০ গ্রাম ফিশমিল ওজন করে পৃথক করে রাখি।
২. সরিষার খৈল দ্বিগুণ পরিমাণ পানিতে একটা গামলায় ১০-১২ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখি।
৩. এবারে ভেজা খৈল ও ফিশমিলের সাথে কুঁড়া ও ভুসি মিশিয়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেশাই।
৪. মিশ্রিত খাদ্যের মণ্ড দ্বারা ছোট ছোট বল আকৃতির বানাই। এসব বল খাদ্যদানি বা ফিডিং ট্রেতে করে পুকুরে প্রয়োগ করি। অতিরিক্ত পরিমাণ বল আকৃতির খাদ্য রোদে শুকিয়ে ৭ দিন পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য রেখে দেই।
৫. গৃহীত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখে রাখি।

চিত্র-৬৯ : মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিকরণ

জব নং-১৯ : ফিডিং ট্রে বা খাদ্যদানি তৈরি এবং এর ব্যবহার।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের জন্য ফিডিং ট্রে ব্যবহার করা হয়। এটি বর্গাকার একটি ছোট চালুনির মতো। ১ মিটার x ১ মিটার আকারের কাঠ বা বাঁশের ফ্রেমে মশারির জাল লাগিয়ে এটি তৈরি করা হয়। একটি বাঁশের আগায় ট্রে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ৩০ শতাংশ পুকুরের জন্য ২টি ফিডিং ট্রে ব্যবহার করা হয়। ট্রেতে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্যের অপচয় কম হয় ফলে চাষির খরচ বাঁচে। তবে বানিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োজ্য নয়।

উপকরণ

১. ১ মিটার x ১ মিটার কাঠের টুকরা ৪টা
২. নাইলনের মশারির জাল ১ বর্গ মিটার
৩. লোহার পেরেক ১" এবং ১/২" আকারের পরিমাণ মতো ও ছোট হাতুড়ি
৪. ট্রে ঝুলানোর জন্য নাইলনের রশি
৫. চিকন বাঁশের আগা ১ টুকরা
৬. বাঁশের খুঁটি ৪-৫ হাত লম্বা ১ টা
৭. পূর্বে তৈরি করা কিছু খাদ্য।

কাজের ধারা

১. প্রথমে চওড়া কাঠের টুকরা চারটাকে পেরেক ঠুকে বর্গাকৃতির ফ্রেম তৈরি করি ।
২. মশারির কাপড়কে টাইট করে ফ্রেমের সাথে আটকানোর ব্যবস্থা করি। পাতলা কাঠের টুকরা দিয়ে আটকানো মশারির কাপড়কে আরও মজবুত করে আটকাই।
৩. এভাবে তৈরিকৃত চালুনির মতো খাদ্যদানিকে চার কোনায় রশি বেঁধে বাঁশের আগার সাথে বাঁধি। পানিতে সহজে ডুবার পর খাদ্যদানির চার কোনায় ছোট ছোট ইটের টুকরা বেঁধে দিই।
৪. এবারে পুকুরের পাড়ে একটি খুঁটি পুঁতে খাদ্যদানির বাঁশ এমনভাবে বাঁধি যাতে বাঁশটি ঘুরিয়ে খাদ্যদানি পুকুরের মধ্যে ১.০-১.৫ মিটার গভীরে স্থাপন করা যায়।
৫. এবারে পূর্বে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক খাদ্যের বল খাদ্যদানীতে দিয়ে বাঁশের হাতল ঘুরিয়ে খাদ্যদানি পুকুরের ভিতরে ১ মিটার গভীরে বা তলদেশের ৩০-৪০ সে.মি. উপরে স্থাপন করি।
৬. এবার গৃহীত পদক্ষেপগুলো চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

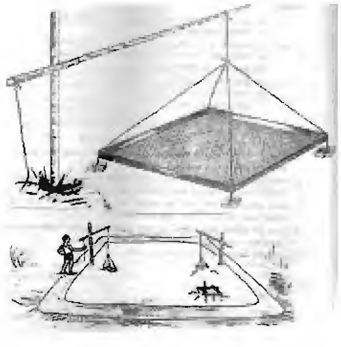

চিত্র-৭০ : ফিডিং ট্রে বা খাদ্যদানি

জব নং-২০ : হড়রা তৈরি এবং তা টেনে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূরীকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

হড়রা হচ্ছে লম্বা মোটা দড়িতে মাটি বা সিমেন্টের তৈরি ১০০-১৫০ গ্রামের ওজনের কাঠি দ্বারা প্রস্তুতকৃত মালা বিশেষ। অনেক সময় মাছ চাষের পুকুরে সার, খাদ্য ও গোবর ইত্যাদি পচে গিয়ে তলদেশে অ্যামোনিয়া, মিথেন প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে। পুকুরের তলদেশের এসব গ্যাস দূর করার জন্য পুকুরে হড়রা টানা হয়।

কাজের ধারা

১. পুকুরের প্রস্থ অনুযায়ী লম্বা মোটা রশি নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করে পোড়ামাটির কাঠি গুলো সুতা দ্বারা বেঁধে দিতে হবে।

২. পুকুরের দৈর্ঘ্য বরাবর হড়রাকে দু'পাশ থেকে পাড় বরাবর ধীরে ধীরে টানতে হবে।

৩. এ কার্যক্রমটি একাধিকবার করতে হবে।

৪. হড়রা সাধারণত সকাল বেলায় টানা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে পুকুরে যখন অক্সিজেন স্বল্পতায় মাছ ভেসে ওঠে তখন অথবা খুব ভোরে হড়রা না টানাই ভালো। সূর্য উঠলে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাছ স্বাভাবিক হলে তখন হড়রা টানা যেতে পারে।

৫. পুরাতন পুকুরে সপ্তাহে একবার করে হড়রা টানা উচিত।

৬. হড়রা টানার পর হড়রা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখে দিতে হবে।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় ধারাবহিকভাবে লিখে রাখতে হবে।

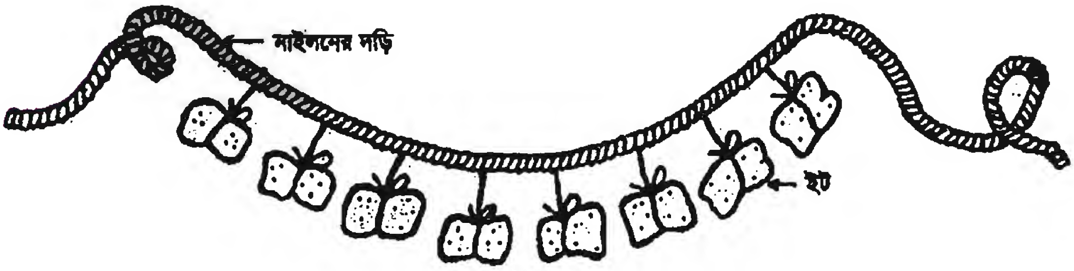

চিত্র-৭১ : হড়রা তৈরি

জব নং- ২১ : রোগাক্রান্ত মাছ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অন্যান্য জীবের মতো মাছেরও রোগবালাই হয়। দূষিত পানি, অক্সিজেনের অভাব, পুষ্টিহীনতা, পরজীবীর সংক্রমণ প্রভৃতি কারণে মাছের রোগ বালাই হয়ে থাকে। মাছের রোগ হলে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখে রোগ শনাক্ত করা যায়।

কাজের ধারা

১. একটি রোগাক্রান্ত মাছ সংগ্রহ করি।

২. অতি সাবধানতার সাথে আতশি কাচ দিয়ে মাছের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পরীক্ষা করি।

৩. লক্ষণগুলো বইয়ের সাথে মিলিয়ে খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

৪. রোগাক্রান্ত মাছ চাষকৃত মাছের পুকুরে ফেলা ঠিক হবে না।

৫. ব্যবহারিক কাজ শেষে রোগাক্রান্ত মাছকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

৬. অনুশীলন শেষ হলে হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

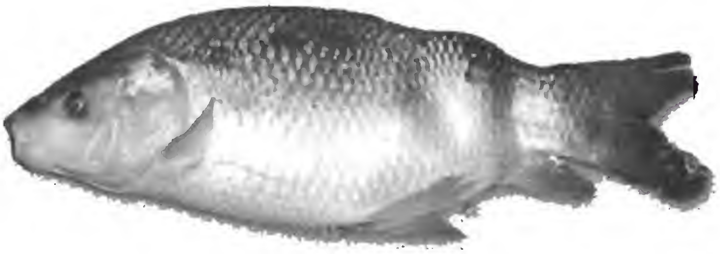

চিত্র-৭২ : রোগে আক্রান্ত মাছ

জব নং- ২২ : মাছের নমুনা সংগ্রহ ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছ হলো পানিগর্ভে লালিত-পালিত বা পানির নিচের ফসল। পানির অভ্যন্তরেই এর জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। তাই নিয়মিত নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমেই মাছের বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার, রোগ-বালাই প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এক মাস অন্তর অন্তর নমুনা সংগ্রহ করে বৃদ্ধির হার অনুমান করা হয়। সাধারণত ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে মজুদকৃত মাছের ৫-১০% সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত মাছের সংখ্যা ও ওজন হিসেব করে প্রতিটি মাছের গড় ওজন বের করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত মাছের গড় ওজন দ্বারা মোট মজুদকৃত পোনার সংখ্যা দ্বারা গুণ করে পুকুরে মোট মাছের ওজন বা জীবভর জানা যায়। পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগ করা যায়।

উপকরণ

১. ঝাঁকি জাল
২. একটি বড় হাড়ি বা হাপা
৩. স্প্রিং ব্যালেন্স
৪. ক্যালকুলেটর
৫. পুকুরের রেকর্ড বই।

কাজের ধারা

১. ঝাঁকি জাল দিয়ে পুকুরের বিভিন্ন স্থান থেকে মাছ ধরে গুণে গুণে পরিষ্কার পানিতে বড় হাঁড়ির মধ্যে অথবা হাপায় রাখি। বড় মাছ হলে (৩০০ গ্রামের চেয়ে বড়) মোট মজুদ মাছের ৫% আর মাছ ছোট থাকলে ১০% মাছ সংগ্রহ করি ।

২. এভাবে সংগৃহীত মাছ মশারির জাল দ্বারা তৈরি ছোট থলেতে করে দ্রুত স্প্রিং ব্যালেন্স দ্বারা ওজন করে খাতায় লিখে রাখি ।

৩. এবারে মোট মাছের ওজনকে মাছের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি। ধরি পুকুরে ৭৫০টি পোনা মজুদ করা হয়েছিল। নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে ৭৬টি মাছ। ওজন করে দেখা গেল মোট ১১ কেজি ৪০০ গ্রাম অতএব ১১.৪০০/৭৬ = ০.১৫ কেজি বা ১৫০ গ্রাম গড় ওজন।

৪. ৮০% বেঁচে থাকার হার ধরে পুকুরে এ সময়ের অনুমানকৃত মাছের মোট ওজন হবে

$$\frac{৭৫০X৮০}{১০০} = ৬০০\text{টি মাছ}$$

$$৬০০X০.১৫ = ৯০ \text{ কেজি মাছ আছে।}$$

৫. পুকুরের রেকর্ড বইতে তারিখসহ নমুনা সংগ্রহের তথ্য বিস্তারিত লিখে রাখি।

৬. গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

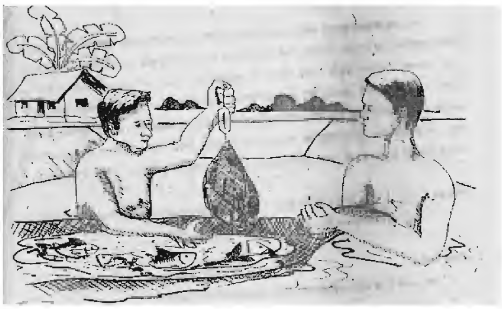

চিত্র-৭৩ : মাছের নমুনা সংগ্রহ

জব নং-২৩ : আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছচাষ লাভজনকভাবে করতে হলে আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ কৌশল অবলম্বন করা দরকার। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে প্রথম কয়েক মাসে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সিলভার কার্প, কাতলা, গ্রাসকার্প প্রভৃতি। ভালো বাজার মূল্য থাকলে ৫০০-৬০০ গ্রাম ওজনের সিলভার কার্প ও কাতলা, ৩০০-৪০০ গ্রাম ওজনের রুই ও মৃগেল আহরণ করে বিক্রি করা ভালো। সাথে সাথে সমান সংখ্যক পোনা মজুদ করতে হবে। যাতে পুকুরের উৎপাদনশীলতার সদ্ব্যবহার হয়। এছাড়া বড় মাছ থাকলে পুকুর থেকে চুরি হয়ে যেতে পারে বা বর্ষাকালে বন্যায় ভেসে যেতে পারে। আংশিক আহরণের আগে অবশ্যই বাজার দর বা ক্রেতা, জাল ও জেলে এবং পুনঃমজুদের জন্য পোনা ঠিক করে নিতে হবে।

উপকরণ

১. বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল;
২. মাছ মাপার জন্য স্প্রিং ব্যালেন্স বা দাড়িপাল্লা;
৩. মাছ রাখার জন্য ঝুড়ি ও
৪. খাতা ও পেন্সিল।

কাজের ধারা

১. বেড় জাল দিয়ে সারা পুকুরে মাছ টেনে এক জায়গায় নিয়ে আসি।
২. খুব সাবধানে বড় বড় মাছ বাছাই করে প্রজাতি অনুযায়ী গুণে গুণে মাছ ধরার পাত্রে রাখি।
৩. বাকি মাছ কোনোভাবে যেন ধকল না পায় তাই আলতোভাবে ছেড়ে দেই।
৪. আহরণকৃত মাছের ওজন, দাম, জেলের পারিশ্রমিক ইত্যাদি রেকর্ড বইতে লিখে রাখি।
৫. সম্ভব হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রজাতি অনুযায়ী ধরে নেওয়া মাছের সম সংখ্যক বড় আকারের পোনা মজুদের ব্যবস্থা করি। পুনঃমজুদের সময়ের মোট সংখ্যার ১০% এর বেশি পোনা মজুদ করতে হবে।
৬. গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রতিবেদন ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

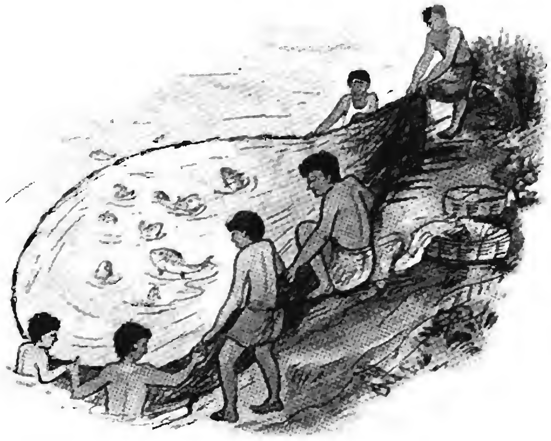

চিত্র-৭৪ : বেড় জাল দিয়ে মাছ আহরণের দৃশ্য

জব নং-২৪ : মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

সব ব্যবসার মতো মাছ চাষও একটি ব্যবসা। তাই বছর শেষে হিসেব করে দেখতে হবে লাভ ক্ষতির পরিমাণ। এজন্য মাছ চাষ শুরুর প্রথম থেকেই খরচের হিসাব রাখা দরকার। আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্যই হলো লাভ বা ক্ষতি।

কাজের ধারা

১. পুকুর প্রস্তুতির প্রথম থেকেই নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক খরচের হিসাব রেকর্ড বইয়ে লিখে রাখতে হবে :

তারিখ	উপকরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা	মন্তব্য
			সর্বমোট		

২. এবার পুকুরের বিভিন্ন উৎস থেকে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক আয়ের হিসাব রাখতে হবে

তারিখ	উপকরণ	পরিমাণ	দর	মোট টাকা	মন্তব্য
			সর্বমোট		

৩. এবার আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করে লভ্যাংশ বের করতে হবে।

৪. ক্ষতি হলে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং- ১

২য় পত্র

দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়

মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনা

এক লিঙ্গ বিশিষ্ট পুরুষ তেলাপিয়াকে সাধারণত মনোসেক্স তেলাপিয়া বলে। তবে মনোসেক্স তেলাপিয়া পুরুষ বা স্ত্রী যেকোনো লিঙ্গেরই হতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি হলো যেখানে পুরুষ কিংবা স্ত্রী যেকোনো এক লিঙ্গের তেলাপিয়া চাষ করা হয়। লিঙ্গ বাছাই (সেক্সিং) ব্যবস্থা বাহ্যিকভাবে পৃথক করার মাধ্যমে করা যেতে পারে। আবার হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমেও করা যেতে পারে। লিঙ্গ বাছাই এবং হরমোন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ায় আমাদের দেশে এ দুটো পদ্ধতিই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিচে উভয় প্রকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের গুরুত্ব

তেলাপিয়া মাছ ঘন ঘন পোনা দেয় তাই তেলাপিয়াকে Prolific Breeder বলা হয়। অর্থাৎ এরা বছরে একাধিকবার প্রজননে সক্ষম। এমনকি একটি পূর্ণবয়স্ক তেলাপিয়া বছরে ৩ বারেরও অধিক প্রজনন করে থাকে। ফলে চাষকৃত পুকুরে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটতে থাকে। নিজেদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কারণে এদের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার পোনা দেয়ার কারণে রেণু উৎপাদন থেকে শুরু করে পোনাকে লালন-পালনে স্ত্রী তেলাপিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি যতদিন পর্যন্ত পোনাগুলো বাইরের পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে না পারবে (কমপক্ষে ১২ দিন) ততদিন পর্যন্ত মা তেলাপিয়া তার পোনাগুলোকে মুখের ভিতর আগলিয়ে রাখে। এ সময় মা তেলাপিয়া বাহির থেকে কোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না। এসব কারণে স্ত্রী তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার পুরুষ তেলাপিয়ার চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ স্ত্রী তেলাপিয়ার চেয়ে পুরুষ তেলাপিয়া অনেক দ্রুত বাড়ে। তাই চাষের ক্ষেত্রে এই অনাকাঙ্খিত প্রজনন ঠেকানোর জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ তেলাপিয়া একসঙ্গে চাষ না করে শুধুমাত্র মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়া চাষ করা যেতে পারে। আবার তেলাপিয়ার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিক প্রজনন সবচেয়ে বড় সমস্যা বিধায় তেলাপিয়া যেন স্বাভাবিকভাবে প্রজনন করতে না পারে সেইজন্য এদের ট্রিপ্লয়েড তেলাপিয়ায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ট্রিপ্লয়েড মাছ বন্ধা হওয়ার কারণে জনন কোষের বিভাজন তথা প্রজনন সংশ্লিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কাজে তাদের শক্তি ব্যয় করতে হয় না, ফলে স্বাভাবিক তেলাপিয়ার চেয়ে বন্ধা তেলাপিয়ার উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। তাই সাধারণ তেলাপিয়া চাষ না করে একলিঙ্গ পুরুষ (Monosex male) তেলাপিয়া চাষ করলে একই সময়ে একই ব্যবস্থাপনায় অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

কোন তেলাপিয়াকে মনোসেক্স তেলাপিয়ায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে?

তেলাপিয়া জাতের মোট ৩টি প্রজাতি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে। যেমন-তেলাপিয়া মোজাম্বিকা (*Oreochromis mossambicus*), নাইলোটিকা (*O.niloticus*) এবং লাল তেলাপিয়া (Tilapia nile)। অতি প্রজননক্ষম, স্বল্প উৎপাদনশীল, ছাই রঙের বিধায় তেলাপিয়া মোজাম্বিয়া মৎস্য চাষির কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। অপর পক্ষে নাইলোটিকা এবং লাল তেলাপিয়া তুলনামূলক কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পেলেও লাল তেলাপিয়ার প্রত্যেক প্রজন্মে কিছু মাত্রায় কাল দাগযুক্ত মাছ জন্মায় বলে এটা ততটা বাজার দখল করতে পারেনি। তাই ১৯94 সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ফিলিপাইন থেকে নাইলোটিকার GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) জাত আমদানি করে নির্বাচিত প্রজনন ও জেনিটিক গবেষণার মাধ্যমে অধিক উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যার নাম দিয়েছেন BFRI-

GIFT জাত। এ জাত অন্যান্য তেলাপিয়ার চেয়ে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বেশি উৎপাদনশীল বলে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এ BFRI-GIFT জাতকে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়ায় রূপান্তরিত করলে স্বাভাবিক তেলাপিয়ার চেয়ে উৎপাদন অনেকগুণে বেড়ে যায়। এ লক্ষ্যে লিঙ্গ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নিচে দেয়া হলো-

ক. বাছাই -এর মাধ্যমে লিঙ্গ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া : এ প্রক্রিয়ায় বাহ্যিকভাবে জনন অঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে পৃথক পৃথকভাবে শনাক্ত ও পৃথক করে পুরুষ কিংবা স্ত্রী মাছকে আলাদাভাবে চাষ করা হয়। এভাবে স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে আলাদাভাবে পৃথক পৃথক পুকুরে চাষ করলে যৌনমিলনের সুযোগ না থাকায় পোনা উৎপাদিত হয় না। ফলে পুকুরে মজুদকৃত মাছের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে এবং উৎপাদন আশানুরূপ হয়। তবে বাছাই পদ্ধতিতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে চোখে দেখে পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজাতি আলাদা করা হয় এবং আলাদাভাবে চাষ করা হয় তাই দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হলে এ পদ্ধতি তত বেশি ফলপ্রসূ নাও হতে পারে।

বাছাই করার সময় ও পদ্ধতি : সাধারণত প্রতিটি মাছের ওজন যখন ৩৫-৪০ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য ৭-৯ সেন্টিমিটার হবে তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তেলাপিয়ার পুরুষ এবং স্ত্রী মাছকে পার্থক্য করা যায়। কারণ এ সময় তেলাপিয়ার জনন অঙ্গের পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সময় মাছের লিঙ্গ অনুযায়ী বাছাই ও পৃথককরণের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। তবে বাছাই এর ক্ষেত্রে এ পৃথকীকরণ যত কম বয়সে করা যাবে এ পদ্ধতিতে চাষের সফলতা ততই বৃদ্ধি পাবে।

স্ত্রী এবং পুরুষ তেলাপিয়ার শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য

পুরুষ তেলাপিয়া		স্ত্রী তেলাপিয়া
পরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় ২ ছিদ্র বিশিষ্ট, সাদা ও লম্বাটে ।	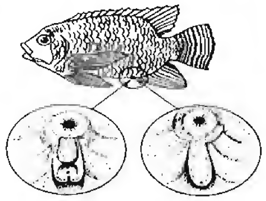	স্ত্রী মাছের জননেন্দ্রিয় ৩ ছিদ্র বিশিষ্ট খাটো ও লালচে রঙের ।
প্রজননকালে এ ক্ষেত্রে গলার অংশের বর্ণ লালচে দেখায় ।		এ ক্ষেত্রে ততটা লালচে বর্ণ দেখা যায়না, কিছুটা হলদেটে ভাব দেখায় ।

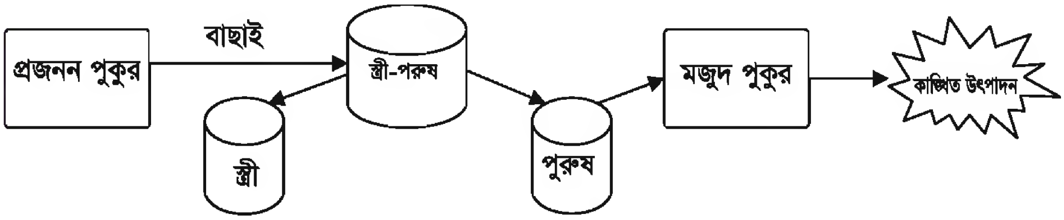

চিত্র-১ : বাহ্যিকভাবে বাছাই-এর মাধ্যমে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া

সীমাবদ্ধতা

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশব অবস্থায় স্ত্রী এবং পুরুষ মাছ পৃথক ভাবে শনাক্ত করা যায় না,
- চাহিদা অনুসারে এক লিঙ্গ বিশিষ্ট মাছের পোনা সংগ্রহ করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও ততটা লাভজনক নয়।

খ. হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি : এ পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বের উন্নততর প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট আকারের নাইলোটিকার পোনাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খাদ্যের সাথে সেক্স হরমোন খাওয়ানো হয়। এতে ৯০-৯৫ শতাংশ এক লিঙ্গের মাছ পাওয়া যায়।

হরমোন নির্বাচন : এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে হরমোন নির্বাচনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে একাধিক সেক্স হরমোন কিনতে পাওয়া যায়। যেমন- স্ত্রী মাছকে পুরুষ মাছে রূপান্তরিত করার জন্য পুরুষ সেক্স হরমোন টেসটোস্টেরন (Testosterone) এবং পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত করার জন্য স্ত্রী সেক্স হরমোন ইস্ট্রোজেন (Estrogen)। চাষকৃত মাছকে কোনো লিঙ্গে রূপান্তরিত করা হবে তা ঠিক করে নিয়ে তার জন্য কোন হরমোন প্রয়োগ করতে হবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু পুরুষ তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার দ্রুত তাই এ ক্ষেত্রে পুরুষ সেক্স হরমোন নির্বাচন করতে হবে।

তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে সেক্স হরমোন নির্বাচন : প্রায় সব প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রেই একই ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করার পরেও শুধুমাত্র লিঙ্গভেদের কারণে স্ত্রী এবং পুরুষ মাছ সমহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যেমন- রাজপুঁটির ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ মাছের চেয়ে স্ত্রী মাছ দ্রুত বাড়ে। এটা পরীক্ষিত যে একই সময়ে একই ব্যবস্থাপনায় পুরুষ মাছ ১০০ গ্রাম হলে স্ত্রী মাছ ১২৫ গ্রাম হয়ে থাকে। অপরপক্ষে তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ স্ত্রী তেলাপিয়ার চেয়ে পুরুষ তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। তাই এ ক্ষেত্রে পুরুষ তেলাপিয়ার উৎপাদন বেশি বলে পুরুষ সেক্স হরমোন নির্বাচন করাই শ্রেয়।

সেক্স হরমোন প্রয়োগ : মাছের রেণুফোটার পরবর্তী ১-২ সপ্তাহের মধ্যেই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় সৃষ্টির মাধ্যমে তেলাপিয়ার পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গ চিহ্নিত হয়। এই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় সৃষ্টির আগে থেকে ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষ হরমোন প্রয়োগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়ে থাকে। তাই ডিম থেকে নাইলোটিকার পোনা ফুটে বের হবার ২-৩ দিন পর যখন স্বাভাবিকভাবে এরা খাবার খেতে শেখে কিংবা ০.৮-১.১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হবে তখন পোনাকে প্রজনন পুকুর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

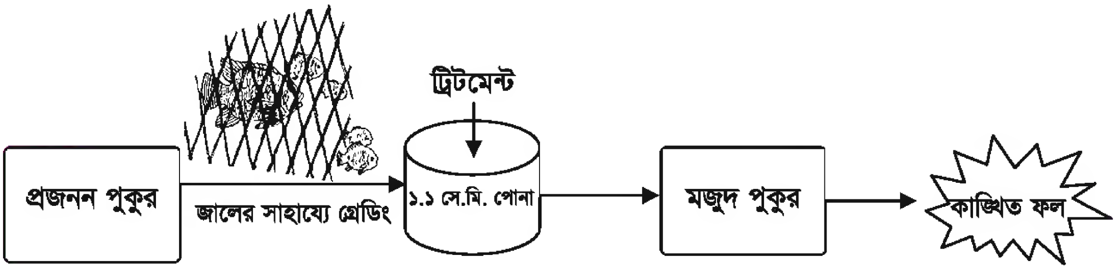

চিত্র-২ : হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে মনোসেক্সে রূপান্তর প্রক্রিয়া

পোনা সংগ্রহের এবং দৈর্ঘ্য নিশ্চিত হওয়ার একটি সহজ পদ্ধতি হলো ক্ষুদ্র ফাঁস সম্পন্ন জালের সাহায্যে পোনাগুলোকে সংগ্রহ করে এদেরকে ০.৩ সেন্টিমিটার ফাঁস সম্পন্ন স্কুপ নেটের সাহায্যে গ্রেডিং করতে হবে। যে সমস্ত পোনা ঐ ফাঁস সাইজের জাল দ্বারা পার হয়ে যাবে শুধুমাত্র সেই পোনাগুলোকে হরমোন ট্রিটমেন্টের জন্য নির্বাচন করতে হবে। কারণ ০.৩ সেন্টিমিটার ফাঁস অতিক্রমকারী পোনার আকার ১.১ সেন্টিমিটার কিংবা তার চেয়ে ছোট হয়ে থাকে। উল্লেখ্য পোনার আকার সর্বোচ্চ ১.৩ সেন্টিমিটারের বেশি হলে সে ক্ষেত্রে হরমোন ট্রিটমেন্টের ফলাফল আশানুরূপ নাও হতে পারে।

হরমোন প্রয়োগ মাত্রা : সংগৃহীত এবং নির্বাচিত নাইলোটিকার পোনাকে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৬ মিলিগ্রাম হারে ১৭-আলফা মিথাইল টেসটোস্টেরন হরমোন মিশ্রিত করে একনাগাড়ে ২১ দিন খাওয়ালে তেলাপিয়ার সব পোনা পুরুষ তেলাপিয়ায় রূপান্তরিত হবে।

খাদ্যের সঙ্গে হরমোন প্রয়োগের উপকারিতা : হরমোন মূলত মাছের খাদ্য ব্যবহারের কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করে। ফলে পরোক্ষভাবে মাছের উৎপাদনের খরচ কমিয়ে ফেলে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। কার্পজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে খাদ্যের সাথে ১-৩ পিপিএম মাত্রায় ১৭-আলফা মিথাইল টেসটোস্টেরন হরমোন প্রয়োগ করে ৮৭ শতাংশ বেশি ওজনের মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে উৎপাদিত পোনা পুকুরে চাষের জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে।

> যদিও বা মনোসেক্স তেলাপিয়া রেণুপোনা দেওয়ার কথা নয় তবুও দেখা যায় তারা রেণুপোনা দেয় এর কারণ সেক্সিং বা হরমোন পদ্ধতিতে মনোসেক্স করলে ১০০% লিঙ্গ রূপান্তর হয় না। বড়জোড় ৯০-৯৫ ভাগ লিঙ্গ রূপান্তর হতে পারে। বাকী এ ৫-১০ ভাগ পোনা দিতে পারে। তবে অধিক ঘনত্বে থাকে বিধায় এ সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে না। এর পরেও চাষকৃত পুকুরে যদি ছোট রেণু পোনার ঝাঁক দেখা যায় তাহলে প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর ছোট ফাঁসের জাল টেনে রেণুপোনা সরাতে হবে। অন্যথায় তেলাপিয়ার বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল অর্থাৎ তেলাপিয়ার সাথে শতাংশ প্রতি ৩টি ভেটকি/চিতল মাছ চাষ করলে এক দিকে অনাকাঙ্খিত পোনা নিয়ন্ত্রিত হবে, অন্য দিকে রেণুপোনা খেয়ে ভেটকি মাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ফলে খাদ্যজনিত ব্যয় সাশ্রয় হবে।

পুকুর নির্বাচন : মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৌসুমী পুকুর তথা যেসব পুকুরে স্বল্প গভীরতার কারণে কার্পজাতীয় মাছচাষ সম্ভব নয় ঐ ধরনের পুকুরই এ মাছচাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আর স্বভাবজাত কারণে তেলাপিয়া যেহেতু পাড়ের ধারে বকচরে গর্ত করে তাই বাৎসরিক পুকুরের পরিবর্তে ২০-৩০ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট যে সমস্ত মৌসুমী পুকুরে ৪-৬ মাস ৩/৪ ফুট পানি থাকে সে ধরনের পুকুর তেলাপিয়া মাছচাষের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুত প্রণালী : অন্যান্য প্রজাতির মাছচাষের ক্ষেত্রে নতুন এবং পুরাতন পুকুরে যেভাবে পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয় এক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এখানে নতুনভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। পুকুর প্রস্তুতির এ ধাপগুলো এই পাঠ্যবইয়ের প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে।

পোনা মজুদ : ব্যবস্থাপনার ধরন অনুযায়ী অর্থাৎ কী ধরণের সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হবে, দিনে কতবার খাদ্য প্রয়োগ করা হবে, কতটুকু খাদ্য প্রয়োগ করা হবে, পুকুরের উর্বরতা শক্তি কেমন, প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে পুকুরে নতুন পানি সংযোগ করার ব্যবস্থা আছে কি না, পুরো মাছচাষ চক্রে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে ইত্যাদি বিবেচনা করে সামর্থ্যানুযায়ী পোনা মজুদ করতে হবে। তবে স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় শতাংশ প্রতি একক চাষে ৫-১০ গ্রাম ওজনের ৮০-১০০ টি সুস্থ সবল পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাস : নাইলোটিকা সর্বভুক প্রকৃতির মাছ। পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে যে শ্যাওলা ও জলজ কীটপতঙ্গ জন্মে নাইলোটিকা তার সবকিছুই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ছোট অবস্থায় (৬ সেন্টিমিটার) নাইলোটিকার পোনা উদ্ভিজ ও ক্ষুদে রোটিফার জাতীয় প্ল্যাংকটন খেতে ভালোবাসে। এদের পাকস্থলী তৃণভোজী মাছের পাকস্থলীর তুলনায় ছোট এবং অন্ত্রে প্যাঁচের সংখ্যা অনেক কম। ফলে গৃহীত খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হয়। তাই এদের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য একবারে প্রয়োগ না করে বেশ কয়েক বারে অল্প অল্প করে প্রয়োগ করলে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

সম্পূরক খাদ্য নির্বাচন : মাছচাষে ভালো ফল লাভের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি অবশ্যই সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবে খাদ্য নির্বাচনের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উক্ত খাদ্যের মূল্য যেন মৎস্যচাষির ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। পরিমিত ও সুষম খাবার মাছের দেহ বর্ধনে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২.০ কেজি সুষম খাদ্য নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা হলে এবং পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি মাছচাষের অনুকূলে থাকলে ১.০ কেজি মাছ উৎপাদন হতে পারে। এমনি ধরনের সুষম সম্পূরক খাদ্যে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণ বিদ্যমান থাকে পাশে তার একটি নমুনা সারণি- ১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১ : সুষম সম্পূরক খাদ্যের নমুনা (১০-১০০০ গ্রাম মাছের জন্য)

খাদ্য উপকরণ	
নাম	**পরিমাণ**
চালের কুঁড়া (অটো)	২৫ কেজি
গমের ভুসি (চিকন)	১৫ কেজি
ফিশমিল	১৫ কেজি
সরিষার খৈল	২৭ কেজি
ভুট্টার আটা	৫ কেজি
সয়াবিন মিল	৫ কেজি
গমের আটা	৫ কেজি
চিটা গুড়	২ কেজি
লবণ	৫০০ গ্রাম
ফিড প্রিমিক্স	৫০০ গ্রাম
মোট	**১০০ কেজি**

উৎস : মাছের খাদ্য ও পুষ্টি, মোঃ আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাৎস্য ও মাৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা- বিষ্ণুদাস।

দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং খাদ্যের সমন্বয় সাধন : পোনা মজুদের পর অবশ্যই পোনার দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ কাজে নমুনায়নের জন্য ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। ঝাঁকি জালের মাধ্যমে ১৫ দিন অন্তর অন্তর বিভিন্ন আকারের ১৫-২০টি মাছের গড় ওজন নিতে হবে। এই গড় ওজনকে মাছের মোট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট ওজন তথা জীবভর পাওয়া যাবে। জীবভর প্রত্যেক দিন পরিবর্তনশীল কারণ প্রত্যেকটি মাছ প্রতিদিন কিছু না কিছু বাড়ে। তাই প্রত্যেকদিনের বর্ধিত জীবভরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবেই মাছচাষে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করে তথা পুকুরের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক গুণাবলি মাছচাষের অনুকূলে রেখে কমপক্ষে ২৫ ভাগ প্রোটিন, ৩০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট এবং ১০ ভাগ লিপিড সমৃদ্ধ খাদ্য প্রত্যেকদিন কমপক্ষে ২ বার নির্দিষ্ট সময়ে মাছের চাহিদা অনুযায়ী (দৈহিক ওজনের ৪-৬ ভাগ) প্রয়োগ করলে প্রত্যেকটি মাছ দৈনিক গড়ে ২ গ্রাম করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।

খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ : খাদ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই মাছের গড় ওজন এবং মোট সংখ্যা জানতে হবে। মজুদকৃত তেলাপিয়ার গড় ওজন ৫ গ্রাম, মোট মাছের সংখ্যা ৫০০০ হলে পুকুরে মোট জীবভর হবে ৫০০০X৫ = ২৫০০০ গ্রাম = ২৫ কেজি। মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজনের ৫ ভাগ হারে খাদ্য প্রয়োগ করলে মোট খাদ্যের প্রয়োজন হবে = ১.২৫ কেজি ।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি : বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য প্রত্যেক দিন কমপক্ষে ২ বার একই সময়ে, একই স্থানে, একই সাথে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগকৃত খাদ্যের ধরন অনুযায়ী তিন ভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন–

ক. ভাসমান পদ্ধতি;

খ. বল আকারে অথবা

গ. পিলেট আকারে

ক. ভাসমান পদ্ধতি : তেলাপিয়া যেহেতু ভাসমান খাদ্য খেতে বেশি পছন্দ করে তাই এদের বয়স যখন কম এবং দৈহিক ওজন ২-৩ গ্রাম হবে তখন তাদের বিভিন্ন খাদ্যোপকরণের সুষম মিশ্রণ সম্বলিত খাদ্য শুকনো অবস্থায় পুকুরে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে। মাছ যখন পানির উপরে ভাসমান খাদ্য খেয়ে থাকে তখন খাদ্যের সাথে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন তার দেহে যায়। এই অক্সিজেন সেখানে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ ফুলকার গিল ল্যামেলীর সংস্পর্শে যখন অক্সিজেন আসে এই অক্সিজেন দহনক্রিয়া তথা পাচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ফলে গৃহীত খাদ্য দ্রুত হজম হয়ে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের সার বস্তু মাছের মাংসপেশিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ফলে মাছের ওজন বেড়ে যায়।

খ. বল আকারে : প্রত্যেক দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য বল আকারেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরিমাণমত খৈল আগের দিন সমপরিমাণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে প্রয়োগকালীন সময়ে অন্যান্য খাদ্যোপকরণ মিশ্রিত করে বল তৈরি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে বলগুলো যেন পানিতে প্রয়োগ করার পর পরই গলে না যায় এজন্য বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত আটা বা বার্লিকে জ্বাল দিয়ে নেয়া যেতে পারে। এতে এর আঠালভাব অনেক বেড়ে যাবে ফলে বল বেশ শক্ত হবে।

গ. পিলেট আকারে : বাজারে স্বল্পমূল্যের পিলেট মেশিন পাওয়া যায়। পিলেট মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্যোপকরণের আনুপাতিক হারে মিশ্রণ সঠিকভাবে মেপে নিয়ে পিলেট তৈরি করতে হবে। পরে এই পিলেট খাদ্য রোদে শুকিয়ে মাছের দৈহিক ওজনের কমপক্ষে ৫% হারে প্রত্যেক দিন প্রয়োগ করতে হবে। তবে ভালফল লাভের ক্ষেত্রে মাছ যতটুকু খেতে চায় ততটুকু খাদ্য দেয়া যেতে পারে।

মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণ : উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ ও নির্দেশাবলি সঠিকভাবে পালন করলে ৫ মাসের মধ্যেই প্রতিটি মাছ ২০০-৩০০ গ্রাম হবে। আর তেলাপিয়া যেহেতু গর্ত করে তাই সম্পূর্ণ মাছ আহরণের ক্ষেত্রে পুকুর অবশ্যই শুকিয়ে ফেলতে হবে।

সম্ভাব্য উৎপাদন এবং আয়-ব্যয়

সারণি-২ : ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের ৬ মাসের আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রম	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	পুকুরের খাজনা/ ইজারা মূল্য	গুচ্ছ	-	৫০০০.০
০২	পুকুর প্রস্তুত (সংস্কার সহ)	গুচ্ছ	-	২০০০.০
০৩	বিষ প্রয়োগ (রোটেনন)	৪ কেজি	৩০০.০	১২০০.০
০৪	চুন	৩৩ কেজি	১৪.০	৪৬২.০
০৫	গোবর সার	২০০০ কেজি	১.০	২০০০.০
০৬	ইউরিয়া	১০০ কেজি	১২.০	১২০০.০
০৭	টিএসপি	৫০ কেজি	৩২.০	১৬০০.০
০৮	পোনা	৮২৫০ টি	২.৫০	২০৬২৫.০
০৯	সম্পূরক খাদ্য	২৯৪০ কেজি	২২.০	৬৪৬৮০.০
১০	মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচ্ছ	২০০০০.০	২০০০.০
১১	বিবিধ	গুচ্ছ	২০০০.০	২০০০.০
১২	ব্যাংকিং সুদ	১৫% হারে (৬ মাসের)	-	১৫৪১৫.০
			মোট	**১,১৮,১৮২.০**

সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুসরণ করলে করলে নিম্নোক্ত উৎপাদন আশা করা যেতে পারে।

১ ফসলে মাছের উৎপাদন = ১৯৬০ কেজি

বিক্রয় মূল্য = ১৯৬০ x ১০০ = ১,৯৬,০০০/-

উৎপাদন খরচ = ১,১৮,১৮২/-

নিট মুনাফা = ১,৯৬,০০০/- - ১,১৮,১৮২/- = ৭৭,৮১৮/-

২ ফসলে (বছরে) নিট মুনাফা = ৭৭,৮১৮/- x ২ = ১,৫৫,৬৩৬/-

পোনা প্রাপ্তি : মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের মাধ্যমে অধিক লাভবান হতে হলে সময়মতো মজুদ উপযোগী পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে মার্চ-জুলাই মাস পর্যন্ত এ মাছের পোনা পাওয়া যায়।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মনোসেক্স তেলাপিয়া নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়?

২. কত গ্রাম ওজনের মাছ বাছাই বা সেক্সিং -এর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী?

৩. তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সেক্স হরমোন ব্যবহার করা হয়?

৪. প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে কত মিলিগ্রাম হরমোন প্রয়োগ করা হয়?

৫. মনোসেক্স তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় শতাংশপ্রতি কতটি পোনা মজুদ করা হয়?

৬. তেলাপিয়ার বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল কিভাবে করা যেতে পারে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়ার পার্থক্য করা যায়?

২. তেলাপিয়ার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা গুলো কী কী?

৩. মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের দুটি সুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. মনোসেক্স তেলাপিয়ার জন্য ২৫ শতাংশ আমিষ সম্বলিত সুষম সম্পূরক খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

৩. তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয় তা বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

থাই পাঙ্গাশ ও কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি

আমাদের দেশে বদ্ধ জলাশয়ে যুগ যুগ ধরে কার্পজাতীয় মাছের চাষ হয়ে আসছে। দেশীয় কার্পের বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই থাইল্যান্ড থেকে এ পাংগাস আমাদের দেশে আনা হয়। থাই পাঙ্গাশ বেশ জনপ্রিয় মাছ। যদিও পাঙ্গাশ চাষে অন্যান্য প্রজাতির মাছ চাষের চেয়ে অনেক বেশি পুঁজির প্রয়োজন হয়। তবুও সব দিক বিবেচনা করে (দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন, অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়, মাংসাশী নয়, প্রতিকূল পরিবেশ সহ্যক্ষম ইত্যাদি) সবচেয়ে লাভজনক এবং জনপ্রিয় প্রজাতি হিসেবে থাই পাঙ্গাশ আজ সর্বজন স্বীকৃত। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে পাঙ্গাশ চাষের ব্যাপারে অনেকের স্বচ্ছ ধারণা নেই। স্বচ্ছ ধারনা না থাকার কারণে অনেকে অতি উৎসাহী হয়ে পাঙ্গাশ চাষ শুরু করে মাঝ পথে যেয়ে ব্যবস্থাপনার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পেরে ভালো ফল লাভে বঞ্চিত হয়। এ অধ্যায়ে থাই পাঙ্গাশের মিশ্রচাষ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হলো। এ থেকে কোনো ব্যক্তি তার সুযোগ, সামর্থ্য এবং সর্বোপরি ইচ্ছানুযায়ী কোন প্রজাতির মাছচাষ করবে এবং সে প্রজাতির মাছচাষ করলে কত টাকা আয় বা ব্যয় হতে পারে সে ব্যাপারে একটি ধারণা পেতে পারেন।

প্রজাতি হিসেবে পাঙ্গাশ নির্বাচনের গুরুত্ব

যেসব বৈশিষ্ট্যাবলির কারণে কার্পজাতীয় মাছের সাথে থাই পাঙ্গাশ নির্বাচন করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ–

- মৎস্যভুক স্বভাবের নয় বিধায় কার্পজাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়;
- তলদেশে বসাবাসকারী প্রজাতি হলেও মৃগেল বা কার্পিও -এর চেয়ে অতি সহজেই বেড়জাল দ্বারা পুকুর হতে সব মাছ আহরণ সম্ভব;
- দ্রুত বর্ধনশীল, অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় বিধায় অল্প পরিমাণ জলাশয় হতে অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়;
- কম অক্সিজেনযুক্ত পানিতেও বেঁচে থাকতে পারে;
- রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশি;
- সর্বভুক বলে যেকোন সম্পূরক খাদ্য দিয়ে চাষ করা যায় ও
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায় বিধায় ভালো বাজার মূল্য পাওয়া যায়।

চিত্র-৩ : থাই পাংগাস

থাই পাঙ্গাশের মিশ্রচাষ পদ্ধতি

অন্যান্য প্রজাতির মাছ চাষের ন্যায় এর চাষ পদ্ধতি শুরু করা যেতে পারে। এর জন্য আলাদাভাবে কোনো ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই। নিচে পুকুর প্রস্তুতি থেকে মাছ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে করণীয় কাজের ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া হলো।

১. পুকুর প্রস্তুতি : পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল তৈরি। পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিচে লিখিত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হবে।

ক. পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা সম্পর্কে ধারণা : যেকোনো আকার এবং আয়তনের পুকুর এ ধরনের মাছ চাষের জন্য উপযোগী। তবে পুকুর আয়তাকার এবং তা উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি হলে জাল টানতে এবং বছরের যেকোনো ঋতুতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নিশ্চিত হয়। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ১ একর আয়তনের পুকুর সবচেয়ে বেশি উপযোগী। গভীরতার ক্ষেত্রে–পাঙ্গাশ যেহেতু কিছুটা গভীর পুকুর পছন্দ করে তাই কার্প-পাঙ্গাশ মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে পুকুরের গভীরতা কমপক্ষে ৬ ফুট হলে সবচেয়ে ভালো হয়।

খ. পাড় সংস্কার : পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে শুরুতে অবশ্যই তা মেরামত করতে হবে। যাতে কোনোক্রমেই বাইরের নর্দমা বা অন্য কোনো উৎস থেকে দূষিত পানি বা অন্য কোন মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।

গ. তলার পচা কাদা : পুকুরের তলায় অতিরিক্ত পচা কাদা থাকলে (৬ ইঞ্চির বেশি) সম্ভব হলে পুকুর শুকিয়ে তা তুলে ফেলতে হবে। তা না হলে ঐ ধরনের পুকুরে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় (২ কেজি/শতাংশ) চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. পাড়ে গাছপালার অবস্থান : পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রাপ্তি এবং পানিতে যেন বাতাসে ঢেউ খেলে সেজন্য পুকুর পাড়ে ছায়া প্রদানকারী কোনো গাছপালা না থাকাই ভালো। থাকলে অবশ্যই সেগুলোর ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

ঙ. জলজ আগাছা : যেকোনো ধরনের জলজ আগাছা থাকলে আগাছা নিয়ন্ত্রণের যেসব পদ্ধতি রয়েছে (কায়িক শ্রম, জৈবিক এবং রাসায়নিক) সেগুলোর মধ্যে আগাছার শ্রেণীভেদে যে পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ সেই পদ্ধতি বেছে নিয়ে পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই তা দূর করতে হবে।

চ. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ : এক্ষেত্রে পুকুরে কোনো ক্রমেই রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ রাখা যাবে না। পুকুরে যদি রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ রয়েছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের জন্য যেসব পদ্ধতি রয়েছে (পুকুর শুকানো, বিষ প্রয়োগ, ঘন ঘন জাল টানা প্রভৃতি) এর মধ্যে সুযোগ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোনো একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। তবে পুকুর শুকানোর ক্ষেত্রে যেসব প্রতিকুলতা রয়েছে সেসব প্রতিকুলতা না থাকলে সে ক্ষেত্রে পুকুর শুকানো সবচেয়ে উত্তম। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে প্রতি শতাংশে প্রতিফুট পানির জন্য ২৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ছ. চুন প্রয়োগ : পুকুর প্রস্তুতির সময় সাধারণত ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে থাই পাঙ্গাশের মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রতি একক আয়তনে শুধুমাত্র কার্প জাতীয় মাছ মজুদের চেয়ে (৪৫/শতাংশ) প্রায় দ্বিগুণ ঘনত্বে (৮৫/শতাংশ) পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে। তাই মজুদকৃত মাছের রেচনদ্রব্য, প্রয়োগকৃত খাদ্যের অব্যবহৃত অবশিষ্টাংশ প্রভৃতি পচে গিয়ে পানি অম্লীয় হতে পারে। এ জন্য পুকুর প্রস্তুতির পরেও প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে চুন/চুন সদৃশ উপকরণ

প্রয়োগ করে পানির পিএইচ মাছচাষের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

জ. সার প্রয়োগ : এ পদ্ধতিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যের ততবেশি প্রয়োজন নেই বিধায় সার প্রয়োগ ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি খুব বেশি প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হলে শ্বসনের ফলে রাতে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যেতে পারে। তাই কার্প-পাঙ্গাশ মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে পুকুরে খুব বেশি সার প্রয়োগ না করাই ভালো। তবে পাঙ্গাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করলে প্রয়োগকৃত খাদ্যের কিছু না কিছু অংশ পানিতে গলে যাবে যা সার হিসেবে কাজ করবে। এ ছাড়াও মাছের রেচন দ্রব্যও সারের ভূমিকা পালন করতে পারে। এর পরেও পানির বর্ণ দেখে প্রয়োজন হলে প্রতি সপ্তাহে শতাংশপ্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম টিএসপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. পোনা মজুদ : এ পদ্ধতিতে কার্পজাতীয় মাছচাষের ক্ষেত্রে শতাংশপ্রতি বিভিন্ন প্রজাতি মিলে ৪০-৫০টি পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে অন্যান্য প্রজাতিসমূহ প্রায় ঠিক রেখে শুধুমাত্র নিচের স্তরের মাছ মৃগেল, কার্পিও অথবা কালিবাউস এর পরিবর্তে শতাংশপ্রতি ৫০ টি পাঙ্গাশ মজুদ করলে উৎপাদন অনেক গুণ বেড়ে যায়। পাশের সারণিতে কার্প-পাঙ্গাশ মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের একটি নমুনা দেয়া হলো।

সারণি-৩ : পোনা মজুদের নমুনা

প্রজাতি	আকার (ইঞ্চি)	গড় ওজন (গ্রাম)	সংখ্যা/শতাংশ	জীবভর (কেজি)
সিলভার কার্প	৪-৫	২০-৩০	১০	০.২৫
কাতলা	৪-৫	৪০-৫০	৫	০.২৩
রুই	৪-৬	৩০-৪০	১০	০.৩৫
রাজপুঁটি	১-২	১০-১৫	১০	০.১২
পাংগাস	৩-৪	২৫-৩০	৫০	১.৩৫
মোট	-	-	৮৫	২.৩০

৩. সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : পাঙ্গাশ চাষে খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে মজুদকৃত মাছের জীবভরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগকৃত খাদ্যে কমপক্ষে ৩০% আমিষ, ৩০% কার্বোহাইড্রেট এবং ১০% লিপিড বিদ্যমান থাকা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমিষের পরিমাণই যথেষ্ট নয় আমিষের গুণগতমানও বিবেচ্য হওয়া উচিত। পাশের সারণি-৪ এ বিভিন্ন খাদ্য উপকরণসমূহ মিলে উল্লেখিত মানসম্পন্ন সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির একটি নমুনা পাশে দেয়া হলো- উল্লিখিত নমুনা অনুসরণ করে খাদ্য তৈরি করলে ৩০% আমিষ পাওয়া যাবে এবং প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য প্রায় ৪২.০টাকা দাঁড়াবে। তৈরি খাদ্যের খাদ্য রূপান্তর হার হবে ১.৭৫ হবে।

সারণি-৪ : বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের সমন্বয়ে খাদ্য তৈরির নমুনা

খাদ্য উপকরণ		মূল্য/কেজি (টাকা)
নাম	পরিমাণ (কেজি)	
চালের কুঁড়া (অটো)	২০	১৮.০০
গমের ভূষি (চিকন)	১০	২০.০০
ফিশমিল	২০	১০০.০০
সরিষার খৈল	৩৫	৩০.০০
ভূট্টার আটা	৫	১৮.০০
সয়াবিন মিল	৫	৪০.০০
গমের আটা	৩	২২.০০
চিটা গুড়	১	৬০.০০
লবণ	০.৫	২৪.০০
ফিড প্রিমিক্স	০.৫	৫০০.০০
মোট	১০০	-

উৎস : মাছের খাদ্য ও পুষ্টি, মোঃ আমিনুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কারণে এর মান কমবেশি হতে পারে। যেমন- পানির গুণাগুণ, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ, পিএইচ মাত্রা, খাদ্য প্রয়োগ বিধি ইত্যাদি। পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি যত বেশি মাছ চাষের অনুকূলে রাখা যাবে। খাদ্যে রূপান্তর হার তত কম হবে, খাদ্যজনিত ব্যয় সাশ্রয় হবে।

৪. দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের সমন্বয় : অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক পুকুরে পোনা মজুদের সময় যতটুকু খাদ্য প্রয়োগ করা হয়, পরে ইচ্ছানুসারে আন্দাজমতো সামান্য পরিমাণ বাড়িয়ে পুকুরে প্রয়োগ করা হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই পোনার দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য প্রয়োগের তেমন কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। ভালো ফল লাভের ক্ষেত্রে নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের প্রত্যেক দিনের গড় দৈহিক বৃদ্ধি জেনে মোট জীবভর নির্ণয় করে দৈনিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়োগকৃত খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করার একটি নমুনা দেয়া হলো।

নমুনায়নের তারিখ	মোট মাছের সংখ্যা	গড় ওজন (গ্রাম)	মোট জীবভর (কেজি)	দৈহিক ওজনের শতকরা হার (%)	মোট খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)
০১/০১/১৬	২০০০	৫০	১০০	৬	৬
১০/০১/১৬	২০০০	৭৫	১৫০	৬	৯

খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন একই সময়ে, একই স্থানে, একই সাথে খাদ্যদানিতে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্যের অপচয় কম হবে। ফলে একই পরিমাণ খাদ্যে মাছের উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে।

৫. মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণ : ক্রেতা সাধারণের চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে মাছ আহরণ ও বাজারজাত করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন ক্রেতাই মৃত পাঙ্গাশ মাছ কিনতে চান না। তাই মৃত এবং জীবিত পাঙ্গাশের বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। ভালো বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য এমনভাবে মাছ আহরণ করতে হবে যাতে জীবিত অবস্থায় পাঙ্গাশ বাজারে নেয়া যায়। জীবিত অবস্থায় পরিবহনের জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম বা পলিথিনের তাঁবুতে পানি দিয়ে মাছ পরিবহন করা যেতে পারে। অনেক অঞ্চলে মৎস্য চাষি পরিবহনের সময় মাছকে জীবিত এবং সতেজ রাখার জন্য ড্রামপ্রতি ২ প্যাকেট স্যালাইন ব্যবহার করে থাকেন। এতে মাছ অনেক সময় জীবিত এবং সতেজ থাকে।

৬. আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ : মাছ চাষের ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে কার্প-পাঙ্গাশ মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ১ একর পুকুরে পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মাছ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে ব্যয়, মাছের উৎপাদন এবং তার সম্ভাব্য বাজারমূল্য নিচে বিভিন্ন সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি-৫ : পুকুর প্রস্তুতকালীন ব্যয়

প্রকল্পে ব্যয়ের খাত	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
ইজারা মূল্য (নিজেস্ব)	-	-	-	প্রযোজ্য নহে
আগাছা পরিষ্কারকরণ	গুচ্ছ	গুচ্ছ	২০০০.০০	
পাড় মেরামত	গুচ্ছ	গুচ্ছ	১৫০০.০০	
রোটেনন প্রয়োগ	৯ কেজি	৩০০.০	২৭০০.০০	

প্রকল্পে ব্যয়ের খাত	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
চুন প্রয়োগ	১০০ কেজি	১৪.০	১৪০০.০০	
গোবর সার	৫০০ কেজি	১.০০	৫০০.০০	
কম্পোষ্ট সার	২৫০ কেজি	১.০০	২৫০.০০	
ইউরিয়া	১০ কেজি	১২.০	১২০.০০	
টিএসপি	১০ কেজি	৩০.০	৩০০.০০	
পানি সংযোগ	গুচ্ছ	গুচ্ছ	২০০০.০০	প্রয়োজন হলে
বিবিধ	গুচ্ছ	গুচ্ছ	২০০০.০০	
		মোট	১২,৭৭০.০০	

পোনা মজুদকালীন ব্যয় : এ ক্ষেত্রে প্রজাতির ভিন্নতার কারণে ব্যয়েরও তারতম্য ঘটে থাকে। তবে যেহেতু বড় আকারের পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে তাই পোনামৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মজুদকৃত প্রজাতির পোনার মৃত্যুহার ৫% ধরে পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে।

সারণি-৬ : পোনা মজুদকালীন ব্যয়

প্রজাতির নাম	সংখ্যা (একরে)	সাইজ (ইঞ্চি)	গড় ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	
				একক	মোট
সিলভার কার্প	১০০০	৪-৫	২০-৩০	৩.০	৩০০০.০০
কাতলা	৫০০	৪-৫	৪০-৫০	৭.০	৩৫০০.০০
রুই	৭০০	৪-৬	৩০-৪০	৫.০	৩৫০০.০০
পাঙ্গাশ	৫০০০	৪-৬	২৫-৩০	৩.০	১৫০০০.০০
রাজপুঁটি	১০০০	১-২	১০-১৫	২.০	২০০০.০০
পোনা পরিবহন ও শোধন					৫০০.০০
বিবিধ					৫০০.০০
মোট ব্যয়					**২৮০০০.০০**

আংশিক আহরণ : আংশিক আহরণের ক্ষেত্রে মাছের আকার, ওজন, বাজার দর, ঝুঁকি, জীবভর ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে আংশিক আহরণ করতে হবে। মাছ মজুদের ৬ মাস পর হতে আংশিক আহরণ শুরু করা উচিত। যখনই জীবভর প্রতি শতাংশে ৩০ কেজি অথবা বিঘাপ্রতি ৯৯০ কেজির বেশি হবে তখনই বড় সাইজের মাছগুলো আহরণ করা উচিত। কার্প পাঙ্গাশ মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সময়ে সিলভার কার্প (১০০%), কাতলা (১০০%), রাজপুঁটি (১০০%) এবং রুই (১০%) আহরণ করা যেতে পারে। যার সম্ভাব্য বাজারমূল্য ১,৪২,৯৫০.০০ টাকা হতে পারে। যা নিচের সারণি-৭ এ দেয়া হলো।

সারণি-৭ : আংশিক আহরণকালে আয়

আহরণকৃত প্রজাতির নাম	আহরণ সংখ্যা	গড় ওজন (গ্রাম)	প্রাপ্ত জীবভর (কেজি)	মূল্য/কেজি (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
সিলভার কার্প (১০০%)	১০০০	৮০০	৮০০	৮০.০	৬৪০০০.০০
কাতলা (১০০%)	৫০০	৬০০	৩০০	১৫০.০	৪৫০০০.০০
রুই (১০%)	৭০	৫০০	৩৫	১৭০.০	৫৯৫০.০০
রাজপুঁটি (১০০%)	১০০০	২০০	২০০	১৪০.০	২৮০০০.০০
মোট আয়	-	-	১৩৩৫	-	১,৪২,৯৫০.০০

পুনঃমজুদ ব্যয় : এ ক্ষেত্রে আহরণ শেষে ধৃত প্রজাতির ১০% অতিরিক্ত পোনা মজুদ করতে হবে। অর্থাৎ ১০০টি মাছ আহরণ করা হলে সেই প্রজাতির ১১০টি পোনা মজুদ করতে হবে। উন্নত ব্যবস্থাপনায় ৬ মাস চাষ করলে সবগুলো প্রজাতির মাছই গড়ে ৫০% আহরণ উপযোগী হবে।

সারণি-৮ : মজুদ পরবর্তী ব্যয়

ব্যয়ের খাত	পরিমাণ (কেজি)	একক মূল্য	মোট মূল্য	এফসিআর
গোবর সার	৬০০০	১.০	৬০০০.০০	১.৭৫
কম্পোষ্ট সার	৩০০০	১.০	৩০০০.০০	
ইউরিয়া	১৫০	১২.০	১৮০০.০০	
টিএসপি	৭৫	৩০.০	২২৫০.০০	
সম্পূরক খাদ্য	৮১৫০	৪০.০	৩,৬৬,০০০.০০	
চুন	২০০	১৪.০	২৮০০.০০	
নমুনায়ন পাহাড়াদারের	গুচ্ছ	গুচ্ছ	১০০০.০০	
বেতন	গুচ্ছ	৩০০০/মাস	৩৬০০০.০০	
শ্রমিক	গুচ্ছ	গুচ্ছ	১০০০.০০	
নিজস্ব শ্রম	গুচ্ছ	গুচ্ছ	-	
মাছের চিকিৎসা	গুচ্ছ	গুচ্ছ	২০০০.০০	
বিবিধ			২০০০.০০	
		মোট ব্যয়	**৩,৯৮,৪৫০.০০**	

আহরণকৃত মাছের প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন এবং সম্ভাব্য আয় (২ ফসলে) : নিচে সারণি-৯ এ একজন মৎস্য চাষির ১ একরে ২ ফসলের উৎপাদন চক্রে কী পরিমাণ মাছ উৎপাদিত হতে পারে এবং উৎপাদিত মাছ হতে সম্ভাব্য আয়ই বা কত টাকা হতে পারে ছকপত্রে তা দেখানো হলো।

সারণি- ৯ : প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন এবং সম্ভাব্য আয়

প্রজাতি	মূল্য/ কেজি (টাকা)	১ম ফসলে				২য় ফসলে		
		উত্তোলন সংখ্যা	গড় ওজন (গ্রাম)	মোট উৎপাদন (কেজি)	মোট মূল্য (টাকা)	উত্তোলন সংখ্যা	মোট উৎপাদন (কেজি)	মোট মূল্য (টাকা)
সিলভার কার্প	৮০.০	১০০০	৮০০	৮০০	৬৪০০০.০০	১০০০	৮০০	৬৪০০০.০০
কাতলা	১৫০.০	৫০০	৬০০	৩০০	৪৫০০০.০০	৫০০	৩০০	৪৫০০০.০০
রুই	১৭০.০	৭০	৫০০	৩৫	৫৯৫০.০০	৭০০	৩৫০	৫৯৫০০.০০
রাজপুঁটি	১৪০.০	১০০০	২০০	২০০	২৮০০০.০০	১০০০	২০০	২৮০০০.০০
পাঙ্গাশ	৮০.০	-	-	-	-	৫০০০	৫০০০	৪০০০০০.০০
মোট		**২৫৭০**		**১৩৩৫**	**১,৪২,৯৫০.০০**	**৮২০০**	**৬৬৫০**	**৫,৯৬,৫০০.০০**

নীট মুনাফা : আয়ব্যায়

= (৫,৯৬,৫০০ + ১,৪২,৯৫০) - (১২,৭৭০ + ২৮,০০০ + ৩,৯৮,৪৫০)
= ৭,৩৯,৪৫০ - ৪,৩৯,২২০
= ৩,০০,২৩০ টাকা

পাঙ্গাশ চাষে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- সমান আকারের পোনা মজুদ করতে হবে। সম্ভব হলে ১০০ গ্রাম ওজনের পোনা মজুদ করতে হবে। কারণ পোনা যখন ঐ ওজনপ্রাপ্ত হয় তখন সুষম সম্পূরক খাদ্য পেলে প্রত্যেক দিন কমপক্ষে ১০ গ্রাম করে দৈহিক বৃদ্ধি হয়। এর নিচের ওজনের পোনার দৈহিক বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম,
- প্রত্যেক সপ্তাহে ঝাঁকি জালের মাধ্যমে নমুনায়ন করে মাছের গড় ওজন তথা মোট জীবভর জেনে সেই অনুযায়ী সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- পাঙ্গাশের জন্য প্রয়োগকৃত খাদ্যে কমপক্ষে ৩০% আমিষ থাকতে হবে।
- পাঙ্গাশ চাষে ভালো ফল লাভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমিষের পরিমাণ জানাই যথেষ্ট নয়। তৈরি খাদ্যে আমিষের গুণগতমানও ভাল হতে হবে।
- ভালো ফল লাভে পাঙ্গাশের পুকুরে কোনো ক্রমেই গলানো অবস্থায় খাদ্য প্রয়োগ করা যাবে না। বিভিন্ন উপকরণ মিলে বল আকারে খাদ্য তৈরি করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে সুষম পিলেট জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পাঙ্গাশের সাথে সিলভার কার্প এবং কাতলা মজুদ করলে সিলভার কার্পের তুলনায় বড় আকারের কাতলা মজুদ করতে হবে।
- নিতান্ত প্রয়োজন না হলে পাঙ্গাশের পুকুরে ঘন ঘন জাল টানা যাবে না। ঘন ঘন জাল টানলে পাঙ্গাশ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয় বা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম খাদ্য গ্রহণ করে ফলে মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।
- সম্ভব হলে মাঝে মাঝে পুকুরে গভীর/অগভীর নলকূপের সাহায্যে পানি যোগ করলে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। পানি পরিবর্তন করতে না পারলে এবং নিবিড়ভাবে পাঙ্গাশ চাষ করলে অনেক সময় অব্যবহৃত খাদ্যকণা পচে গিয়ে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে সিলভার কার্প মাছ মারা যায়।

আজকাল প্রায়ই একটি কথা শুনা যায় সেটা হলো “পাংগাস মাছের বিশ্রী গন্ধ” কথাটা যে আদৌ সঠিক নয় তা নয়। প্রত্যেক মাছেরই একটি আলাদা গন্ধ রয়েছে যা তার জেনিটিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে থাকে। তবে যে বিশ্রী গন্ধের কারণে ঐতিহ্যবাহী দামী মাছ বলে খ্যাত পাংগাস আজ তার বাজার হারিয়েছে তা তার নিজের কারণে নয়- চাষ পদ্ধতিই এর কারণ। অর্থাৎ এর মাংশপেশীর দুর্গন্ধের কারণ হলো অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে পাংগাস চাষের সময় খাদ্য হিসেবে শামুক-ঝিনুক, হাঁস-মুরগীর নাড়ীভূড়ি, কসাই খানার বর্জ্য, ছোট ছোট মরা পচা মাছ প্রভৃতি প্রয়োগে পানি দূষণের ফলে দূষিত পানিতে বিশ্রী গন্ধযুক্ত প্ল্যাংকটন (Mycrocystis, Nostoc) জন্ম নেয়। মাছ যখন দিনের পর দিন ঐ পরিবেশে বসবাস করে এবং ঐ ধরণের প্ল্যাংকটন ভক্ষন করে তখন প্ল্যাংকটনের বিশ্রী গন্ধ মাছের মাংসপেশীতে স্থানান্তরিত হয়- মাছ হয় বিশ্রী গন্ধ যুক্ত। কোন ক্রেতা যখন ঐ ধরণের পুকুরে পালিত পাংগাস ক্রয় করে একবার ঠকে থাকেন তখন তিনি আর কখনো পাংগাস কিনতে চান না। অথচ পুষ্ঠিগত দিক থেকে অন্যান্য মাছের চেয়ে পাংগাসের পুষ্টিমান (প্রোটিন ১৪%, লিপিড ১১%, এবং ভিটামিন ও মিনারেলস্ ১.৫%) কোন অংশেই কম নয়। তাই ভাল পরিবেশে, ভাল খাদ্য প্রয়োগ করে পাংগাস চাষ করে পাংগাসের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

অনুশীলনী- ২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রজাতি হিসেবে পাঙ্গাশ চাষের গুরুত্ব কী?
২. পাংগাস চাষে ভালো ফল পেতে হলে কী কী বিষয়ে বিবেচনায় রাখতে হবে?
৩. কার্প-পাঙ্গাশ মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে শতাংশপ্রতি কতটি পোনা মজুদ করা যেতে পারে?
৪. পাঙ্গাশের ক্ষেত্রে সুষম সম্পূরক খাদ্যে সর্বনিম্ন শতকরা কতভাগ আমিষ থাকা প্রয়োজন?
৫. ভালো বাজারমূল্য প্রাপ্তির নিরিখে মৎস্যচাষিকে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?
৬. পাঙ্গাশ মাছের বিশ্রী গন্ধের জন্য দায়ী কে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাঙ্গাশ চাষের দুটি সুবিধা লেখ।
২. পাঙ্গাশ চাষের দুটি অসুবিধা লেখ।
৩. পাঙ্গাশ চাষে পুকুরের আকার, আয়তন এবং গভীরতা কেমন হওয়া দরকার?
৪. পাঙ্গাশ চাষে সার প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয় সমূহ কী কী?
৫. পাঙ্গাশ আহরণ এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঙ্গাশ চাষে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা কর।
২. পাঙ্গাশের জন্য ৩০% আমিষ সম্বলিত সুষম সম্পূরক খাদ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

তৃতীয় অধ্যায়

থাই কৈ মাছ চাষ পদ্ধতি

দেশীয় ছোট মাছের মধ্যে কৈ মাছ অন্যতম। এক সময়ে ধানক্ষেত, বিল ও হাওরে প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু কৈ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে ধানক্ষেতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, বিল সেচে শুকিয়ে মাছ ধরাসহ নানাবিধ কারণে এই মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় এ মাছের প্রাপ্যতা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে বাজারে এ মাছের মূল্য অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি। তাই অতি সম্প্রতি দেশীয় কৈ মাছের অভাব পূরণের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড থেকে দ্রুত বর্ধনশীল কৈ মাছ আমাদের দেশে আমদানি করা হয়, যা থাই কৈ নামে পরিচিত। এ কৈ মাছটি দেখতে অবিকল দেশীয় কৈ মাছের মতো এবং স্বাদও একই রকম। তবে দেশীয় কৈ মাছ এবং থাই কৈ মাছের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান নিচে তা দেখানো হলো−

দেশীয় কৈ মাছ	থাই কৈ মাছ
দেহের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট, কম মাংসল ও লম্বাটে ধরনের ।	তুলনামূলকভাবে মাংসল ও চওড়া ধরনের।
ছোট অবস্থায় কালচে ধরনের। পরিপক্ব অবস্থায় পিঠের দিকে বাদামী সবুজ এবং পেটের দিকে হালকা হলুদ রঙের হয়।	দেহের বর্ণ দেশী কৈ মাছের তুলনায় হালকা ফ্যাকাশে ধরনের। দেহের উপরিভাগে ছোট ছোট কালো দাগ থাকে এবং পাখনাগুলো হালকা হলুদ রঙের হয়।
কানকোর পিছনে কালো দাগ থাকে। কিন্তু পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ থাকে না।	কানকোর পিছনে ও পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ থাকে।
মুখ প্রান্তিক ও “ ঠ ” আকৃতির।	মুখ বড়, প্রশস্ত ও “ ট ” আকৃতির।
কানকোর কাঁটা খুব শক্ত, অনিয়মিত এবং ধারালো।	কানকোর কাঁটা তুলনামূলক নরম, নিয়মিত এবং খাঁজকাটা।
অঙ্কীয় দিকে আঁইশের সজ্জা “ট ” আকৃতির।	অঙ্কীয় দিকে আঁইশের সজ্জা “ঠ ” আকৃতির।

থাই কৈ মাছের গুরুত্ব বা চাষের সুবিধাসমূহ

- থাই কৈ মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মাছ। এতে ১৪.৮৪% প্রোটিন, ৮.৮% ফ্যাট এবং ২.০% খনিজ পদার্থ বিদ্যমান।
- দেশী কৈ মাছ পুকুরে বদ্ধ পানিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে তেমন বড় হয় না এবং স্বাদও নিম্নমুখী হয়। কিন্তু থাই কৈ পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করলেও স্বাদ ও বৃদ্ধিতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না।
- অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। ফলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়। অথবা বেশ কিছু দিন জিইয়ে রেখে খাওয়া যায়।
- স্বল্প গভীরতা সম্পন্ন পুকুরে অধিক ঘনত্বে এ মাছ চাষ করা যায়।
- আমাদের দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু থাই কৈ মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সঠিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করলে এ মাছটি ৪-৫ মাসে বাজারজাতকরণ উপযোগী হয়। এ সময় প্রতিটি মাছ গড়ে কমপক্ষে ১০০ গ্রাম ওজনের হয়।
- অন্যান্য মাছের তুলনায় এ মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য বেশি।
- রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছ বেশ সমাদৃত।
- বিদেশে এ মাছের ব্যাপক চাহিদা থাকায় রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

- এ মাছের পোনা সহজলভ্য ও
- সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে এ মাছ অভ্যস্ত বলে এ মাছের চাষ অনেক সুবিধাজনক।

অসুবিধাসমূহ

- বৃষ্টি হলে থাই কৈ মাছ যেহেতু পাড় বেয়ে অন্যত্র চলে যায়। তাই পাড় খুব বেশি খাড়া না হলে বা পাড়ে উঁচু বেড়া না দিলে মাছ পালিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।
- দেশের সর্বত্র সব সময় সুলভ মূল্যে এ মাছের পোনা ও সম্পূরক খাদ্য পাওয়া যায় না।
- সব ধরনের পুকুরে এ মাছ চাষ করা যায় না।

থাই কৈ মাছ চাষের পদক্ষেপসমূহ : অন্যান্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এখানেও ঠিক সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে এখানে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। যেমন- পাড়ে কমপক্ষে ২ ফুট উচুঁ করে বাঁশের বা ইটের গাঁথুনি অথবা ঘন জালের সাথে বাঁশের চাটাই দিয়ে বেড়া দিতে হবে। নিচে এ মাছ চাষের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলো।

পুকুর নির্বাচন : যেকোনো আকার ও আয়তনের পুকুরে কৈ মাছ চাষ করা যেতে পারে। তবে পুকুরটি আয়তকার এবং আয়তন ৩০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। যে পুকুরে সারা বছর পানি থাকে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে কমপক্ষে ৪-৫ ফুট পানি থাকে এমন পুকুর এ মাছ চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। পানির গভীরতা ৩ ফুটের কম হলে ফলন আশানুরূপ হবে না। পুকুরের মাটি এটেল বা দোঁআশ এবং তলদেশে সামান্য নরম মাটি থাকলে ভালো হয়। পুকুর অবশ্যই বন্যামুক্ত হতে হবে। অধিক বৃষ্টিপাতে পুকুর পাড়ের সামান্যতম অংশ ডুবে গেলেও পুকুরে কৈ মাছ রাখা কষ্টকর হবে। কৈ মাছ বৃষ্টির সময় পাড় বেয়ে আশে পাশের জলাশয়ে চলে যেতে পারে। সুতরাং কৈ মাছ চাষের পুকুর পাড় অবশ্যই উঁচু হতে হবে। সম্ভব হলে বাঁশের বানা বা ইট দিয়ে চর্তুদিক ঘিরে দিতে হবে। বাইরের কোনো পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রয়োজনে পানি প্রবেশের সব পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে এবং পুকুরে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে ও বাতাস চলাচল করতে পারে এমন পুকুর নির্বাচন করতে হবে। এভাবে পুকুর নির্বাচনের পরে নির্বাচিত পুকুর কৈ মাছ চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত করতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি : থাই কৈ মাছ চাষে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে মাছ চাষের শুরুতে পাড় মেরামত ও তলা সমতল করতে হবে যেন জাল টানতে কোনো অসুবিধা না হয়। পুকুরে অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর পাড়ে ঝোঁপ-ঝাড় ও গাছের বড় বড় ডালপালা থাকলে তা কেটে ছোট করে দিতে হবে। যাতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পাওয়া যায়। পুকুরে কোনো জলজ আগাছা ও রাক্ষুসে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মাছ রাখা যাবে না। পুকুর সেচের মাধ্যমে শুকিয়ে এসব মাছ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে পুকুর হতে সম্পূর্ণরূপে অনাকাঙ্ক্ষিত মাছ দূর করতে হবে। এর পরেও অবাঞ্ছিত মাছ থাকলে প্রতি শতাংশে ১ ফুট গভীরতার জন্য ২৫ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমনের ৩-৪ দিন পর পুকুরে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের মাটি যদি খুব বেশি অম্লীয় হয় তাহলে প্রতি শতাংশে ২ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। শুকনো পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুন পুকুরের বিভিন্ন স্থানে রেখে তাতে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিলে আপনা আপনি চুন পাউডারে পরিণত হবে। যখন চুনের পাউডার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন একটি পাত্রে চুন নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের পর পরিমাণ মতো পানি সরবরাহ করতে হবে।

চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর শতাংশপ্রতি ১০ কেজি গোবর অথবা ৫ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে। সেই সাথে শতাংশপ্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৭৫ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি সার সহজে পানিতে গলে না বলে সার প্রয়োগের কমপক্ষে ১ দিন আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৬ দিন পর পুকুরের পানি হালকা সবুজ হলে তথা পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলে পুকুরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা ছাড়তে হবে। আর পুকুরে বিষ প্রয়োগ করা হলে পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করে তবেই পুকুরে পোনা মজুদ করতে হবে।

পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা : থাই কৈ মাছ ছাড়ার ১ দিন পূর্বে পুকুরের পানি একটি পাত্রে নিয়ে তাতে ৪-৫টি পোনা ছেড়ে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ২৪ ঘণ্টায় যদি কোনো পোনা মারা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়া যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সম্ভব হলে পুকুরে যে প্রজাতির পোনা মজুদ করা হবে, বিষক্রিয়া পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেই প্রজাতির, সেই বয়সের পোনা দ্বারাই বিষক্রিয়া পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা উচিত। কারণ সব প্রজাতির সব বয়সের মাছের সহ্য ক্ষমতা এক নয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পুর্বে পুকুর পাড়ে বেড়া বা ঘের দিতে হবে।

পাড়ে বেড়া বা ঘের দেয়া : বৃষ্টির সময় কৈ মাছ কানকো দিয়ে পাড় বেয়ে পুকুরের বাহিরে চলে যেতে পারে। তাই পুকুরের চার পাড়ে বর্ষাকালে পানির অন্তত ২ ফুট উপরে শক্ত করে বাঁশের বানা অথবা ইট দ্বারা বেড়া দিতে হবে। বেড়া বা ঘের দেয়ার ব্যাপারে গাফলতি করলে পরবর্তী পর্যায়ে চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্খা থাকে। শুষ্ক মাটিতে এ মাছ কানকুয়া দ্বারা অনেক পথ পাড়ি দিতে পারে এমনকি ছোট খাট গাছ বেয়েও উঠতে পারে বলে এ মাছ কে Climbing perch বলে।

পোনা প্রাপ্তি : বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক হ্যাচারি ও নার্সারিতে এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত থাই কৈ মাছের পোনা পাওয়া যায়। সেখান থেকে পোনা সংগ্রহ করে থাই কৈ মাছ চাষ করা যেতে পারে।

পোনা পরিবহন : থাই কৈ মাছের পোনা পরিবহন রুইজাতীয় মাছের পোনা পরিবহনের মতো হলেও একটু ভিন্নতা রয়েছে। যেহেতু কৈ মাছ কাঁটাযুক্ত তাই বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কৈ মাছের পোনা নার্সারি পুকুরে ২০/২১ দিন প্রতিপালনের পর যখন পোনাগুলো ২.৫ থেকে ৩ সে.মি. আকারের হয় তখন পোনাগুলো মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করতে হয়। উৎসস্থল থেকে মজুদ পুকুরের দূরত্ব যত কম হবে থাই কৈ মাছের পোনার মৃত্যু হার তত কম হবে।

সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন : সনাতন পদ্ধতিতে ৬-৮ ঘণ্টার দূরত্বে নিম্নোক্ত মজুদ ঘনত্বে পাতিলে এবং ড্রামে কৈ মাছের পোনা পরিবহন করা যেতে পারে।

পোনা পরিবহনের মাধ্যম	পানির পরিমাণ (লিটার)	পোনার সংখ্যা	পোনার গড় ওজন (গ্রাম)
পাতিল	৮-১০	১০০০-১৫০০	০.২-০.৩
ড্রাম	৭০-৮০	৭০০০-৮০০০	০.২-০.৩

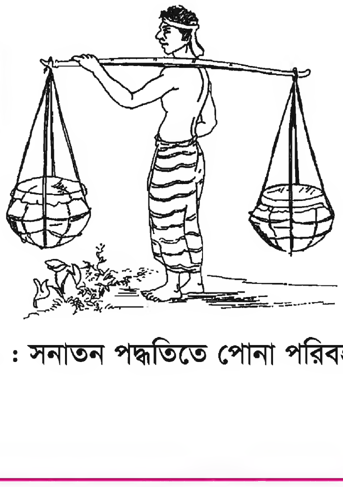

চিত্র-৪ : সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন

আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন : আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে ৬৬ সে.মি. x ৪৬ সে. মি. আকারের পলিথিন ব্যাগে ২০/২১ দিন বয়সের ২৫০ গ্রাম থেকে ৩০০ গ্রাম থাই কৈ মাছের পোনা ১৫-১৮ ঘন্টার দূরত্বে পরিবহন করা যায়। পোনা প্যাকিং করার সময় সমান আকারের ২টি পলিথিন ব্যাগ নিয়ে একটি অন্যটির ভিতরে ঢুকিয়ে তার ১/৩ অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং ব্যাগের উপরের অংশ এক হাত দিয়ে আটকিয়ে অন্য হাত দিয়ে ব্যাগটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে হবে কোনো ছিদ্র আছে কিনা। এবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা পানিসহ পলিথিন ব্যাগে রেখে পলিথিনের বাকি অংশ অক্সিজেন দ্বারা পরিপূর্ণ করে সুতলি/রাবার ব্যান্ড দ্বারা ভালোভাবে বেঁধে নিতে হবে যাতে অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে না পারে। পোনা পরিবহনের জন্য পানির তাপমাত্রা ২২-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা উচিত। পানির তাপমাত্রা বেশি হলে পানির অক্সিজেন ধারণক্ষমতা কমে যাবে। পরিবহনকালে পলিথিন ব্যাগ যাতে ছিদ্র হতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভব হলে পলিথিন ব্যাগ চটের বস্তায় ভরে পরিবহন করতে হবে।

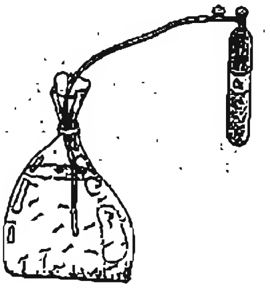

চিত্র-৫ : আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন

পোনা শোধন : পোনা পরিবহন করে পুকুরে নেয়ার পর পুকুরে ছাড়ার পূর্বে পোনা শোধন করে নিতে হবে। এতে পোনা সুস্থ থাকবে এবং রোগবালাই -এর আশঙ্কা কমে যাবে। পোনা শোধনের ক্ষেত্রে একটি বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে তার মধ্যে ২০০ গ্রাম লবণ অথবা ১ চা চামচ (৫ গ্রাম) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নিয়ে পানির সাথে মেশাতে হবে। অতঃপর বালতির উপর একটি ঘন ফাঁসের স্কুপ নেট বা জাল রেখে তার মধ্যে প্রতিবার ২০০-৩০০টি পোনা ৩০ সেকেন্ড রেখে গোসল করিয়ে পুকুরের পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে তৈরিকৃত লবণ/পটাশের দ্রবণে ৫-৭ বার পোনা শোধন বা গোসল করানো যেতে পারে।

পোনা মজুদ : শতাংশপ্রতি ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি সাইজের ২-৩ গ্রাম ওজনের ১৮০-২০০টি সুস্থ, সবল কৈ মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পুকুরের পানির গুণাবলি ভালো রাখার জন্য কৈ মাছের সাথে শতাংশপ্রতি ৬ ইঞ্চি থেকে ৭ ইঞ্চি আকারের ২-৩টি সিলভার কার্পের পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

সম্পূরক খাদ্য তৈরি : থাই কৈ চাষে খাদ্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোনা মজুদের পরের দিন হতে অবশ্যই মানসম্মত সুষম খাদ্য প্রত্যেক দিন প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগকৃত খাদ্যে কমপক্ষে ৩০% প্রোটিন থাকতে হবে। এর মধ্যে কমপক্ষে ১২% প্রাণিজ প্রোটিন থাকতে হবে। নিচে সারণি-৯ এ ৩০% প্রোটিন সম্বলিত ১০০ কেজি সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির ফর্মূলা দেয়া হলো।

সারণি-৯ : সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

খাদ্য উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)
চালের কুঁড়া	২৫
গমের ভুসি	২০
সরিষার খৈল	৩০
ফিশমিল	২০
আটা	৩
চিটা গুড়	১
ভিটামিন ও খনিজ	১
লবণ	
মোট	১০০

খাদ্য প্রয়োগ : মাছের দৈহিক ওজনের ৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবে খাদ্যের এ পরিমাণ কম বেশি হতে পারে যা অভিজ্ঞতার আলোকে নির্ণয় করতে হবে। থাই কৈ মাছের পোনা অবস্থায় বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মিশ্রণে তৈরি সম্পূরক খাদ্য পাউডার অবস্থায় পুকুরের পানির উপর ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে পোনা একটু বড় হলে ছোট ছোট বল তৈরি করে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। বল তৈরির ক্ষেত্রে খৈল কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে বল তৈরি করতে হবে। খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকদিন একই সময়ে একই স্থানে সম্ভব হলে একই সাথে পুকুরের ৪/৫টি স্থানে সকালে ও বিকালে কমপক্ষে ২ বার খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছের আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যাবে। তবে বর্তমানে বাজারে কৈ মাছের জন্য উন্নত মানের ভাসমান/ডুবন্ত পিলেট জাতীয় সম্পূরক খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। যেগুলো ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ : কৈ মাছ ছাড়ার পর নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি পুকুরে মাঝে মাঝে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে প্রতি শতাংশে ৩ কেজি গোবর অথবা ১.৫ কেজি কম্পোস্ট সার, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২৫ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নমুনায়ন ও সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ : নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের জীবভর (Biomass) হিসাব করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। মজুদ ঘনত্বের ৫-১০% মাছের নমুনা সংগ্রহ করা উত্তম। ধৃত মাছের গড় ওজন বের করে এবং মাছের বাঁচার হার ৯০% ধরে মোট জীবভর নির্ণয় করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর মাছের নমুনায়নের মাধ্যমে মোট জীবভর পরিমাপ করে খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে ৪ মাসের মধ্যে কৈ মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয় এবং এ সময়ে প্রত্যেকটি মাছের গড় ওজন কমপক্ষে ১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। মাছের আকার, ওজন, বাজারদর, চুরিসহ অন্যান্য ঝুঁকি এবং পুকুরে মাছের ধারণ ক্ষমতা (Carrying capacity) বিবেচনায় রেখে আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাছের গুণগতমান ভাল রাখার জন্য মাছ আহরণের ১ দিন পূর্বে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে এবং পুকুরে জাল টেনে মাছ একত্রিত করে সামান্য পরিমাণ (২০-২৫ গ্রাম) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ২০ লিটার পানিতে গুলে নিয়ে সেই দ্রবণ জালে আটককৃত মাছে ছিটিয়ে দিয়ে ১ মিনিট রেখে মাছগুলোকে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় একে মাছ পাকাকরণ বলে। এর পরে মাছ আহরণ করে বাজারজাতকরণ করলে অনেক দূরত্বে পরিবহন করা যেতে পারে। এতে মাছের মৃত্যুহার অনেক কমে যায়। মনে রাখতে হবে কৈ মাছ যেহেতু জিওল মাছ তাই জীবিত অবস্থায় বাজারজাতকরণ করতে হবে। কোনোক্রমেই মৃত মাছ বাজারজাতকরণ করা যাবে না। কারণ জীবিত ও মৃত জিওল মাছের মূল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। মাছ আহরণের ক্ষেত্রে বেড় জাল অথবা ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সম্পূর্ণ মাছ আহরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পুকুর শুকিয়ে মাছ আহরণ করতে হবে। আহরণ শেষে মাছগুলো পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করে প্লাষ্টিক ড্রামে পরিমাণমতো পানি দিয়ে জিইয়ে রেখে দূর দূরান্তে পরিবহন করে মাছ বাজারজাতকরণ করা যেতে পারে। এতে মাছের ভালো বাজারমূল্য পাওয়া যায়।

থাই কৈ মাছ চাষের আর্থিক বিশ্লেষণ : ১ একর পুকুরে সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি-১১ এ দেয়া হলো-

সারণি-১০ : থাই কৈ মাছ চাষের আর্থিক বিশ্লেষণ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	টাকা
ক. ব্যয়ের হিসাব ১. পুকুর (নিজস্ব)	১ একর	-
২.পুকুর সংস্কার, পাড় মেরামত ও বেড়া স্থাপন	থোক	২০,০০০.০০
৩. চুন	১০০ কেজি	২০০০.০০
৪. ইউরিয়া	১৫০ কেজি	১৮০০.০০
৫. টিএসপি	৭৫ কেজি	২২৫০.০০
৬. গোবর সার	৭০০০ কেজি	৭০০০.০০
৭. সম্পূরক খাদ্য	৩৬০০ কেজি	১,৪৪০০০.০০
৮. কৈ মাছের পোনা	২০,০০০টি	৪০,০০০.০০
৯. সিলভার কার্পের পোনা	৩০০টি	৯০০.০০
১০. পারিবারিক শ্রম ও অন্যান্য মজুরী	থোক	১২০০০.০০
১১. মাছ বিক্রি খরচ	থোক	২০০৫০.০০
সম্ভাব্য মোট ব্যয়		**২,৫০,০০০.০০**

খ. আয়ের হিসাব

কৈ মাছ ২০,০০০টি (৯০% তি কেজির গড় মূল্য ২০০ হিসেবে ১৮০০ কেজি মাছের মূল্য
১৮০০x ২০০ = ৩,৬০,০০০ টাকা
সিলভার কার্প ৩০০টি (৯০% বাঁচার হার)
গড় ওজন ১ কেজি এবং প্রতি কেজির গড় মূল্য ৮০ টাকা হিসেবে ২৭০ কেজি মাছের মূল্য
মোট মূল্য ২৭০x৮০ = ২১,৬০০
= ৩,৬০,০০০ + ২১,৬০০
= ৩,৮১,৬০০
সম্ভাব্য নিট লাভ = (খ - ক) = ৩,৮১,৬০০ - ২,৫০,০০০
= ১,৩১,৬০০

সম্ভাব্য উৎপাদন এবং আয়-ব্যয়ের যে হিসাব দেখানো হয়েছে তা স্থান, কাল এবং ব্যবস্থাপনা ভেদে পরিবর্তন হতে পারে। ফলে লাভের অংশ কম বেশি হতে পারে।

কৈ মাছ চাষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : কৈ মাছ চাষে ঋতুভিত্তিক কিছু ঝুঁকি থাকে। তাই সঠিক ব্যবস্থাপনা না নিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন কি অনেক সময় মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। নিচে এমনি কিছু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নাম উল্লেখ করা হলো–

ক. বর্ষাকালে ঝুঁকি
খ. শুষ্ক মৌসুমের ঝুঁকি
গ. শীতকালীন ঝুঁকি
ঘ. ক্ষতিকর গ্যাস জনিত ক্ষতি
ঙ. মাছ চুরিজনিত ঝুঁকি
চ. মাছের রোগ
ছ. বেড়া বা জাল স্থাপন সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং
জ. মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত ঝুঁকি।

অনুশীলনী - ৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. থাই কৈ মাছ আমাদের দেশে কোন দেশ থেকে আমদানী করা হয়?

২. কোন মাছ কে Climbing perch বলা হয়?

৩. থাই কৈ মাছের বৈশিষ্ট্য লেখ।

৪. কৈ মাছ চাষের পুকুরে কেন বেড়া দেয়া হয়?

৫. সাধারণ ব্যবস্থাপনায় শতাংশপ্রতি কতটি থাই কৈ মাছের পোনা মজুদ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. থাই কৈ মাছ চাষের দুটি সুবিধা লেখ।

২. থাই কৈ মাছ চাষের ক্ষেত্রে কী অসুবিধা দেখা যায়?

৩. সনাতন পদ্ধতিতে পাতিলে কীভাবে কৈ মাছের পোনা পরিবহন করা হয়?

৪. আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে কৈ মাছের পোনা পরিবহন করা হয়?

৫. থাই কৈ মাছের পোনা কীভাবে শোধন করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. থাই কৈ মাছ চাষের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা কর।

২. থাই কৈ মাছের জন্য সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৩. থাই কৈ মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত?

চতুর্থ অধ্যায়

ভিয়েতনাম কৈ মাছের চাষ প্রযুক্তি

কৈ মাছ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে আবহমান কাল থেকে একটি অভিজাত ও জনপ্রিয় মাছ হিসেবে পরিচিত। এ মাছটি খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং কম চর্বিযুক্ত। আমাদের দেশে সাধারণত ৩ ধরনের কৈ মাছ পাওয়া যায়, যেমন-দেশী, থাই এবং ভিয়েতনাম কৈ। যদিও ৩ ধরনের কৈ -এর বৈজ্ঞানিক নাম *(Anabas testudineus)* একই তবুও এদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায় বিধায় এ মাছের বাজারমূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। অতীতে এ মাছটি খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, হাওর, বাঁওড় এবং প্লাবনভুমিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত কিন্তু দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ, প্রাকৃতিক জলাশয়ে পলিমাটি পড়ে ক্রমশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় এ মাছটির প্রাচুর্যতা কমে যাচ্ছে। পুকুরে দেশী কৈ মাছের বৃদ্ধিও আশানুরূপ হয় না। সে কারণে দেশী কৈ মাছের চাষ তেমন বিস্তার লাভ করে নাই।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশে থাইল্যান্ড থেকে ২০০২ সালে দ্রুত বর্ধনশীল কৈ মাছ আমাদের দেশে আনা হয় যা থাই কৈ নামে পরিচিত। এ মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং উৎপাদন দেশি কৈ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে চাষিদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পরবর্তীতে নানাবিধ কারণে বিশেষত হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইনব্রিডিং বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করায় থাই কৈ সহজেই এর দ্রুত বর্ধনশীল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এছাড়া ফ্যাকাশে বর্ণের কারণে বাজার মূল্য কম হওয়ায় চাষিরা ন্যায্য মূল্য পায় না বিধায় চাষের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উচ্চ ফলনশীল কৈ মাছের আরও একটি উন্নত জাত আমাদের দেশে আমদানি করা হয় যা ভিয়েতনাম কৈ নামে পরিচিত। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায়, ভিয়েতনাম কৈ মাছ থাই কৈ অপেক্ষা প্রায় ৬০% বেশি উৎপাদনশীল। ভিয়েতনাম কৈ এর রং ও স্বাদ অনেকটাই দেশী কৈ -এর মতো এ কারণে খুব দ্রুত এ মাছটি চাষিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ফলে চাষের ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে এ মাছটির গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা হলো।

ভিয়েতনাম কৈ মাছের গুরুত্ব

- এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল তাই ৪ মাসেই প্রায় ১৫০-২০০ গ্রাম হয়।
- এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষের জন্য উপযোগী।
- বর্ণ ও স্বাদ দেশী কৈ মাছের মতো তাই বাজার মূল্যও বেশি।
- শিং-মাগুর মাছের সাথে মিশ্রচাষে ৪ মাসেই শিং-মাগুর সহ এ মাছ বাজারজাত করা যায়।
- কম গভীরতা সম্পন্ন পুকুরেও এ মাছ চাষ করা যায়।
- এ মাছটির রোগবালাই কম।
- অতিরিক্ত শ্বাসন অঙ্গ থাকায় বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে এরা দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে বিধায় জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়।

থাই কৈ এবং ভিয়েতনাম কৈ এর মধ্যে পার্থক্য

থাই কৈ এবং ভিয়েতনাম কৈ এর মধ্যে সাধারণত নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

থাই কৈ	ভিয়েতনাম কৈ
তুলনামূলকভাবে ছোট, কম মাংসল ও লম্বাটে ধরণের।	তুলনামূলকভাবে বড়, মাংসল ও চওড়া ধরনের।
মাছের শরীরে কালো কালো ফোটা দেখা যায় ।	মাছের শরীরে কোনো ফোটা দাগ দেখা যায় না ।
পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ থাকে না	পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ থাকে ।

নার্সারি পুকুরে ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা লালন-পালন

নার্সারি পুকুর তৈরি : নার্সারি পুকুরের আয়তন ১০-৪০ শতাংশ হলে ভালো হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে পুকুর ভালোভাবে শুকাতে হবে। এর পর শতাংশপ্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম গুঁড়া চুন শুকনো পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে পানি দেয়ার পূর্বে অবশ্যই পুকুরের চারপাশ ৩ ফুট উঁচু করে মশারির নেট ও খুঁটি দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ : পুকুর শুকনো অবস্থায় হালকা শুকনো গোবর শতাংশপ্রতি ৫ কেজি হারে ছিটিয়ে দিতে হবে। ৩ দিন পরে ২-৩ ফুট পানি দিয়ে পুকুর পূর্ণ করে দিতে হবে। পানি দেয়ার ৩ দিন পর হাঁসপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩ মিলি/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন -এর যেকোন একটি ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। ঔষধ দেয়ার ৭/৮ ঘন্টা পর শতাংশপ্রতি ১০০ গ্রাম হারে ময়দা পানিতে গুলে নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সুমিথিয়ন দেয়ার ২৪ ঘণ্টা পর অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকৃত কৈ মাছের রেণুপোনা মজুদ করতে হবে।

রেণুপোনা মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা : প্রস্তুতকৃত পুকুরে শতাংশপ্রতি ৫০ গ্রাম হারে রেণুপোনা মজুদ করতে হবে। রেণু মজুদের পর থেকে নিম্নের সারণি অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিদিন খাদ্য দেয়ার পূর্বে হাপা টেনে রেণুপোনার পেটে কী পরিমাণ খাদ্য আছে তা পরীক্ষা করতে হবে। রেণু মজুদের ৪-৫ দিন পর থেকে সকাল-বিকাল হড়রা টানতে হবে। প্রত্যেকবার হড়রা টানার পর নার্সারি খাদ্য (৩৫-৪০% প্রোটিন) পানিতে গুলে নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। নিচে লিখিত সারণি-১১ অনুয়ায়ী খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি-১১ : রেণুপোনার প্রতি দিনের খাদ্য তালিকা

দিন	রেণুর ওজন	প্রতিবারে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ
১-৩ দিন	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম নার্সারি ফিড ও ২টি ডিম
৪-৭ দিন	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম নার্সারি ফিড
৮-১৫ দিন	৩০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম নার্সারি ফিড
১৬-২২ দিন	৫০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম নার্সারি ফিড
২৩-৩০ দিন	৯০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম নার্সারি ফিড

৩০ দিন নার্সারি পুকুরে রেণুপোনা লালন-পালন করার পর সকাল বেলা বেড় জাল দ্বারা পোনা আহরণ করে মজুদ পুকুরে মজুদ করতে হবে।

মজুদ পুকুরে ভিয়েতনাম কৈ মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনলে ছোট-বড় সব পুকুরেই এ মাছ চাষ করা সম্ভব। তবে পুকুর নির্বাচনের

ওপর ভিয়েতনাম কৈ মাছ চাষের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুকুর নির্বাচনের সময় নিচে লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

- সাধারণত দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ বা কম কাদাযুক্ত মাটির পুকুর ভিয়েতনাম কৈ চাষের জন্য বেশি উপযোগী।
- যে সমস্ত পুকুরে বন্যার পানি প্রবেশ করে না এবং পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি এরূপ মাঝারি উঁচু পুকুর এ মাছ চাষের জন্য উপযোগী।
- ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য এ মাছ চাষের পুকুর আয়তাকার এবং আকার ৪০-৬০ শতাংশের হলে ভাল হয়। তবে এর চেয়ে বড় বা ছোট পুকুরেও এ মাছ চাষ করা যায়।
- পুকুরের গভীরতা ৩-৫ ফুট হলে ভালো হয় ও
- পুকুরের পানি কমিয়ে মাঝে মাঝে গভীর বা অগভীর নলকূপের সাহায্যে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

পুকুর প্রস্তুতি : পুকুর প্রস্তুতির সময় নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করা আবশ্যক

- পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে তা অবশ্যই মেরামত করতে হবে। পুকুরের চারপাশ কমপক্ষে ৩ ফুট উঁচু করে মশারির নেট ও খুঁটি দিয়ে ভালোভাবে ঘিরে দিতে হবে,
- পুকুর পুরাতন হলে তলা অবশ্যই ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। সম্ভব হলে তলায় লাঙ্গল দ্বারা হাল চাষ অথবা কোদাল দ্বারা মাটি উলটপালট করে দিতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে অনুমোদিত মাত্রায় মাছ মারার ঔষধ (রোটেনন- ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি) প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন অথবা ব্লিচিং পাউডার অথবা জিয়োলাইট প্রয়োগ করতে হবে।
- চুন/ব্লিচিং পাউডার/জিয়োলাইট প্রয়োগের ৩ দিন পর বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পুকুর ৩-৫ ফুট পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে।
- এর পর প্রতি শতাংশে ১০০ মি.লি. চিটা গুড়ের সাথে ৫০ গ্রাম আটা মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে পানি হালকা বাদামি বর্ণের হবে। অতঃপর ৩ দিন পর আনুপাতিক হারে পোনা মজুদ করতে হবে।

পোনা প্রাপ্তি : ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বড় বড় হ্যাচারিতে পাওয়া যায়।

পোনা মজুদ : পুকুরে ভিয়েতনাম কৈ একক বা অন্য প্রজাতির সাথে চাষ করা যায়। চাষ পদ্ধতি নির্ভর করবে চাষির কর্মদক্ষতা ও আর্থিক সচ্ছলতার ওপর। পোনা মজুদের ক্ষেত্রে ১-১.৫ ইঞ্চি আকারের ০.১৫ - ০.২০ গ্রাম ওজনের (৬০০০-৫০০০টি/কেজি) সুস্থ সবল পোনা আনুপাতিক হারে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে পুকুরে ছাড়তে হবে। সারণি-১২ এ পোনা মজুদের একটি মডেল দেখানো হলো।

সারণি-১২ : শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের মডেল

প্রজাতি	মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা/শতাংশ)
ভিয়েতনাম কৈ	৪০০
শিং	৩০
মাগুর	২৫
মনোসেক্স তেলাপিয়া	৩০
সিলভার কার্প	০৫
রাজপুঁটি	১০
মোট	৫০০

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : বাণিজ্যিকভাবে ভিয়েতনাম কৈ মাছ চাষ করতে হলে মাছকে অবশ্যই চাহিদামতো সুষম সম্পূরক খাবার খাওয়াতে হবে। খাদ্য খাওয়ানোর ওপরই ভিয়েতনাম কৈ মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। খাদ্যে কমপক্ষে ৩০% হজমযোগ্য প্রাণিজ আমিষ থাকতে হবে। ৩০% আমিষ না থাকলে কৈ মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না। বাজারে বেশ কয়েকটি মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভিয়েতনাম কৈ মাছের ভাসমান বাণিজ্যিক খাবার পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য বাছাই করে মাছকে খাওয়াতে হবে। নিচে মাছের বিভিন্ন বয়সের খাদ্য তালিকা দেয়া হলো।

সারণি-১৩ : মাছের বয়স অনুয়ায়ী খাদ্য তালিকা

মাছের আকার (সংখ্যা/কেজি)	খাদ্য প্রয়োগ দৈহিক ওজনের শতকরা (%) হার	প্রয়োগ মাত্রা (বার)
৫০০০	১০০	৪
৪০০০	৭৫	৪
৩০০০	৫০	৩
২০০০	৪০	৩
১০০০	৩৫	৩
৮০০	৩০	২
৫০০	২৫	২
৪০০	২০	২
৩০০	১৫	২
১০০	১২	২
৭৫	১০	২
৫০	৮	২
৪০	৭	২
২৫	৫	২
১৫	৩	২
১০	২.৫	২

ভিয়েতনাম কৈ মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা : উচ্চ মজুদ ঘনত্ব ও বদ্ধ জলজ পরিবেশে উচ্ছিষ্ট খাবার, মাছের বিপাকীয় বর্জ্য ও অন্যান্য বর্জ্য পচে পানি দূষিত হয়ে কৈ মাছের রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। খামারে একবার জীবাণু প্রবেশ করলে তাকে নির্মূল করা খুব কঠিন। তাই খামারে জীবাণু প্রবেশের পূর্বেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

- ইনব্রিড/ক্রসব্রিডমুক্ত সুস্থ ও সবল পোনা সংগ্রহ করা।
- খামার ও মাছ চাষের সকল উপকরণ জীবাণুমুক্ত রাখা।
- এক খামারে ব্যবহৃত জাল জীবাণুমুক্ত না করে অন্য খামারে ব্যবহার না করা।
- উচ্চ মজুদ ঘনত্ব পরিহার করা।
- পরিমিত ও সুষম খাবার প্রয়োগ করা।
- পরিবহনের সময় পোনা আঘাত পেলে ক্ষতরোগের আশাঙ্কা বৃদ্ধি পায়।
- ক্ষতরোগ প্রতিরোধে শীতের শুরু হতে ১৫ দিন পর পর প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম লবণ ও ১৫০ গ্রাম জিয়োলাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ক্ষতরোগের প্রাদুর্ভাব হলে পুকুরে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। এন্টিবায়োটিক হিসেবে প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ২ গ্রাম ভিটামিন-সি মিশিয়ে নিয়মিত পরপর ১০ দিন খাওয়াতে হবে।

এডওয়ার্ডসিয়েলোসিস রোগ : ভিয়েতনাম কৈ মাছ সাধারণত এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এডওয়ার্ডসিয়েলা নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ বিস্তার লাভ করে। পচা জৈবিক পদার্থ সমৃদ্ধ পুকুরে এই জীবাণু সহজেই বংশ বিস্তার এবং মাছের দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

রোগের লক্ষণ

- প্রথমে মাছের ত্বকে ক্ষত দেখা যায়।
- এই ক্ষত দ্রুত মাংসপেশিতে ছড়িয়ে পড়ে।
- আক্রান্ত স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং উক্ত স্থানে পচন ধরে।
- আক্রান্ত মাছের যকৃৎ ও বৃক্কে পচন ধরে।
- মাছের আক্রান্ত স্থান থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।
- কখনও কখনও মাছের যকৃতে পুঁজ জমতে দেখা যায়।

প্রতিরোধ

জলাশয়ের পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রেখে, সঠিক ঘনত্বে মাছচাষ করলে এ রোগ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রতিকার

আক্রান্ত মাছকে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন মিশিয়ে পর পর ১০ দিন খাওয়াতে হবে, প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৫ মিলিগ্রাম কট্রিম মিশিয়ে পর পর ১০ দিন মাছকে খাওয়ালে এ রোগে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

এক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলা দরকার তা হলো–

- সপ্তাহে ৬ দিন খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- একটানা মেঘলা আবহাওয়ায় কিংবা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে অথবা খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে।
- ভাসমান পিলেট খাদ্য দিনে ৩ বার সকালে ১০টায় দুপুরে ১টায় এবং বিকেলে ৪টায় সরবরাহ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- মাছের ওজন ১০০টি/কেজি না আসা পর্যন্ত নার্সারি পাউডার খাদ্য মাছকে খাওয়াতে হবে।
- মাছ নিয়মিত খাবার খায় কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে ৩ দিন অন্তর অন্তর দিনে ১ বার হড়রা টানতে হবে।
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর মাছের নমুনায়ন করে দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে।
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর পানির গুণাগুণ যেমন– তাপমাত্রা, অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া ও মোট ক্ষারকত্ব পরীক্ষা করা ভালো।
- পোনা মজুদের ১ মাস পর থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর সম্ভব হলে ৫০% পানি পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়।
- পুকুরে মাছের আশ্রয়ের জন্য প্লাস্টিকের ৩-৪ ফুট লম্বা পাইপ বা বাঁশের চোঙ্গা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য প্রতি মাসে ১ বার শতাংশপ্রতি ১৫০ গ্রাম জিয়োলাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- অনেক সময় বক/মাছরাঙা/জলজ পাখি ইত্যাদির মাধ্যমে এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে তাই পাখি দূর করতে পুকুরের চারদিকে এক পাড় অন্য পাড়ে আড়াআড়িভাবে রঙিন ফিতা অথবা পলিথিন টানিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- ৪ মাস এ পদ্ধতিতে চাষ করার পর পুকুর শুকিয়ে অথবা বেড় জাল দিয়ে সমস্ত মাছ ধরে জীবিত অবস্থায় বাজারজাত করতে হবে।
- প্রতিবার নতুন করে ভিয়েতনাম কৈ চাষ শুরু করার সময় অবশ্যই সম্পূর্ণ পুকুর শুকিয়ে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে।

সারণি-১৪ : ১ একর (১০০ শতাংশ) পুকুরে আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্যয় :

ব্যয়ের খাত	টাকা
পুকুরের লিজ মূল্য	৩০,০০০.০০
পোনা ক্রয়	৫০,০০০.০০
চুন	১,২০০.০০
শ্রমিক	২০,০০০.০০
রোগ ব্যবস্থাপনা	১০,০০০.০০
পরিবহন খরচ	১০,০০০.০০
খাদ্য ৯০০ কেজি (প্রতি কেজি ৫০/-)	৪,৫০,০০০.০০
মোট ব্যয়	৫,৭১,২০০.০০

আয় :

কৈ মাছ ২০,০০০টি (৯০% বাঁচার হার)।

গড় ওজন ২০০ গ্রাম এবং প্রতি কেজির গড় মূল্য ২০০ হিসেবে ৪০০০ কেজি মাছের মূল্য

৪০০০ x ২০০ = ৮,০০,০০০ টাকা

সিলভার কার্প ৩০০টি (৯০% বাঁচার হার)

গড় ওজন ১ কেজি এবং প্রতি কেজির গড় মূল্য ৮০ টাকা হিসেবে ২৭০ কেজি মাছের মূল্য

মোট মূল্য ২৭০x৮০ = ২১,৬০০

= ৮,০০,০০০ + ২১,৬০০

= ৮,২১,৬০০

সম্ভাব্য নিট লাভ = ৮,২১,৬০০ - ৫,৭১,২০০ = ২,৫০,৪০০ টাকা

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভিয়েতনাম কৈ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।

২. ভিয়েতনাম কৈ মাছ কত সালে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়?

৩. নার্সারি পুকুরে শতাংশে কত গ্রাম ভিয়েতনাম কৈ মাছের রেণু মজুদ করা যায়?

৪. ভিয়েতনাম কৈ চাষের জন্য পুকুরের আয়তন কত হলে ভালো হয়?

৫. ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা কোন সময় পাওয়া যায়?

৬. মিশ্রচাষে শতাংশ প্রতি কতটি ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা মজুদ করা যায়?

৭. ভিয়েতনাম কৈ মাছের খাদ্যে শতকরা কত ভাগ আমিষ থাকা প্রয়োজন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভিয়েতনাম কৈ এবং থাই কৈ মাছের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখ।

২. নার্সারি পুকুরে হাঁসপোকা দমনে ব্যবহৃত ২টি ঔষধের নাম লেখ।

৩. ভিয়েতনাম কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধকল্পে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

৪. এডওয়ার্ডসিয়েলোসিস রোগের লক্ষণ কী কী?

৫. এডওয়ার্ডসিয়েলোসিস রোগ প্রতিরোধকল্পে কী প্রতিষেধক ব্যবহার করা যেতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভিয়েতনাম কৈ মাছ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. ভিয়েতনাম কৈ মাছ চাষের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫ম অধ্যায়

শিং-কার্প মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি

শিং মাছ আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় জিওল মাছ। পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ ভরাট ও পানিশূন্য হওয়ায় এ মাছ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও সরবরাহ কম ও বেশি দামের কারণে এ মাছ সাধারণত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকছে না। বাংলাদেশের আবহাওয়া শিং মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী এবং এ মাছ সহজেই হাজা-মজা বা ভালো পুকুরে এককভাবে বা অন্যান্য চাষযোগ্য প্রজাতির সাথে মিশ্রচাষ করা যায়।

শিং মাছ চাষের সুবিধা

- এদেশের মাটি ও আবহাওয়া শিং মাছ চাষের উপযোগী।
- শিং মাছে পুষ্টিমান বেশি। সাধারণত রুগী ও শিশুদের পুষ্টির জন্য পথ্য হিসেবে এ মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।
- এ মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য দুটোই বেশি।
- বদ্ধ পানিতে যেকোনো পরিবেশে একক ও মিশ্রচাষ করা যায়। মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে সাথী মাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।
- বাজারে প্রাপ্ত যেকোন খাদ্য উপকরণ সহজেই এ মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় জীবিত অবস্থায় সহজেই পরিবহন ও বিক্রি করা যায়।
- এ মাছ চাষের ফলে জলাশয়ের তলার পরিবেশ উন্নত হয়।
- যেকোনো মৌসুমী পুকুর, কম গভীর জলাশয়, ছোট-বড় ডোবা, গর্ত বা টিউবওয়েলের পাশে জমে থাকা পানিতেও এ মাছের চাষ করা যায়।

চিত্র-৬ : শিং মাছ

পুকুর নির্বাচন ও পুকুর প্রস্তুতি

- ৪ ফুট গভীরতা সম্পন্ন ৪০-৫০ শতাংশ পুকুর শিং মাছ চাষের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। পুকুরটি আয়তকার হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। চাষের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় বর্গাকার পুকুরের চেয়ে আয়তাকার পুকুরে একই হারে খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ১০ গুণ বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়,
- নতুন ও পুরাতন উভয় পুকুরে শিং মাছ চাষ করা যায়। তবে পুরাতন কাদাযুক্ত পুকুরে শিং মাছ দ্রুত বড় হয়। যে পুকুরে মোটেই কাদা নেই এবং তলা শক্ত সে পুকুরে উৎপাদন আশানুরূপ হবে না। নতুন পুকুরে শিং মাছ চাষ করতে হলে পুকুরের তলা ভালোভাবে চাষ দিয়ে শতাংশপ্রতি কমপক্ষে ২০

কেজি গোবর সার প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

- পুকুরটি অবশ্যই প্লাবন ও জলাবদ্ধতামুক্ত হতে হবে। বর্ষাকালে যেসব পুকুরের পাড় থেকে অন্তত দুই ফুট নিচে পানি থাকে সে রকম পুকুরই নির্বাচন করা উচিত। পাড়ে কোনো প্রকার ছিদ্র থাকলে সমস্ত শিং মাছ ছিদ্রপথে চলে যাবে।
- যেসব পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে এবং বাতাস চলাচল করে সেসব পুকুর শিং মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।
- শিং মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছ আহরণের সুবিধার জন্য পুকুরের তলদেশ একদিকে সামান্য ঢালু বা গর্ত থাকলে ঢালু অংশে বা গর্তে পুকুর শুকানোর সময় মাছ জমা হবে। যেখান থেকে সহজে মাছ আহরণ করা যাবে। তা না হলে পুকুর শুকালে সমস্ত পুকুরে মাছ ছড়িয়ে যাবে।
- ঢোঁড়া সাপ/ব্যাঙ শিং মাছের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরুপ। ঢোঁড়া সাপ/ব্যাঙ নিরবে-নিভৃতে নির্বিচারে শিং মাছ নিধন করে। শিং পোনার চলার ধীর গতির কারণে সাপ অনেক পোনা খেয়ে ফেলতে পারে। পুকুরে পানি প্রবেশ করানোর পূর্বেই তাই চারিদিকে জাল দ্বারা ভালোভাবে ঘিরে দিতে হবে। এতে সাপ বা ব্যাঙ পুকুরে ঢুকতে পারবে না।
- পুকুর পাড় মেরামত করে পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পুকুর শুকিয়ে ফেলতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।
- শতাংশপ্রতি ১ কেজি চুন, ১০ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করে পুকুর তৈরি করতে হবে।
- সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পুকুরের পানি সবুজ বা হালকা বাদামি হলে পোনা মজুদ করতে হবে। শিং মাছের পুকুর উর্বর না হলে অনেক সময় শিং মাছ মজুদের পর পোনা আঁকা বাঁকা হয়ে যায়।
- প্রয়োজনের সময় পুকুরটিতে পানি দেয়ার সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

পোনা মজুদ : প্রাকৃতিক বা হ্যাচারি উৎস থেকে শিং মাছের পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। পোনা মজুদের পূর্বে অবশ্যই ছত্রাকনাশক দ্বারা পোনা শোধন করে পরে পুকুরে ছাড়তে হবে। পোনা মজুদের ৩ দিন পরে আবার ছত্রাকনাশক দ্বারা পূনরায় চিকিৎসা করতে হবে। একক চাষ পদ্ধতির জন্য প্রতি শতাংশে ২-৩ ইঞ্চি আকারের পোনা ২৫০টি পর্যন্ত মজুদ করা যেতে পারে। উন্নতমানের খাবার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে পোনা মজুদের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

কার্প ও অন্যান্য মাছের সাথে শিং মাছের চাষ : বর্তমানে অধিক ঘনত্বে থাই কৈ, পাঙ্গাশ ও মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষ করা হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে যেসব পুকুরে পরিকল্পিতভাবে খাদ্য প্রয়োগ করে শুধুমাত্র কার্প জাতীয় মাছের চাষ করা হয় সেসব পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের সাথেও এসব প্রজাতির মাছচাষ করা হয়ে থাকে । মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের সাথে শতাংশপ্রতি ২-৩ ইঞ্চি আকারের শিং মাছের পোনা ২০-৩০টি, সিলভার কার্প ৫-৬টি, কাতলা ৪-৫টি এবং রুই মাছের পোনা ১০-১২টি মজুদ করা হয় তাহলে এরা পুকুরের তলার বর্জ্য পদার্থ খেয়ে কাদায় জমাকৃত অ্যামোনিয়া গ্যাস দূর করে পুকুরের তলার পরিবেশ মাছ চাষের অনুকূলে রাখে। বাড়তি কোনো খাদ্য ও পরিচর্যা ছাড়াই শিং পোনাগুলো দ্রুত বড় হয়। উন্নতমানের খাবার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে পোনা মজুদের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

খাদ্য উপকরণ

খাবার হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ক্যাটফিশ ফিড (শিং মাছ) কিংবা নিম্নে উল্লেখিত ফর্মুলা অনুযায়ী খাবার তৈরি করে দেয়া যেতে পারে।

সারণি-১৫ : ক্যাটফিশ (শিং মাছ) ফিড -এর খাদ্যোপাদানে মিশ্রণের হার

খাদ্যোপাদান	মিশ্রণের হার (%)
ফিশমিল	২৫%
মিট অ্যান্ড বোন মিল	১৫%
সরিষার খৈল	২০%
চালের কুঁড়া	২০%
গমের ভুসি	১৫%
চিটা গুড়	৪%
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	১%

মাছের দেহের ওজনের ৪-৫% হারে দিনে ২ বার খাবার দিতে হবে।

খাদ্য গ্রহণ : খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে শিং মাছের কোনো বাছবিচার নেই। যেকোনো ধরনের খাদ্যগ্রহণে কোনো অনীহা নেই। পুকুরে শিং মাছের পোনা মজুদের পর প্রথম ১০ দিন মাছের দৈহিক ওজনের ২০% হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। ছোট শিং মাছ সাধারণত রাতের বেলায় খাদ্য খেতে বেশি পছন্দ করে। তাই মোট খাদ্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ সকাল বেলায় ও $\frac{২}{৩}$ অংশ সন্ধ্যার সময় পুকুরে দিতে হবে। শিং মাছের খাদ্যে প্রোটিন চাহিদা একটু বেশি। খাদ্যে ৩৫ শতাংশ প্রোটিন থাকা প্রয়োজন, তন্মধ্যে কমপক্ষে ১২ শতাংশ প্রাণিজ প্রোটিন অবশ্যই থাকতে হবে। মানসম্মত সুষম খাদ্য না খাওয়ালে শিং মাছ আশানুরূপ বড় হয় না। শিং মাছের খাদ্যের ব্যাপারে দুটি বিষয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রথম বিষয়টি হলো দেশী ফিশমিল বা শুঁটকি নিয়ে। ফিশমিলে ব্যবহৃত শুঁটকি যদি শতকরা পাঁচ ভাগও কীটনাশকযুক্ত হয় তাহলে সবগুলো ফিশমিলই বিষাক্ত হয়ে যাবে যা শিং মাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। শিং মাছের খাদ্যে দেশি ফিশমিল ব্যবহার করলে ঐ ফিশমিলের সামান্যতম অংশও যদি কীটনাশকের প্রভাবে বিষাক্ত হয় তাহলে কিছুতেই শিং মাছ বাঁচানো যাবে না। "স্লো পয়জনিং" হয়ে মড়ক দেখা দিয়ে ধীরে ধীরে সব মাছ মারা যাবে। একবার "স্লো পয়জনিং" হলে কোনোভাবেই সেই মাছ বাঁচানো যায় না। তাই নিজের তৈরি খাদ্য হোক আর বাজারে তৈরি খাদ্য হোক খাদ্য ব্যবহারের পূর্বে দেশী ফিশমিলের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এ জন্য দেশী ফিশমিল পরিহার করে বিদেশি উন্নতমানের ফিশমিল ব্যবহার করলে বিষক্রিয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো খাদ্য উৎপাদনের মান নিয়ে। শিং মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানগুলো যাতে সতেজ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পুরোনো খাদ্য উপাদান (যেমন-খৈল, কুঁড়া, ভুট্টা, রাইচ পলিশ, সয়ামিল ইত্যাদি) ছত্রাকে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় খালি চোখে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে ছত্রাক দেখাও যায়না। যদি ছত্রাকে আক্রান্ত খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি খাদ্য শিং মাছকে খাওয়ানো হয় তাহলেও শিং মাছের মড়ক দেখা দেয়। তাই পুরোনো খাদ্য উপাদান পরিহার করে তরতাজা খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি খাদ্যই শিং মাছকে খাওয়ানো বাঞ্ছনীয়। সয়ামিল ছত্রাকে বেশি আক্রান্ত হয়। তাই

শিং মাছের খাদ্য উপাদান থেকে সয়ামিল বাদ দেয়া উচিত। উপরোক্ত দুটি বিষয়ে সর্বদা সতর্ক না থাকলে শিং মাছ চাষিকে এর জন্য চরম ক্ষতির শিকার হতে হবে।

পুকুর ব্যবস্থাপনা : পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য নিচে লিখিত কাজগুলো সঠিকভাবে করা দরকার-

- মাঝে মাঝে হড়রা টেনে কাদার স্তর ভেঙে দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে প্রতি ২০ দিন পর পর পুকুরে শতাংশপ্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম জিয়োলাইট প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পানি ও কাদার ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় অ্যামোনিল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো প্রতি ২০ দিন পর পর প্রতি শতাংশে ১৫ গ্রাম হারে প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করলে পুকুরে কোটি কোটি উপকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম নেয় যেগুলো অপকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। ফলে মাছ সুস্থ ও সবল থাকে। প্রোবায়োটিক প্রয়োগের ১০ দিন পর জিয়োলাইট প্রয়োগ করতে হবে। এর ১০ দিন পর আবার প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রয়োগ করতে হবে। অধিক ঘনত্বে এককভাবে শিং মাছ চাষের সফলতা মূলত এ দুটি উপাদান প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। এ ব্যাপারে কোনো অবহেলা না করাই ভালো,
- পুকুরে সবুজ কণার আধিক্য এবং মাছে ক্ষত রোগ দেখা দিলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে,
- প্রতি মাসে মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা দেখার জন্য জাল টেনে নমুনায়ন করতে হবে,
- শিং মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে গাছের গুঁড়ি, ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, ডাবের খোলস, বোতল, ভাঙা পাইপ, বাঁশের চোঙ্গা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বর্ষাকালে পুকুরের পাড় বেয়ে শিং মাছ পুকুর থেকে চলে যায়, এ ধারণাটা আসলে পুরোপুরি সত্য নয়। যে কোন উৎস (যেমন-পুকুর পাড়, রাস্তা, বাড়ির আঙিনা ইত্যাদি) থেকে বৃষ্টির সময় যদি ধারা আকারে পুকুরে পানি প্রবেশ করে তখন দলবদ্ধ হয়ে শিং মাছ ঐ ধারা অনুসরণ করে ওঠার চেষ্টা করে। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন মাছের পেটে ডিম আসে তখন হঠাৎ বজ্রবৃষ্টি হলে কোনো উৎস থেকে যদি ক্ষীণ ধারায়ও পুকুরে পানি প্রবেশ করে তখন পানির ঐ ধারা অনুসরণ করে শিং মাছ ওঠার প্রবণতা দেখা যায়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য পুকুর প্রস্তুতির সময়ই পানি প্রবেশের ঐ স্থানগুলি মজবুত করে মাটি দিয়ে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

শিং মাছের বর্ধন হার : যেকোনো মাছের বর্ধনের হার অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন- মাছের ঘনত্ব, খাদ্যের পরিমাণ, পুকুরের উর্বরতা, মাটি ও পানির গুণাগুণ, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়। মৎস্য খামারের বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ১০ মাসের চাষে প্রতিটি স্ত্রী শিং ১২৫ গ্রাম পর্যন্ত বড় হয়। পুরুষ শিং একই সময়ে ৪০-৫০ গ্রামের বেশি বড় হয় না। অধিক ঘনত্বে শিং মাছের একক চাষে যদি সব ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে করা হয় তাহলে প্রতিটি শিং গড়ে নিঃসন্দেহে ৬০-৭০ গ্রাম বড় হয়।

রোগবালাই প্রতিরোধ : শিং মাছ একটু শক্ত প্রকৃতির মাছ হওয়ায় রোগ ব্যাধি খুব একটা দেখা যায় না। পুকুরে শিং মাছ সাধারণত পরজীবী বা জীবাণু দ্বারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ক্ষতরোগ ও পেটফোলা রোগ অন্যতম। এসব রোগ প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শীতকালের পূর্বে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। যদি রোগ হয়েই যায় তাহলে শতাংশপ্রতি ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ ৪/৫ দিন পর পর ২/৩ বার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি শতাংশপ্রতি স্বাভাবিক গভীরতায় ১ গ্রাম হারে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

- পোনা মজুদের সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পোনা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।
- পুকুরের পানি নষ্ট হলে পরিবর্তন করতে হবে।
- পানির গুণাগুণ নষ্ট হলে মাছে ঘা দেখা দিতে পারে। এই রোগে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন এবং ১ কেজি লবণ দুই বারে তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।
- এছাড়াও প্রতি মাসে পুকুরে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে পানির গুণাগুণ ভালো থাকে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মুক্ত জলাশয়ে প্রচুর শিং মাছ ধরা পড়ে। তখন বাজারে মাছের মূল্য অনেক কম থাকে। ঐ সময়টাতে শিং মাছ ধরা বা বিক্রি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাজারে মাছের খুব অভাব থাকে। তাই মূল্যও চড়া থাকে। তখন শিং মাছের পেটে ডিম আসে। ডিমওয়ালা শিং মাছের আকর্ষণই আলাদা। তখন শিং মাছ বিক্রি করা হয় তাহলে সর্বাধিক মূল্য পাওয়া যায়। বেড় জালে শিং মাছ বেশি ধরা পড়ে না। তাই সম্পূর্ণ শিং মাছ ধরতে হলে পুকুর সম্পূর্ণরূপে সেচতে হবে। পুকুর সেচে মাছ ধরার পরও ১০% মাছ কাদাতে লুকিয়ে থাকে। ৮-১০ ঘণ্টার মধ্যে এগুলো কাদা থেকে বেরিয়ে আসে। সম্পূর্ণ মাছ ধরার পর পরবর্তী চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতির কাজ শুরু করতে হবে।

সম্ভাব্য আয় ব্যয়

সারণি-১৬ : ১০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে শিং মাছের উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়ের বিবরণ	মোট সংখ্যা/পরিমাণ	সম্ভাব্য একক দর (কেজি/সংখ্যা)	মোট ব্যয় (টাকা)
পুকুর ভাড়া	-	থোক	১৫০০.০
পুকুর প্রস্তুতি	-	থোক	২০০.০
চুন	১০ কেজি	১২.০	১২০.০
গোবর সার	২০০ কেজি	১.০	২০০.০
ইউরিয়া	১ কেজি	১০.০	১০.০
টিএসপি	১ কেজি	২০.০	২০.০
পোনা	২৫০০টি	২.০	৫০০০.০
খাদ্য	১৫০ কেজি	৪৫.০	৬৭৫০.০
আহরণ ও অন্যান্য ব্যয়	-	-	১০০০.০
মোট ব্যয়			**১৪,৮০০.০**

উৎপাদন ও আয়

শিং মাছ ৭৫ কেজি

আয় ও ব্যয়

প্রতি কেজি ৪০০ টাকা করে ৭৫ দ্ধ ৪০০ = ৩০,০০০ টাকা

নিট লাভ = ৩০,০০০ - ১৪,৮০০ = ১৫,২০০ টাকা

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিং মাছ চাষের ২টি সুবিধা লেখ।

২. শিং মাছ চাষে পুকুরের গভীরতা কত হলে ভালো হয়?

৩. পুকুর প্রস্তুতকালীন সময় সার প্রয়োগের মাত্রাটি লেখ।

৪. একক চাষের ক্ষেত্রে শতাংশপ্রতি কতটি শিং মাছের পোনা মজুদ করা যায়?

৫. মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে শতাংশপ্রতি কতটি শিং মাছের পোনা মজুদ করা যায়?

৬. শিং মাছ সাধারণত কখন খাদ্য গ্রহণ করে থাকে?

৭. শিং মাছের প্রজননকাল কোন সময়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিং মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে?

২. শতাংশপ্রতি কতটি শিং মাছের পোনা ছাড়া যেতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিং মাছের চাষ কৌশল বর্ণনা কর।

২. শিং মাছের আহরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩. শিং মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

দেশী মাগুর মাছের একক চাষ ব্যবস্থাপনা

বাজারে ব্যাপক চাহিদা ও উচ্চমূল্য এবং অত্যন্ত লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও পোনার অপ্রতুলতার কারণে দেশী মাগুরের চাষ আশানুরূপ প্রসার লাভ করছে না। প্রাকৃতিক উৎসে আর তেমন দেশী মাগুরের পোনা পাওয়া যায় না। তদুপরি প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি থেকে মাগুর মাছের মানসম্পন্ন পোনা সংগ্রহ করে চাষ করা গেলে এ মাছটির চাষ যেমন লাভজনক হবে তেমনি প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষও পাওয়া যাবে।

মাগুর মাছ চাষের সুবিধা

- বাজারে মাগুর মাছের দাম ও চাহিদা দুটোই বেশি।
- হাজা-মজা পুকুর, ডোবা বা যে কোনো ধরনের জলাশয়ে, এমনকি চৌবাচ্চা বা খাঁচাতেও এ মাছের চাষ করা যায়।
- বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
- এ মাছে আমিষের পরিমাণ বেশি, চর্বির পরিমাণ কম এবং খেতেও সুস্বাদু। তাই রোগীর পথ্য হিসেবে এর ব্যবহার সর্বজনীন এবং আন্তঃপেশি কাঁটা না থাকায় শিশুদের কাছেও প্রিয়।
- বিরূপ পরিবেশের পানিতেও এরা স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। অক্সিজেনের অভাব, পানি দূষণ, পানি অত্যধিক গরম হলেও এরা বাঁচতে পারে।
- এরা বদ্ধ পানিতে ডিম দেয়।
- অন্য মাছের তেমন ক্ষতি করে না বলে রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায় ও
- অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় জীবিত অবস্থায় এ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ করা যায়।

পুকুর নির্বাচন ও পুকুর প্রস্তুতি : শিং মাছের পুকুর প্রস্তুতির অনুরূপভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে।

পোনা মজুদ : প্রাকৃতিক উৎস থেকে মে-জুন মাসে পোনা সংগ্রহ করে মজুদ করতে হবে। একক পদ্ধতিতে মাগুর মাছ চাষে ২-৩ ইঞ্চি আকারের পোনা প্রতি শতাংশে ১০০-২০০টি মজুদ করা যায়। কিন্তু একক চাষ ছাড়া রুইজাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষে মাগুর মাছের পোনা শতাংশপ্রতি ৫০-১০০টি হারে ছাড়া যায়। পোনা শোধন করার জন্য পোনা ছাড়ার সময় ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ (৫ গ্রাম) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১-২ মিনিট রেখে পুকুরে ছাড়লে পোনা মৃত্যুহার কম হয়।

চিত্র -৭ : মাগুর মাছ

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ : অন্যান্য মাছ চাষের ন্যায় মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে ১০ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি এবং ইউরিয়া ও টিএসপি ১০০ গ্রাম হারে ১০ দিন পর পর সারা পুকুরের পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে পুকুরের পানিতে অতিরিক্ত শ্যাওলা দেখা দিলে বর্ষাকালে ও শীতকালে সার প্রয়োগের হার কমিয়ে দিতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : মাগুর মাছ পুকুরের তলার আধা-পচা পাতা, কীটপতঙ্গ ও তাদের শূককীট ইত্যাদি খেয়ে থাকে। তা ছাড়া মাগুর মাছের খাদ্য হিসেবে শিং মাছের অনুরূপ উপকরণ দিয়ে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে প্রয়োগ করা যায়। গরু ছাগলের নাড়িভুঁড়ি কুচিকুচি করে কেটে সরাসরি পুকুরে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া কেঁচো টুকরো টুকরো করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে কম খরচে ভালো ফল পাওয়া যায়। সাধারণত পুকুরে বিদ্যমান মাছের মোট ওজনের শতকরা ৭-৮ ভাগ খাবার প্রয়োগ করতে হয়। সকাল সন্ধ্যায় দুই বার খাবার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ফিশমিল বা শুঁটকী মাছের গুঁড়া অবশ্যই কীটনাশকমুক্ত হওয়া উচিত।

রোগ ও প্রতিকার : রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে মাগুর চাষের পুকুরে বর্ষা শেষে কিন্তু শীত আসার আগে একবার প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন ২ ভাগে ভাগ করে ৪-৫ দিন পরপর পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। মাগুর মাছ ক্ষতরোগ ও পেটফোলা রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। রোগে আক্রান্ত হলে পুকুরে চুন বা লবণ শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে এবং রোগাক্রান্ত মাছগুলোকে পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মাগুর মাছের বৃদ্ধি হার : গুণগত ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাবারের ওপর মাগুর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। সঠিক উপায়ে পরিচর্যা করলে মাগুর মাছ ৬-৮ মাসের মধ্যে ১০০-২০০ গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এদের বাঁচার হার ৭০-৭৫% পাওয়া যায়।

মাছ আহরণ : পুকুরের পানির গভীরতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামলে মাগুর মাছ ধরার ব্যবস্থা নিতে হবে। বেড় জালে সব মাছ ধরা পড়ে না। তাই পুকুর সেচ দিয়ে সব মাছ ধরে ফেলতে হবে। অনেক সময় কাদার মধ্যে বেশ কিছু মাছ লুকিয়ে থাকে। পুকুর সেচের ৮-১০ ঘণ্টার মধ্যে ঐ মাছগুলো কাদা থেকে বেরিয়ে এলে তারপর ধরতে হয়। মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে পুকুরের পানি কমার সাথে সাথে রুই জাতীয় মাছ আংশিক আহরণের মাধ্যমে কমিয়ে ফেলতে হবে।

সম্ভাব্য আয় ব্যয়

সারণি-১৭ : ১০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে সম্ভাব্য উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের হিসাব

বিবরণ	পরিমাণ	একক দর (কেজি/সংখ্যা)	মোট ব্যয়
পুকুর ভাড়া	-	থোক	১৫০০.০
পুকুর নিষ্কাশন	-	থোক	৩০০.০
পাড় মেরামত	-	থোক	২০০.০
চুন প্রয়োগ	১০ কেজি	১২.০০	১২০.০
জৈব সার প্রয়োগ	২০০ কেজি	১.০০	২০০.০
ইউরিয়া	১ কেজি	১০.০০	১০.০
টিএসপি	১ কেজি	২০.০০	২০.০
পোনা	২,৫০০টি	২.০০	৫,০০০.০
সম্পূরক খাদ্য	২০০ কেজি	৪৫.০০	৬,৭৫০.০
জাল টানা ও অন্যান্য ব্যয়	-		১০০০.০
মোট			**১৫,১০০.০**

উৎপাদন ও আয়

মাগুর মাছ ৭৫ কেজি

আয় ও ব্যয়

প্রতি কেজি ৪৫০ টাকা করে ৪৫০ দ্ধ ৭৫ = ৩৩,৭৫০ টাকা

নিট লাভ = ৩৩,৭৫০ - ১৫,১০০ = ১৮,৬৫০ টাকা

অনুশীলনী-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাগুর মাছ চাষের ২টি সুবিধা লেখ।

২. মাগুর চাষে পুকুরের গভীরতা কত হলে ভালো হয়?

৩. পুকুর প্রস্তুতকালীন সময় সার প্রয়োগের মাত্রাটি লেখ।

৪. একক চাষে শতাংশপ্রতি কতটি মাগুর মাছের পোনা মজুদ করা যায়?

৫. মিশ্রচাষে শতাংশপ্রতি কতটি মাগুর মাছের পোনা মজুদ করা যায়?

৬. মাগুর মাছ সাধারণত কখন খাদ্য গ্রহণ করে থাকে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাগুর মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে?

২. মাগুর মাছের পোনা শোধন কীভাবে করা হয়?

৩. মাগুর চাষে মজুদ পরবর্তী শতংশপ্রতি সারের মাত্রা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাগুর মাছের চাষ কৌশল বর্ণনা কর।

২. মাগুর মাছের আহরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩. মাগুর মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭ম অধ্যায়

কাঁকড়া (মাডক্রাব) পালন পদ্ধতি

আমাদের দেশের উপকূলবর্তী প্যারাবন বা ম্যানগ্রোভ এলাকায় শীলা কাঁকড়া পাওয়া যায় যা মাডক্রাব, ম্যানগ্রোভ ক্রাব বা গ্রিন ক্রাব নামে পরিচিত। এরা ২ থেকে ৫০ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততায় এবং ১২ থেকে ৩৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এরা মূলত নিশাচর বা রাতে বেশ সক্রিয়।

মাডক্রাব চাষের গুরুত্ব : মাডক্রাব বর্তমানে রপ্তানিযোগ্য অন্যতম অর্থকরী জলজ প্রাকৃতিক সম্পদ। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিতে হিমায়িত চিংড়ির পরেই মাডক্রাব বা কাঁকড়ার অবস্থান। বাংলাদেশে মোট ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৪ প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং ১১ প্রজাতি লবণাক্ত বা আধা লবণাক্ত (মোহনা) পানিতে পাওয়া যায়। শীলা কাঁকড়া দ্রুত বর্ধনশীল এবং বানিজ্যিকভাবে ফ্যাটেনিং বা চাষযোগ্য। বিদেশে শীলা কাঁকড়ার মাংস বেশ প্রিয় খাদ্য। স্থানীয়ভাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খাদ্য হিসেবে কাঁকড়া গ্রহণ না করলেও বিদেশে কাঁকড়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসহ ইউরোপ মহাদেশেও কাঁকড়ার চাহিদা রয়েছে। বিশ্ববাজারে কাঁকড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সংগ্রহ প্রক্রিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশাপাশি কাঁকড়ার চাষ পদ্ধতির কলাকৌশল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে।

চিত্র-৮ : শীলা কাঁকড়া

পরিচিতি ও বিস্তৃতি : মাডক্রাব বা কাঁকড়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, ভারত উপকূল এবং ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ এলাকায় দেখা যায়। আমাদের দেশে উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বত্র এ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। কাঁকড়া মাটিতে এবং বাঁধে গর্ত করতে পছন্দ করে। ডুবন্ত গাছের শেকড় ও ডালপালায় এরা আশ্রয় নেয়। তাই ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে এদেরকে বেশি পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিন্যাস

পর্ব (Phylum) ; আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)
শ্রেণি (Class) ; ক্রাস্টাসিয়া (Crustacea)
বর্গ (Order) ; ডেকাপোডা (Decapoda)
গোত্র (Family) ; গ্র্যাপসিডি (Grapsidae)
গন (Genus) ; শীলা (Scylla)
প্রজাতি (Species) ; শীলা সেরাটা *(S. serrata)*

মাডক্রাব চাষের সুবিধাসমূহ

- আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকায় এর উৎপাদন লাভজনক।
- বর্তমানে আমাদের দেশে এর পোনা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়।
- মাডক্রাব পানি ব্যতীত অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে বলে দূরবর্তী স্থানে জীবিত পরিবহন করা যায়।
- জীবিত কাঁকড়া রপ্তানি করা যায় বিধায় হিমায়িতকরণের ঝামেলা নেই।
- আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।
- অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং দেশীয় অভিজাত রেস্তোরাগুলোতে দিন দিন চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- পচা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধ করে বিধায় মাডক্রাব পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।
- এর খাবার স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করা সম্ভব।
- ওজন হিসাবে এর বৃদ্ধিহার বেশি।

মাডক্রাব বা কাঁকড়া চাষের অসুবিধাসমূহ

- আমাদের দেশে কাঁকরার হ্যাচারি না থাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে অনবরত আহরণের ফলে প্রজনন ব্যাহত হয়ে বাচ্চা কাঁকড়া সরবরাহ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে,
- বিদেশে রপ্তানিকালে কাঁকড়া পরিবহনকারী গাড়িকে ইমারজেন্সি ভেহিকল হিসেবে বিবেচনা না করা,
- অনেকক্ষেত্রে পরিবহনকালীন মৃত্যুহার অনেক বেশি এবং
- কাঁকড়া ব্যবসাকে শিল্প হিসাবে গণ্য না করা বা ব্যাংক ঋণের সুবিধা না দেয়া।

সমাধানে করণীয়

- কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারি এবং নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা।
- কাঁকড়া চাষ, ফ্যাটেনিং খামার এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা।
- কাঁকড়া চাষিদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- শাক-সবজি ও মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ২০% নগদ সহায়তার ন্যায় সহায়তা প্রদান।
- জীবন্ত কাঁকড়া পরিবহনকারী গাড়িকে চলাচলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান এবং
- কার্গো জাহাজে জীবন্ত কাঁকড়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবহনের সুযোগ প্রদান।

মাডক্রাব বা কাঁকড়া চাষের কলাকৌশল : বাংলাদেশে মাডক্রাব তথা কাঁকড়ার চাষ বলতে প্রকৃতপক্ষে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা মোটাতাজাকরণ বোঝায়। অপরিপক্ব কাঁকড়া বা সদ্য খোলস পাল্টানো কাঁকড়া (যা পানি কাঁকড়া বা খোসা কাঁকড়া নামেও পরিচিত) কে ২-৬ সপ্তাহ খাদ্য সরবরাহ ও আবদ্ধ রেখে গোনাড পরিপক্বকরণ ও খোসা শক্তকরণ করা হয়। এ পদ্ধতিকেই কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বলে। জুভেনাইল বা কিশোর/তরুণ (১০-২৫০ গ্রাম) কাঁকড়াকে বাক্স/খাঁচা/পুকুর বা ঘেরে আবদ্ধ রেখে খাদ্য সরবরাহ করে ৩০০-৫০০ গ্রাম আকারে পরিণত করার পর আহরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নরম এবং শক্ত খোসা বিশিষ্ট কাঁকড়া আহরণ করা হয়। সাধারণত নরম খোসা বিশিষ্ট কাঁকড়া হিমায়িত করে এবং শক্ত খোসা বিশিষ্ট কাঁকড়া জীবিত অবস্থায় রপ্তানি করা হয়। নিচে মাড ক্রাব বা কাঁকড়া চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

পুকুরে চাষ : শতকরা ৫০ ভাগ কাদা মিশ্রিত বেলে মাটির পুকুর কাঁকড়া চাষের জন্য আদর্শ। পুকুরের আকার ২০-৪০ শতাংশ হলে ব্যবস্থাপনা সুবিধাজনক। পানির গভীরতা ৪-৫ ফুট হলে ভালো হয়। পুকুরে কাঁকড়ার

আদর্শ মজুদ ঘনত্ব হলো প্রতি বর্গ মিটারে ২-৩ টি। কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের চারধারে বাঁশের বানা ও নাইলনের নেট দ্বারা ঘিরে দিতে হবে যাতে কাঁকড়া বেরিয়ে যেতে না পারে। এক্ষেত্রে বাঁশের উচ্চতা হবে ১.৫ মিটার যার ০.৫ মিটার মাটির নিচে পুঁতে দিতে হবে।

প্রজাতি নির্বাচনে বিবেচ্য : পুকুরে কাঁকড়া মজুদের ক্ষেত্রে সুস্থ, সবল ও চলনক্ষম কাঁকড়া মজুদ করতে হবে। মজুদের সময় কাঁকড়ার উপরিভাগের খোলস নরম কিনা তা আঙ্গুল দিয়ে চেপে পরীক্ষা করতে হবে। এভাবে পরীক্ষা করে ১৮০-২০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া মজুদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে যত বড় কাঁকড়া মজুদ করতে পারবে তার লাভের অংশ তত বেড়ে যাবে।

বাঁশের খাঁচায় চাষ : সাধারণত ৯টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বাঁশের খাঁচা (১ মি. × ১ মি. × ২০ সেমি.) কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাঁচার পাশের চটি সমূহের মধ্যে ০.৫ সেমি. এবং উপরের ঢাকনার চটি সমূহের মধ্যে ২.৫ সেমি. ফাঁক রাখতে হবে। কিন্তু কাঁকড়ার চলাচলের সুবিধার্থে খাঁচার নিচের চটি সমূহের মধ্যে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। বাঁশের ফালি বা চটি সমূহের মাঝে এমন ফাঁক রাখতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতেই কাঁকড়ার পা ফাঁক দিয়ে ঢুকে ভেঙে না যায়। পানি চলাচলের সুবিধার্থে খাঁচাসমূহ মাঝে মাঝে ব্রাশ দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ৯টি কাঁকড়া মজুদ করা যায়। কাঁকড়া মজুদের ৮-১০ দিন পর থেকেই কাঁকড়ার গোনাড (ডিম্বাশয়) পরিপুষ্ট হয়েছে কি না তা প্রতিদিন পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষিত কোনো কাঁকড়ার গোনাড অপরিপক্ব থাকলে তাকে পুনরায় খাঁচার নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অথবা ঘেরে রেখে পূর্বের নিয়মে খাবার দিতে হবে। সাধারণত গোনাড পরিপুষ্ট হলে ঘেরে পানি ওঠানোর সময় কাঁকড়া গেটের কাছে চলে আসে। গোনাড পরিপুষ্ট হওয়া মাত্র কাঁকড়া আহরণ করে বাজারজাত করতে হবে। প্রতিদিন খাঁচার ঢাকনা খুলে কাঁকড়ার দেহের ওজনের ১০% হারে খাবার দিতে হবে। প্লাস্টিকের ড্রামের সাহায্যে খাঁচাসমূহ পানিতে ভাসিয়ে রাখা যায় অথবা নির্দিষ্টভাবে খাঁচার আংশিক ডুবিয়ে বেঁধে রাখা যায়।

পেনে কাঁকড়া চাষ : ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে বাঁশের বানা দিয়ে পেন তৈরি করে করেও কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়। বাঁশের বানা মাটিতে গভীরভাবে গেঁথে রাখতে হবে যাতে গর্ত করে কাঁকড়া পালিয়ে যেতে না পারে। ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ১০০-১৫০ বর্গমিটার এলাকা ঘিরে পেন তৈরি করা যেতে পারে। পেনের ভিতর একটি ০.৩ মিটার গভীর ও ১-২ মিটার ব্যাসের গর্ত করতে হবে যা ভাটার সময় পানি ধারণ করবে। কোন একটি ম্যানগ্রোভ গাছকে কেন্দ্র করে এ পেন তৈরি করলে প্রখর রোদের সময় কাঁকড়াসমূহ ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। জোয়ারের সময় দিনে একবার শামুকের মাংস অথবা কম দামি মাছের টুকরা খাবার হিসেবে সরবরাহ করা যায়। এ চাষ পদ্ধতিতে ৪-৭ মাসের মধ্যেই বাছাই করে কাঁকড়া ধরা হয়।

ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের বাক্সে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং : সারিবদ্ধ বহুতল বিশিষ্ট প্লাষ্টিকের খাঁচায় মৃদু প্রবহমান নোনা পানির ধারা ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি করে জুভেনাইল/খোসা কাঁকড়া মজুদ করা হয়। কম দামি তাজা মাছ অথবা তৈরি খাদ্য প্রতিদিন কাঁকড়ার দেহের ওজনের ১০% হারে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। সরবরাকৃত খাদ্যের ৩০% সকালে এবং ৭০% বিকালে সরবরাহ করা হয়। প্রকোষ্ঠের ছিদ্র দ্বারা খাবার সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি কাঁকড়া আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে থাকে এবং আলাদাভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হয় বলে কাঁকড়ার স্বজাতিভোজী স্বভাবের কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। মায়ানমার, ভারত, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় এ পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কক্সবাজার ও খুলনা এলাকায় স্বল্প পরিসরে এ পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ হচ্ছে।

চিত্র-৯ : ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের বাক্সে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং

খাদ্য সরবরাহ : কাঁকড়া সর্বভুক। এরা সাধারণত জীবন্ত খাদ্য খেতে পছন্দ করে। ছোট ছোট মাছ, শামুক, ঝিনুক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। তবে ময়লা ও পচা জৈব পদার্থ জাতীয় খাবারও এরা পছন্দ করে। খাদ্য হিসেবে ছোট গুঁড়া মাছ, শামুক-ঝিনুকের মাংস, চিংড়ি ও চিংড়ির মাথা, বিভিন্ন প্রকার দেহাবশেষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়ার খোলস তৈরির জন্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন। তাই মাংসের নরম হাড় ও মাছের কাঁটাসমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়ানো হয়। পুকুরে মজুদকৃত কাঁকড়ার ওজনের ৫-৭% হারে সকালে এবং বিকেলে শামুকের মাংস/কমদামি তাজা মাছ টুকরো করে খাদ্য হিসেবে দিতে হবে। কাঁকড়ার খোলস পাল্টানোর সময়ে স্বজাতিভোজী স্বভাব (Cannibalism) রোধ করার জন্য পুকুরের কিনারে পানিতে ১.৫ ফুট লম্বা এবং ছয় ইঞ্চি ব্যাসের পর্যাপ্ত পরিমাণ টুকরো পিভিসি পাইপ দিতে হবে।

কাঁকড়ার প্রজননকাল : সারাবছর বিভিন্ন আকার ও পরিমাপের কাঁকড়ার পোনা পাওয়া গেলেও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস কাঁকড়ার প্রধান প্রজননকাল। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে এসময় বন আইন মোতাবেক সুন্দরবন এলাকায় সকল ধরনের কাঁকড়া আহরণ করা নিষিদ্ধ। কাঁকড়ার বয়স সাধারণত ১৬-১৮ মাসের হলেই এরা প্রজননক্ষম হয়। এ সময় একটি কাঁকড়ার ওজন হয় ৩০০-৫০০ গ্রাম। স্ত্রী কাঁকড়া গভীর সমুদ্রে লার্ভি ছেড়ে থাকে যা পরবর্তীতে পাঁচটি লার্ভা স্তর পার হয়ে ম্যাগালোপা ও পোস্ট লার্ভা স্তরে উপনীত হয়। একটি স্ত্রী কাঁকড়া ১-৮ মিলিয়ন ডিম দিতে পারে।

কাঁকড়া আহরণ, গ্রেডিং ও বাজারজাতকরণ : দেশের সিংহভাগ মানুষ কাঁকড়া খাওয়ায় অভ্যস্ত নয় বিধায় ইতোপূর্বে মাছের সাথে ধরা পড়া হাজার হাজার কাঁকড়া অবহেলায় মেরে ফেলা হতো। অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এবং ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ না হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং বিভিন্ন অভিজাত রেস্তোরায় কাঁকড়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকার জনগণ মাছের সাথে ধরা পড়া কাঁকড়া সযত্নে সংরক্ষণ করে সংগ্রহকারীদের নিকট অথবা নিকটস্থ কাঁকড়ার ডিপোতে বিক্রি করে থাকেন। বৃহত্তর খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ কাঁকড়া আহরণ ও চাষকে ইতোমধ্যে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে ৭১০ কিলোমিটার উপকূলীয় রেখা বরাবর প্রায় ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর এলাকা থেকে কাঁকড়া আহরণ করা হয়। কাঁকড়ার বাজারমূল্য এর ওজন, লিঙ্গ, ধরন (Soft shell/hard shell) এর উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১২০০ মে. টন কাঁকড়া হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপ মহাদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে মৌসুম ও গ্রেড ভেদে প্রতি কেজি কাঁকড়ার বাজার মূল্য ৫০০-১৩০০ টাকা।

আহরণ প্রক্রিয়া

- সাধারণত ১০-১২ দিনের মধ্যে খাঁচার ও ১৪-১৬ দিনের মধ্যে ঘেরের খালি অংশের কাঁকড়ার গোনাড পরিপুষ্ট হবে। এসময় ঘের হতে টোপ দিয়ে প্রলুব্ধ করে এবং খাঁচা হতে সরাসরি স্কুপনেট দিয়ে কাঁকড়া ধরতে হবে। আহরিত কাঁকড়াকে ধরার সাথে সাথে খুব সাবধানে বিশেষ নিয়মে প্লাস্টিকের ফিতা/নাইলনের রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। অন্যথায়, কাঁকড়ার চিমটা পা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সে ক্ষেত্রে কাঁকড়ার প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে না।

- গোনাড পরিপুষ্ট হওয়া মাত্র কাঁকড়া আহরণ করে বাজারজাত করতে হবে।

- আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য কাঁকড়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা,ওজন ও খোলসের অবস্থাভেদে পুরুষ কাঁকড়াকে ৫টি এবং স্ত্রী কাঁকড়াকে ৭টি গ্রেডে ভাগ করা হয় এবং প্যাকিং এর জন্য বিভিন্ন ধরণের স্টাইরোফোম বক্স, প্লাষ্টিকের বক্স ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ধৃত কাঁকড়াকে ডিপোতে গ্রেডিং অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে। আহরিত কাঁকড়াকে গ্রেড অনুয়ায়ী (এফ-১ গ্রেড,সকল পা সহ ১৮০ গ্রাম বা তদুর্ধ্ব; এফ-২ গ্রেড, পাশাপাশি দুটি পা ভাঙা সহ ১৫০-১৭৯ গ্রাম; এফ-৩ গ্রেড, দুটি বা ততোধিক পা ভাঙ্গাসহ ১০০-১৪৯ গ্রাম এবং এফ-৪ থেকে এফ-৭ পর্যন্ত রপ্তানি অযোগ্য) ডিপোতে বিক্রি করতে হবে। উল্লেখ্য যে– এফ-১ গ্রেডের কাঁকড়াই বিদেশে রপ্তানিযোগ্য।

- বাঁশের/প্লাষ্টিকের তৈরি ঝুড়িতে (প্রতি ঝুড়িতে ৯০-১০০ কেজি) কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানির জন্য ঢাকায় বাস/ ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

অনুশীলনী-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাডক্রাব -এর অপর নাম কী?
২. মাডক্রাব কত পিপিটি লবণাক্ত সহ্য করতে পারে?
৩. বাংলাদেশে মোট কত প্রজাতির মাডক্রাব বা কাঁকড়া পাওয়া যায়?
৪. প্রতি বছর কাঁকড়া রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ কত টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে?
৫. শীলা কাঁকড়ার বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
৬. খোসা কাঁকড়া কাকে বলে?
৭. কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বলতে কী বুঝ?
৮. খাঁচায় প্রতি বর্গ মিটারে কতটি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা যায়?
৯. প্রত্যেকদিন কাঁকড়াকে দৈহিক ওজনের শতকরা কতভাগ খাদ্য দিতে হবে?
১০. শীলা কাঁকড়ার প্রজননকাল কখন?
১১. কত মাস বয়সে কাঁকড়া প্রজননক্ষম হয়?
১২. একটি স্ত্রী কাঁকড়া কতগুলো ডিম দেয়?
১৩. আমাদের দেশ থেকে কাঁকড়া কোন কোন দেশে রপ্তানি করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাডক্রাব চাষের ২টি সুবিধা লেখ।
২. মাডক্রাব চাষের ২টি অসুবিধা লেখ।
৩. মাডক্রাব চাষের অসুবিধা দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
৪. এফ-১ গ্রেডের কাঁকড়ার বৈশিষ্ট্য কী?
৫. কাঁকড়া মজুদের কত দিন পর থেকে গোনাড পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে?
৬. কখন কাঁকড়া আহরণ করে বাজারজাত করতে হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাডক্রাব বা কাঁকড়া ফ্যাটেনিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৮ম অধ্যায়

খাঁচায় মাছ চাষ

আমাদের দেশে অসংখ্য নদ-নদী ও মুক্ত জলাশয় রয়েছে। যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মাছচাষ করা সম্ভব নয়। বর্ষার মৌসুমে বিশাল এলাকা বন্যাকবলিত হয় এবং ৪-৬ মাস প্লাবিত থাকে। এসব জলাশয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে খুব কম পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়। একটু চেষ্টা করলে এ ধরনের জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ করা যায়। সাধারণত প্রবাহমান পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। পানিপ্রবাহের কারণে খাঁচার মধ্যে মাছের বর্জ্য পদার্থ জমতে পারে না বলে প্রবহমান পানিতে খাঁচায় মাছচাষ সুবিধাজনক। তাছাড়া অনেকের মাছ চাষের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পুকুর বা জলাশয় না থাকার কারণে মাছচাষ করতে পারে না। অথচ তার বাড়ির পাশে যদি একটি প্রবাহমান নদী থাকে তাহলে খুব সহজেই ইচ্ছা করলে সে সেখানে খাঁচায় মাছচাষ করতে পারে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে খাঁচায় মাছচাষ নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়েছে। খাঁচায় মাছচাষ শুরু হয় চীনের ইয়াংজি নদীতে আনুমানিক ৭৫০ বছর আগে। আমাদের দেশে প্রথম খাঁচায় মাছচাষ শুরু হয় কাপ্তাই লেকে। বর্তমানে দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ করে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদী এবং লক্ষ্মীপুর জেলায় মেঘনা নদীতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ হচ্ছে। যা থেকে বছরে উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৭০০ মেট্রিক টন তেলাপিয়া। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে আধুনিককালে খাঁচায় মাছচাষ তাই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

খাঁচায় মাছ চাষের সুবিধাসমূহ

- খাঁচায় মাছচাষ করলে পুকুরের ন্যায় জলাশয়ের প্রয়োজন হয় না।
- প্রবহমান নদীর পানিকে যথাযথ ব্যবহার করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়।
- মাছের বর্জ্য পানির সাথে অপসারিত হয় বিধায় পানিকে দূষিত করতে পারে না।
- মাছের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেয়ে নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়।
- প্রবহমান থাকায় প্রতিনিয়ত খাঁচার অভ্যন্তরের পানি পরিবর্তন হতে থাকে, ফলে পুকুরের চেয়ে অনেক ঘনত্বে মাছচাষ করা যায়।
- একবার মাছ চাষের জন্য তৈরিকৃত খাঁচা একাধিকবার ব্যবহার করা যায় ও
- যেকোনো সময় খুব সহজে সম্পূর্ণ মাছ বা প্রয়োজন অনুযায়ী মাছ আহরণ করা যায়।

খাঁচায় মাছ চাষের অসুবিধাসমূহ

- পাহাড়াদারের ব্যবস্থা না থাকলে খুব সহজেই খাঁচার মাছ চুরি হয়ে যেতে পারে।
- দেশের সর্বত্র খাঁচা তৈরির জাল সুলভমূল্যে পাওয়া যায় না।
- তেলাপিয়া, পাঙ্গাশ, কার্পিও, মিরর কার্প ব্যতীত খাঁচায় চাষযোগ্য তেমন কোনো প্রজাতি আমাদের দেশে নেই।
- খাঁচায় চাষযোগ্য মাছের ভাসমান পিলেট খাদ্য সুলভ মূল্যে দেশের সর্বত্র পাওয়া যায় না।
- প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।
- ইঁদুর বা শত্রুতাবশত কারণে জাল কেটে দিলে মাছ পালিয়ে যেতে পারে।
- ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে অনেক সময় খাঁচা ভেঙে যায় ফলে মাছ পালিয়ে যায়।
- পানি বেশি ঘোলা হলে খাদ্যদানিতে বালি বা ময়লা জমে খাঁচা ভারী হয়ে ডুবে যেতে পারে। আবার পানি খুব বেশি স্বচ্ছ হলেও মাছ অবিরত খাঁচা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

খাঁচা স্থাপনের উপযোগী স্থান

১. বড় বড় বিল, হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, প্রবহমান নদী, সেচখাল এমনকি সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের খোলা পানিতে খাঁচা স্থাপন করা যায়।
২. একমুখী পানির প্রবাহ কিংবা জোয়ার ভাটার শান্তপ্রবাহ বিদ্যমান এমন নদী, যেখানে ৪-৮ ইঞ্চি/সেকে-মাত্রার পানি প্রবাহিত হয় এমন স্থান খাঁচা স্থাপনের জন্য উপযোগী। তবে পানি প্রবাহের এ মাত্রা সর্বোচ্চ ১৬ ইঞ্চি/সেকেন্ড এর বেশি হওয়া উচিত নয়।
৩. খাঁচা পানিতে ঝুলন্ত রাখার জন্য ন্যূনতম পানির গভীরতা ১০ ফুট হওয়া প্রয়োজন। যদিও প্রবহমান পানিতে তলদেশে বর্জ্য জমে গ্যাস দ্বারা খাঁচার মাছের ক্ষতির আশঙ্খা কম। তথাপি খাঁচার তলদেশ নদীর নিচের কাদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট উপরে থাকা প্রয়োজন।
৪. খাঁচা স্থাপনের স্থানটি লোকালয়ের নিকট হলে সহজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
৫. খাঁচা স্থাপনের স্থানের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে সহজে মালামাল আনা নেওয়া এবং উৎপাদিত মাছ সহজে বাজারজাত করা যায়।
৬. খাঁচা স্থাপনের কারণে যাতে কোনোভাবেই নৌ চলাচলের বিঘ্ন না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৭. জোয়ার ভাটার স্রোত ও ঘোলাত্বের তীব্রতা নেই এমন নিরাপদ স্থানে খাঁচা স্থাপন করতে হবে।
৮. সর্বোপরি খাঁচা স্থাপনের স্থানটি এমন হতে হবে যাতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়ঃনিষ্কাশনের পানি অথবা কৃষি জমি থেকে বন্যা বা বৃষ্টি বিধৌত কীটনাশক মিশ্রিত পানি নদীতে পতিত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে খাঁচার মাছ মারা যেতে না পারে।

খাঁচা তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ : খাঁচা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা নিচে দেয়া হলো–

১. নাইলন, প্লাস্টিক, টায়ার কর্ড বা পলিইথিলিনের জাল (৩/৪ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি)।
২. খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরির জাল।
৩. খাঁচার তলায় ট্রে হিসেবে ব্যবহার করার জাল।
৪. নাইলনের রশি।
৫. কভার নেট বা ঢাকনা জাল (পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য)।
৬. ১ ইঞ্চি জিআই পাইপ/বাঁশ।
৭. ফ্রেম ভাসমান রাখার জন্য ফ্লোট হিসেবে ব্যবহৃত ব্যারেল/ড্রাম।
৮. খাঁচা স্থির রাখার জন্য গেরাপি (অ্যাঙ্কর)।
৯. ফ্রেমের সাথে বাঁধার জন্য মাঝারি আকারের সোজা বাঁশ।
১০. জাল সেলানোর জন্য সুঁই এবং প্লাস্টিক বা নাইলনের রশি ও
১১. Sinker হিসেবে ঝাঁকি জালে ব্যবহৃত লোহার কাঠি।

খাঁচার ধরন : খাঁচায় মাছ চাষের জন্য সাধারণত দুই ধরনের খাঁচা ব্যবহার করা হয়। যথা- ক. ভাসমান খাঁচা ও খ. স্থির খাঁচা।

ক. ভাসমান খাঁচা : ভাসমান খাঁচা প্রধানত প্রবহমান জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য বেশি উপযোগী। কারণ জোয়ার ভাটার কারণে পানির উচ্চতা দ্রুত ওঠানামা করে। এ কারণে ভাসমান খাঁচা প্রবহমান জলাশয়ে ভাসমান কোনো বস্তুর সাথে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে খাঁচার $\frac{৩}{৪}$ অংশ পানির মধ্যে ডুবে থাকে এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৪}$ অংশ

পানির উপর ভেসে থাকে। খাঁচাকে পানিতে ভাসমান অবস্থায় রাখার জন্য লোহার বা প্লাস্টিকের ড্রাম বা প্লাস্টিকের ভাসমান বস্তুর সাথে শক্ত করে এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে খাঁচার $\frac{৩}{৪}$ অংশ পানির মধ্যে অবস্থান করে এবং জোয়ার-ভাটার সাথে খাঁচার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন না ঘটে।

চিত্র-১০ : ভাসমান খাঁচা

চিত্র-১১ : স্থির খাঁচা

খ. স্থির খাঁচা : সাধারণত বদ্ধ জলাশয় যেমন- পুকুর, দিঘি, হাওর, বাঁওড়, লেক প্রভৃতিতে স্থির খাঁচা স্থাপন করে মাছচাষ করা যায়। এক্ষেত্রে বাঁশের খুঁটির সাথে খাঁচা স্থিরভাবে বেঁধে দেয়া হয়। এই পদ্ধতিতেও খাঁচার এক–চতুর্থাংশ পানির উপর এবং বাকি তিন–চতুর্থাংশ পানির নিচে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পানির উচ্চতার তারতম্যের সাথে সাথে খাঁচার উচ্চতা মাঝে মাঝে কম বেশি করা হয়।

খাঁচা তৈরির উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য এবং সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে ২ ধরনের খাঁচা তৈরি করা যেতে পারে। যেমন-
ক. পারিবারিক প্রয়োজন খ. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য

ক. পারিবারিক প্রয়োজন : খাঁচায় মাছ চাষ যদি শুধুমাত্র নিজের পারিবারিক মাছের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে খাঁচার আকার হবে ছোট অর্থাৎ ১ ঘনমিটার (১মি.x১মি.x১মি.)। এরূপ খাঁচায় ২-৩ ইঞ্চি আকারের ৩০০টি গিফট বা মনোসেক্স তেলাপিয়া অথবা ১০০ টি পাঙ্গাসের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এমন কয়েকটি খাঁচা স্থাপন করলে সাধারণত একটি পরিবারের বাৎসরিক মাছের চাহিদা মিটে যাবে। এক্ষেত্রে তেমন কোনো বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না। রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, শামুক, ঝিনুক, সবুজ ঘাস, কলাপাতা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদির সাথে সামান্য পরিমাণ খৈল-ভুসির বল খাদ্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করেও মাছচাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খাঁচা তৈরির জন্যও তেমন কোনো পুঁজির প্রয়োজন হয় না। বাঁশ, কাঠ, রশি, ফ্লোটের জন্য পানির খালি বোতল বা তেলের জারিকেন এগুলো ঘরে থাকলে প্রতিটি খাঁচা তৈরিতে আনুমানিক ৮০০-১০০০ টাকা খরচ হয়। যা প্রায় ২ বছর ব্যবহার করা যায়। এরূপ একটি খাঁচা হতে বছরে ৩০ থেকে ৭০ কেজি পর্যন্ত মাছ পাওয়া যেতে পারে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০০০-৭০০০ টাকা।

খ. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য : খাঁচায় মাছচাষ যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে করা হয় তবে সে ধরণের খাঁচার আকার-আকৃতি, খাঁচা তৈরি, খাঁচায় পোনা মজুদ, খাদ্য প্রদান সবই পারিবারিক উদ্দেশ্যে নির্মিত খাঁচা থেকে আলাদা হবে। নিচে এ ধরণের খাঁচার বিবরণ দেয়া হলো-

খাঁচার আকার : খাঁচা যেকোনো আকার বা আকৃতির হতে পারে। তবে আয়তকার খাঁচাই আমাদের দেশে মাছ চাষের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে সচরাচর যে খাঁচাগুলো ব্যবহৃত হয় এর আয়তন ১২০০ ঘনফুট (২০ ফুট x ১০ ফুট x ৬ ফুট) বা ৩৪ ঘনমিটার। এ ধরণের খাঁচা তৈরিতে ব্যবহৃত জালের ফাঁসের আকার থাকে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। এতে সহজে নদীর পরিষ্কার পানি প্রতিনিয়ত খাঁচার ভিতরে সঞ্চালিত হতে পারে।

খাঁচার ফ্রেম তৈরি ও জাল স্থাপন : খাঁচাগুলোর ফ্রেম তৈরি করতে প্রথমত ১ ইঞ্চি জি আই পাইপ দ্বারা আয়তকার (২০ফুট x ১০ফুট) ফ্রেম তৈরি করা হয়। আর মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরি করা হয়। এতে একটি ফ্রেমে সরাসরি ২০ফুট x ১০ফুট আকারের খাঁচা বসানো যায় আবার প্রয়োজনবোধে ১০ফুট x ১০ফুট আকারের দুইটি খাঁচা বসানো যায়। প্রতি দুই ফ্রেমের মাঝে ৩টি ড্রাম স্থাপন করে সারিবদ্ধভাবে ফ্রেমগুলো স্থাপন করা হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরাপি অথবা নোঙর দিয়ে খাঁচাগুলো নদীর নির্দিষ্ট স্থানে শক্তভাবে আটকানো হয়। অতঃপর প্রতিটি ফ্রেমের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে জাল সেট করা হয়।

খাঁচায় চাষযোগ্য মাছের প্রজাতি নির্বাচন : আমাদের দেশে পুকুরে চাষযোগ্য অনেক প্রজাতির মাছ থাকলেও খাঁচায় চাষযোগ্য মাছের প্রজাতি খুবই কম। খাঁচায় চাষযোগ্য মাছের উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলো হলো- মনোসেক্স তেলাপিয়া, গিফট তেলাপিয়া, পাঙ্গাশ, কার্পিও, মিররকার্প ইত্যাদি।

পানিতে খাঁচা ভেজানো : খাঁচায় পোনা মজুদের কমপক্ষে ১ সপ্তাহ পূর্বে অবশ্যই খাঁচাকে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে জালের গায়ে সামান্য শ্যাওলা জমে জালের মসৃণতা বেড়ে যাবে। তা না হলে নতুন অবস্থায় জালে পোনা মজুদ করলে জালের গিটের ঘষায় মাছের গায়ের পিচ্ছিল আবরণ (মিউকাস) সহ আঁইশ উঠে ঘা হয়ে যাবে। ফলে মাছের মড়ক দেখা দিতে পারে।

পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ ও পোনা মজুদ : পানির স্রোত, জালের ফাঁসের আকার, পানির গভীরতা, প্রত্যাশিত আকারের মাছ উৎপাদন, খাদ্যের গুণগতমান এবং বিনিয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে খাঁচায় মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্রতি ঘন মিটার খাঁচায় ২০-২৫ গ্রাম ওজনের ৩০-৪০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : বাণিজ্যিকভাবে খাঁচায় মাছচাষ পরিচালনার জন্য প্রবহমান পানিতে ভাসমান পিলেট খাদ্যের বিকল্প নেই। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির ভাসমান পিলেট খাদ্য পাওয়া যায় যা পোনা মজুদের পর থেকে মাছ বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত দৈহিক ওজনের ৮ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ হারে প্রতিদিন একই সময়ে দিনে ২ বার খাঁচায় প্রয়োগ করতে হবে। সম্প্রতি মেঘনা নদীতে খাঁচায় মাছ চাষের উপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শুরু থেকে মাছ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত মানসম্পন্ন সুষম ভাসমান পিলেট জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করে ১ কেজি তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনে ২ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

খাঁচায় তেলাপিয়া বাছাইকরণ : প্রত্যাশিত উৎপাদনের জন্য খাঁচায় পোনা মজুদের তিন সপ্তাহের পর প্রথম বার খাঁচার মাছ বাছাই করতে হবে। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছগুলো এক খাঁচায় রাখতে হবে। এভাবে তিন থেকে চার বার মাছ বাছাই করলে ছোট আকারের মাছগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে লাভের অংশ অনেক বেড়ে যাবে। যখন নদীর পানি বেশি প্রবহমান থাকে তখন খাঁচার পানি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এমন সময় সকালে কিংবা পড়ন্ত বিকালে মাছ বাছাইয়ের কাজটি করতে হবে।

খাঁচা পরিচর্যা : খাঁচা, খাঁচার জাল এবং খাঁচায় মাছের নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। খাঁচার ভিতরে ট্রে বা খাদ্য দানিতে জমে যাওয়া তলানি বা ময়লা পরিষ্কার, খাঁচার জাল ঠিক আছে কিনা কিংবা কাঁকড়া বা অন্য কোনো প্রাণী জাল কেটেছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। এছাড়া অনেক সময় পানির গভীরতা কম-বেশি হলেও খাঁচা ওঠা-নামা করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাহলেই খাঁচায় মাছ চাষে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

উৎপাদন ও আয়-ব্যয় : উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করলে ৫০টি খাঁচা হতে বছরে আয়ের প্রাক্কলন নিচে সারণি-১৮ দেয়া হলো :

সারণি-১৮ : ৫০টি খাঁচা স্থাপনে স্থায়ী খরচ

ক্রঃ নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য
১	সেলাই করা জাল	৫০টি	৩৫০০.০	১৭৫০০০.০
২	খালি বা শূন্য ড্রাম/ব্যারেল	১৫৩ টি	১৪৫০.০	২২১৮৫০.০
৩	১ ইঞ্চি জিআই পাইপ	৩৬০০টি	৮০.০	২৮৮০০০.০
৪	ফ্রেমের সংযোগ লৌহ	৩৫০টি	১০০.০	৩৫০০০.০
৫	নোঙ্গর (অ্যাঙ্কর)	১২টি (২০কেজি প্রতিটি)	২৪০০.০	২৮৮০০.০
৬	নোঙ্গর বাঁধার রশি	৫ কয়েল	৫০০০.০	২৫০০০.০
৭	বাঁশ	১০০টি	২০০.০	২০০০০.০
৮	নাইলনের সুতা ও রশি			৫০০০.০
৫০টি খাঁচা স্থাপনে মোট খরচ				৭৯৮৬৫০.০

সারণি-১৯ : ৫০টি খাঁচায় এক ফসলের উৎপাদন খরচ

ক্রঃ নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য
১	মাছের পোনা	৬০,০০০টি	২.০	১,২০০০০.০
২	খাদ্য	৩০৬২৫ কেজি	৪০.০	১২,২৫০০০.০
৩	শ্রমিকের খরচ (৬ মাস)	২ জন	১৮,০০০	৫৪,০০০.০
৫০টি খাঁচা স্থাপনে মোট খরচ				১৩,৯৯০০০.০

উৎস : খাঁচায় মাছ চাষ লিফলেট, বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী গবেষণা কেন্দ্র চাঁদপুর।

মাছের উৎপাদন

প্রতিটি খাঁচায় এক ফসলে সর্বনিম্ন উৎপাদন = ৩৫০ কেজি
৫০টি খাঁচায় উৎপাদন (৩৫০ x ৫০) = ১৭৫০০ কেজি
প্রতি কেজি মাছের গড় বাজারমূল্য = ১২৫ টাকা
সুতরাং মোট আয় (১৭,৫০০ x ১২৫) = ২১,৮৭,৫০০টাকা
নিট লাভ (২১,৮৭,৫০০-১৩,৯৯,০০০) = ৭,৮৮,৫০০ টাকা

অনুশীলনী-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে প্রথম খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয় কোথায়?
২. খাঁচা স্থাপনের স্থানে পানি প্রবাহের সর্বোচ্চ মাত্রা কত হওয়া উচিত?
৩. খাঁচায় মাছ চাষের জন্য সাধারণত কয় ধরনের খাঁচা ব্যবহার করা হয়?
৪. এক ঘন মিটার আয়তনের খাঁচায় সাধারণত কতটি তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা হয়?
৫. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত খাঁচার আয়তন সাধারণত কত ঘন ফুট হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাঁচায় মাছ চাষের দুটি সুবিধা লেখ।
২. খাঁচায় মাছ চাষের দুটি অসুবিধা লেখ।
৩. খাঁচা স্থাপনের উপযোগী স্থানের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
৪. খাঁচ তৈরির অত্যাবশ্যকীয় দুটি উপকরণের নাম লেখ।
৫. খাঁচায় চাষযোগ্য মাছের দুইটি প্রজাতির নাম লেখ।
৬. কীভাবে খাঁচার পরিচর্যা করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাসমান খাঁচায় মাছচাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. কিভাবে খাঁচার ফ্রেম তৈরি ও খাঁচায় জাল স্থাপন করা হয় তা বর্ণনা কর।
৩. খাঁচায় চাষকৃত মাছকে কীভাবে খাদ্য প্রদান করা হয় তা বর্ণনা কর।

৯ম অধ্যায়

পেনে মাছচাষ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল সম্পদে সমৃদ্ধ। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর এবং বন্যাপ্লাবিত ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি নিয়ে প্লাবনভূমি গঠিত। প্লাবনভূমিতে মৎস্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পেন বা ঘের তৈরি করে উল্লেখিত জলাশয়ে নিবিড়/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খাল, মরা নদী, হাওর, বাঁওড়, বন্যাপ্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

পেন কালচার : কোনো উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক থেকে বাঁশ, বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোনো উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত ঘেরের মধ্যে পোনা মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন কালচার বা পেনে মাছচাষ বলে। পেনে মাছ চাষের বৈশিষ্ট্য হলো পেনের ঘের বা বেড়া জলাশয়ের তলার কাদার মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে এবং পেনের পানির সাথে বাইরের পানির সংযোগ বা প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। ফলে বাইরের পানি বাড়লে বা কমলে পেনের ভিতরের পানি বাড়ে বা কমে।

চিত্র-১২ : পেনে মাছচাষ

পেনে মাছ চাষের সুবিধাসমূহ

- বছরে ৬-৮ মাস পানি থাকে এমন মৌসুমী জলাশয় পেনে মাছ চাষের আওতায় আনা যায়।
- কম খরচে অব্যবহৃত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনা যায়।
- বন্যাকবলিত এলাকায় সাময়িকভাবে পেনে মাছচাষ করে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা যায়।
- বেকার যুব ও যুব মহিলা, দরিদ্র মৎস্যজীবীকে সংগঠিত করে পেনে মাছ চাষের মাধ্যমে তাদের বেকার সমস্যা দূর করা যায়। পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে আমিষের অভাব পূরণ করা যায়।
- যেসব জলাশয়ে একাধিক মালিকানা আছে সেসব জলাশয়ে পেন তৈরি করার মাধ্যমে মালিকানা সমস্যার সমাধান করা যায় এবং একই জলাশয়ে একাধিক মৎস্যচাষি নিজেদের পছন্দমতো মাছচাষ করতে পারে ও
- পেন কালচারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অধিক মাছ উৎপাদন করা যায়।

পেনে মাছ চাষের অসুবিধাসমূহ

- পানির প্রবাহ বা স্রোত থাকলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ সম্ভব হয় না।
- পেনে মাছ চাষ সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাব থাকলে এক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায় না।
- পানির অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি পেন কালচারের ক্ষেত্রে তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করে।
- বড় ধরনের পেন কালচারের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই মাছের দৈহিক ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূরক খাদ্য প্রদান সম্ভব হয় না।
- এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের পোনা মজুদ করতে হয়। অনেক সময় পেনে মাছ চাষের ফলে নৌকা চলাচলের অসুবিধা হতে পারে ও
- পানি অস্বাভাবিক ঘোলা থাকলে সেখানে পেন কালচার ততটা ফলপ্রসূ হয় না।

স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ : পেনে লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বড় জলাশয় সাধারণভাবে নিবিড় মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব নয় সেসব জলাশয় পেনে মাছ চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। নিচে স্থান নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- জলাশয়ের অগভীর অংশ যেখানে সর্বোচ্চ ২.৫ মিটার পর্যন্ত পানি থাকে এমন স্থান পেন কালচারের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।
- পেন নির্মাণের জন্য তলদেশের মাটি অনুকূল হতে হবে যাতে বাঁশের খুঁটি সহজে মাটিতে গাড়া বা স্থাপন যায় এবং তা যেন স্থায়ী হয়, কোনক্রমেই বাতাসে বা ঝড়ে যেন হেলে পড়ে না যায়।
- নৌকা চলাচলের অসুবিধা হয় এমন স্থান পেন নির্মাণের জন্য না নেয়া ভালো। তবে পেনের ভিতর দিয়ে নৌকা চলাচলের সুবিধা রেখেও পেন নির্মাণ করা যেতে পারে।
- যেসব জলাশয়ের তলদেশ অত্যন্ত অসমান, বালি বা পাথর দ্বারা আবৃত, প্রবল স্রোত বিদ্যমান, পানি দূষণসহ ঝড়ো হাওয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেসব স্থানে পেন নির্মাণ না করাই ভালো।
- পেন নির্মাণের উপকরণ, যেমন- বাঁশ, জাল, শ্রমিক ইত্যাদি কাছাকাছি ও সুলভে পাওয়া যায় কিনা তাও বিবেচনা করতে হবে ও
- সর্বোপরি পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে আশপাশের সামাজিক অবস্থা, মাছ চুরি, দলাদলি, কোন্দল ইত্যাদি বিবেচনা করে সব কিছু অনুকূলে থাকলে তবেই সে স্থান পেনে মাছ চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

পেন তৈরির উপকরণ : পেন তৈরিতে সাধারণত নিম্নোক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয়। যেমন- পলিইথিলিন বা নাইলনের জাল, বাঁশের খুঁটি, চেরাইকৃত বাঁশের ফালি বা চটা, গাছের সোজা ডাল, নাইলনের অথবা নারিকেলের কয়ের রশি, পেরেক, জিআই তার, দা ইত্যাদি।

পেন তৈরি : বাঁশ, গাছের ডাল, পলিইথিলিন বা নাইলনের গিটবিহীন জাল, রশি, খুঁটি, পেরেক প্রভৃতি দিয়ে পেনের বেড়া নির্মাণ করা হয়। বাঁশের বানা বা বেড়া মজবুত খুঁটির সাহায্যে বেড়ার মত দেয়া হয়। বাঁশের বেড়া বা বানা মাটির মধ্যে গেড়ে দিতে হবে যাতে কাদার মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরি করে সহজে মাছ চলে যেতে না পারে। বেড়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সবচেয়ে কম প্রশস্ত জায়গায় বেড়া স্থাপন করতে হবে। জাল দিয়ে বেড়া দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জালের ফাঁস ১০ মি.মি. এর চেয়ে বেশি না হয়। এক্ষেত্রে টায়ার কর্ড জাল বা গিটবিহীন (Kont less) পলিইথিলিনের জাল ব্যবহার করা সবচেয়ে উত্তম। জলাশয়ের ধরনের

ওপর পেনের আকার নির্ভর করে। জলাশয়ের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ১ হেক্টর হতে ১০ হেক্টর আয়তনের যেকোনো আকৃতির পেন নির্মাণ করা যেতে পারে। পেনের আয়তন খুব বেশি বড় হলে কখনও কখনও ব্যবস্থাপনায় অসুবিধা দেখা দেয়। আবার আয়তন অত্যন্ত ছোট হলে বড় পেনের চেয়ে নির্মাণ ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। সাধারণত ১ হেক্টর হতে ৫ হেক্টর আয়তনের পেন মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সবচেয়ে ভালো।

পেন তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের আয়ুষ্কাল

ক্রঃ নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য
১	মাছের পোনা	৬০,০০০টি	২.০	১,২০০০০.০
২	খাদ্য	৩০৬২৫ কেজি	৪০.০	১২,২৫০০০.০
৩	শ্রমিকের খরচ (৬ মাস)	২ জন	১৮,০০০	৫৪,০০০.০
৫০টি খাঁচা স্থাপনে মোট খরচ				১৩,৯৯০০০.০

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন : পেন তৈরির পর বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ (শোল, বোয়াল, আইড়, টাকি, চিতল ইত্যাদি) সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া জলজ আগাছাও সম্পূর্ণরূপে তুলে ফেলতে হবে। পেনে বাইরের প্রবহমান পানির সাথে সংযোগ থাকে বলে বিষ প্রয়োগে অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ খুব বেশি কার্যকর হয় না। এ কারণে বার বার জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার ব্যবস্থা করা।

প্রজাতি নির্বাচন : পেনে মাছ চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন প্রজাতির এমন সব পোনা ছাড়তে হবে যারা পানির সব স্তরের খাবার খায়, খাদ্য শিকল সংক্ষিপ্ত, পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং অল্প সময়ে চাষ করে বাজারে বিক্রির উপযোগী হয়। এসব দিক বিবেচনা করে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড, গ্রাসকার্প, রাজপুঁটি, তেলাপিয়া, পাঙ্গাশ ইত্যাদি প্রজাতির মাছ পেনে চাষ করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পোনা মজুদের হার : অধিক ফলনের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা নির্দিষ্ট হারে মজুদ করা প্রয়োজন। পোনা মজুদের সময় পোনার আকার কোনোক্রমেই ৪ ইঞ্চি বা ১০ সেন্টিমিটার এর কম হওয়া উচিত নয়। কারণ ছোট পোনা পেনের বেড়া দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও পেন থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই ৪ ইঞ্চির চেয়ে ছোট আকারের পোনা মজুদ করলে রাক্ষুসে মাছ পোনা মাছ খেয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে। পানির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে প্রতি একরে ৬০০০-৮০০০টি পোনা নিচে লিখিত হারে মজুদ করা যেতে পারে।

প্রজাতি	পোনা মজুদের হার	পোনার সংখ্যা (একরে)	মন্তব্য
সিলভার কার্প	১০%	৬০০-৮০০	পোনা প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে পোনা মজুদের এ সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।
কাতলা	১০%	৬০০-৮০০	
রুই	৩০%	১৮০০-২৪০০	
মৃগেল	২০%	১২০০-১৬০০	
কার্পিও	৩০%	১৮০০-২৪০০	

পেনে খাদ্য সরবরাহ : পেনে মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজনের ১-২% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে খৈল, কুঁড়া, ভুসি ও চিটাগুড় ইত্যাদি মিশিয়ে বল খাদ্য তৈরি করে মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে। আবার সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে এলাকায় প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান দিয়েও সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। ১০০ কেজি সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য কী কী উপকরণ কী অনুপাতে লাগবে তার একটি পরিমাণ নিচে সারণি- ২০ এ দেয়া হলো।

সারণি-২০ : সম্পুরক খাদ্য তৈরির নমুনা (১০০ কেজি)

উপকরণের নাম	পরিমাণ (কেজি)	মন্তব্য
চালের কুঁড়া (অটো)	৩০	উপকরণের প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর পরিমাণ কমবেশি হতে পারে। তবে মাছের পুষ্টি চাহিদা জেনে নিয়ে অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা তা সমন্বয় করতে হবে।
গমের ভুসি	৩০	
খৈল	২০	
ফিশমিল	১০	
আটা	৫	
চিটাগুড়	৪	
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	১	
মোট	১০০	

মাছের নমুনা সংগ্রহ ও খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ : প্রতি মাসে একবার জাল টেনে প্রত্যেক প্রজাতির কমপক্ষে ৫টি মাছের গড় ওজন জেনে নিয়ে মোট মজুদকৃত মাছের সংখ্যা দ্বারা গুণ করে মাছের মোট জীবভর (Biomass) নির্ণয় করতে হবে। মোট জীবভরের ওপর ভিত্তি করে সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করে বর্ধিত হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মাছের কোনো প্রকার রোগবালাই বা দৈহিক বৃদ্ধির সমস্যা দেখা দিলে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পেন পরিচর্যা : পেনের বেড়া বা জালে কোনোরূপ ক্ষতি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় পেনের বেড়া ও জালে ময়লা আর্বজনা জমে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় বেড়া ও জাল পরিষ্কার করা না হলে পানির চাপে জাল ছিঁড়ে যেতে পারে বা বেড়া ভেঙে যেতে পারে। মাছ সংরক্ষণ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ও পেন পরিচর্যার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে পেন সংলগ্ন এলাকায় পাহাড়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ : বর্ণিত ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পালন করলে ৬-৭ মাসের মধ্যেই মাছ বিক্রির উপযোগী হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে উলেখিত সময়ে হেক্টরপ্রতি ৩-৩.৫ মে.টন মাছ উৎপাদিত হতে পারে।

অনুশীলনী-৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেন কালচার কাকে বলে?

২. পেন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন উপকরণের নাম লেখ।

৩. পেন তৈরিতে ব্যবহৃত বাঁশের বেড়া বা বানার আয়ুষ্কাল কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেনে মাছ চাষের দুটি সুবিধা লেখ।

২. পেনে মাছ চাষের দুটি অসুবিধা লেখ।

৩. পেন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন অত্যাবশ্যকীয় দুটি উপকরণের নাম লেখ।

৪. কোন পদ্ধতিতে সাধারণত পেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা হয়?

৫. পেনে চাষযোগ্য এমন দুইটি মাছের প্রজাতির নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পেনে মাছচাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. পেন তৈরির ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী তা বর্ণনা কর।

৩. পেনে চাষকৃত মাছের সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

দশম অধ্যায়

প্লাবনভূমিতে মাছচাষ

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘি আর মৌসুমী জলাশয়সমৃদ্ধ আমাদের এ দেশ। এদেশে কৃষিজ জমির তুলনায় জলাশয়ের পরিমাণ বেশি। ফলে আবহমান কাল থেকে এদেশ মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দেশের মৎস্য সম্পদের প্রধান তিনটি উৎসের মোট আয়তন ২০৯.১৫ লক্ষ হেক্টর। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। এই অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে প্লাবনভূমির পরিমাণ ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ৬৬% প্লাবনভূমি। প্লাবনভূমি হলো নিচু জমি যা নদী বা বিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। প্লাবনভূমি সাধারণত প্রতি বছর বর্ষার মৌসুমে পানিতে ডুবে নদী বা বিলের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। আবার শুকনো মৌসুমে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে গিয়ে ধানী জমিতে পরিণত হয়। প্লাবনভূমিতে সাধারণত বর্ষা মৌসুমে ৩ থেকে ৬ মাস পানি থাকে।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের গুরুত্ব : প্লাবনভূমির সিংহভাগ বছরের বেশির ভাগ সময় শুষ্ক থাকায় এখানে ধানসহ বিভিন্ন কৃষি ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে জমির উপরের মাটি উলটপালট হয় এবং কয়েক মাস প্রখর রোদে থাকায় মাটি খুবই উর্বর হয়। প্লাবনভূমিতে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার ও পলি মাটি জমে বিধায় মৎস্য উৎপাদনের জন্য দরকারি মৌলিক উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তাই এখানকার মাটি ও পানির উর্বরতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। পানির গভীরতা উপযুক্ত পর্যায়ে থাকায় প্লাবনভূমি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎকৃষ্ট চারণভূমি ও উপযুক্ত আবাসস্থল। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই এ দেশের প্রায় সব প্রজাতির মাছই প্রজনন করে। প্লাবনভূমি আবার অধিকাংশ মাছের প্রজননস্থলও বটে। ফলে সব প্রজাতির মাছের নতুন প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে প্লাবনভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষাট-সত্তর দশকে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মোট উৎপাদনের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যেত প্লাবনভূমি থেকে। ফলে দেশের বিরাট একটি অংশের মৎস্যজীবীরা প্লাবনভূমিতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার কারণে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের চিন্তা না করে মাত্রাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে। শুধু তাই না প্লাবনভূমিতে বিচরণরত পোনা মাছ নিধনসহ নানাবিধ মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে প্লাবনভূমির মাছের উৎপাদন তাই বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে। বন্যা পরবর্তী সময়ে প্লাবনভূমিতে মাছের চাষ করে এই ক্ষতি কিছুটা পূরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার ইতিহাস, বর্ষা মৌসুমের স্থায়িত্ব, বর্ষার ধরন ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে স্থানীয় লোকজনের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে দলীয় বা সমাজভিত্তিক মাছচাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের পরে মাছচাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, পেনে মাছ চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে কুমিলা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় প্লাবনভূমিতে মাছচাষ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

প্লাবনভূমিতে চাষ চাষের প্রয়োজনীয়তা : মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্লাবনভূমিও অন্যান্য জলাভূমির ন্যায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিল-ঝিল এবং নদী পাশের নিচু এলাকা প্লাবনভূমি হিসেবে পরিচিত। এসব প্লাবন ভূমিতে বছরে সাধারণত ধানের একটি মাত্র ফসল হয়। এরূপ ধানী জমির পরিমাণ দেশের মোট আবাদি জমির শতকরা ৮০ ভাগ। বোরো মৌসুমে ধান কাটার পরে এসব ধানের জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এসব জমিতে বৈশাখ মাসে বর্ষার পানি আসতে শুরু করে এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত পানি থাকে। বৈশাখ

থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত ৬-৭ মাসের মধ্যে প্রায় ৩-৫ মাস এসব অব্যবহৃত ধানের জমিতে ৩-১০ ফুট পর্যন্ত পানি থাকে, যা মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বর্ষা প্লাবিত এসব মৌসুমী জলাশয়ে মাছচাষ করে মানুষ তাদের জীবিকা পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে বর্ষা-প্লাবিত প্লাবনভূমিতে ধানের পরে মাছচাষ কার্যক্রম ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বিশেষ করে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ এবং নাটোর জেলার কিছু কিছু এলাকায় বর্ষা-প্লাবিত নিচু ধানী জমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধানের জমি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনমতো গোবর ও সার ব্যবহার করতে হয়। ফলে ধানক্ষেতে পানি, মাটি, গোবর, ও সারের মিশ্রণে যে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হয় তা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খুবই সহায়ক। তাই এরকম পরিবেশে ধানের পরে মাছের চাষ করে ব্যাপক সম্ভাবনাময় ধানক্ষেত তথা প্লাবনভূমিকে কাজে লাগিয়ে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে।

মাছ চাষের জন্য প্লাবনভূমি নির্বাচন : সাধারণত নিচু ধরনের জমি যেখানে ৬-৭ মাস মাছ চাষ উপযোগী (৪-৬ ফুট) পানি থাকে বা ধরে রাখা যায় সেসব জমিতে মাছ চাষ করা যায়। এসব জমিতে বোরো ধান কাটার পর পুকুরের মতো পোনা মজুদ করে মাছ চাষ করা হয়। এ ধরনের মাছ চাষে পোনা মজুদের হার পানির গভীরতার ওপর নির্ভর করে। পানির গভীরতা ৩ ফুট বা অধিক রাখা সম্ভব হলে পুকুরের মতো মিশ্রচাষ ও স্বাভাবিক ঘনত্বে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করা যায়। যথাযথ পরিচর্যা করা হলে এক্ষেত্রে পুকুরের মতোই স্বাভাবিক ফলন পাওয়া যায়। উপযুক্ত প্লাবনভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচে লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

- নিচু এলাকায় যেখানে অন্তত ৬ মাস ৩ ফুটের বেশি পানি থাকে।
- চাষকৃত এলাকার মধ্যে কিছু অংশে নালা বা গর্ত বা কুয়া থাকলে ভালো হয়। এর আয়তন মোট জমির শতকরা ১০ ভাগ হলে ভালো হয়।
- নদী বা খালের সাথে সংযোগ থাকলে ভালো, তাতে বর্ষার শুরুতে পানি ঢুকানো এবং মাছ ধরার সময়ে পানি কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। অন্যথায় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অথবা সেচের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করাতে হয়।
- প্লাবনভূমির দুই বা তিন দিকে সড়ক বা বাঁধ আছে এরূপ এলাকা হলে ভালো হয়। তাতে বাঁধ নির্মাণ খরচ কমে যায় ও
- যেকোনো আকারের প্লাবনভূমিতেই এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্ভব।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ পদ্ধতি : প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে পুকুরে মাছ চাষ পদ্ধতির চেয়ে ভিন্নতর। আবার জলাশয়ের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন প্লাবনভূমিতে ভিন্ন ধরণের মাছ চাষ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের মডেল হিসেবে দাউদকান্দি মডেলে কীভাবে মাছ চাষ হচ্ছে বা সে আদলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা নিচে বর্ণনা করা হলো।

বাঁধ বা উঁচু পাড় নির্মাণ : বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এমন উঁচু ও শক্ত বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

স্লুইচ গেট বা ইনলেট-আউটলেট নির্মাণ : বন্যার পানি বা অন্য কোনো প্রকল্প এলাকা থেকে পানি প্রবেশ করানো বা বের করে দেওয়ার জন্য আয়তন অনুযায়ী এক বা একাধিক স্লুইচ গেট বা ইনলেট-আউটলেট নির্মাণ করতে হবে।

গর্ত তৈরি : শুকনো মৌসুমে পোনা প্রতিপালন, বিলম্বে মাছ বিক্রি করার সুবিধা গ্রহণ অথবা সংকটকালীন সময়ে মাছ মজুদ প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের অভ্যন্তরে এক বা একাধিক গর্ত বানানো বা পুকুর নির্মাণ করা প্রয়োজন। অবশ্য অনেক প্রকল্পে আগে থেকেই গর্ত বা নালা বানানো থাকে।

জমি চাষ দেয়া ও চুন প্রয়োগ করা : এপ্রিল-মে মাসে বর্ষাপ্লাবিত হওয়ার আগে ধান কেটে নেওয়ার পর পরই জমিতে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে ধান কাটার পর জমিতে হালচাষ করে ১-২ সপ্তাহ পর্যন্ত রৌদ্রে শুকাতে পারলে ভালো হয়। সে ক্ষেত্রে হালচাষ করার পর চুন প্রয়োগ করতে হবে। কেনো কোনো সময় ধান কাটতে বিলম্ব হতে পারে অথবা আগাম বা অতি বৃষ্টিতে জমিতে পানি জমে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ধান কেটে নেওয়ার পর পরই চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রকল্পের অভ্যন্তরে গর্ত বা নালা থাকলে সম্ভব হলে সেগুলোকে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানো সম্ভব না হলে পানি থাকা অবস্থায় শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ : চুন প্রয়োগের ৪-৫ দিন পরে শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি হারে গোবর অথবা ৭-১০ কেজি হারে কম্পোষ্ট সার সারা প্রকল্প এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। বৃষ্টি হলে অথবা স্লুইচ গেট দিয়ে পানি ঢুকানোর পরে শতাংশপ্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ : প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য মজুদকৃত পোনার আকার ও সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোনার আকার ৫-৬ ইঞ্চির ছোট হলে চাষকালীন সময়ের মধ্যে সব প্রজাতির মাছ বিক্রির উপযোগী হবে না। আবার যেহেতু প্রকল্প এলাকায় নদী বা খাল থেকে অনেক সময় পানি প্রবেশ করানো হয় বা গর্তগুলো ভাল করে শুকানো হয় না, ফলে রাক্ষুসে মাছের ডিম প্রবেশ করতে পারে বা গর্তে রাক্ষুসে মাছ থেকে যেতে পারে। তাই এই ক্ষেত্রে বড় সাইজের পোনা মজুদ করা হয়। নিচে স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় শতাংশপ্রতি পোনা মজুদের দুইটি নমুনা সারণি-২১ ও ২২ এ দেখানো হলো। যেসব খামারে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যেমন- পানি পরিবর্তনের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ এবং পানিতে অক্সিজেন মিশানোর জন্য এরেটর -এর ব্যবস্থা আছে সেখানে নিচের নমুনা অনুসারে পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

সারণি-২১ : পোনা মজুদের নমুনা

প্রজাতি	পোনার আকার (ইঞ্চি)	মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা/শতাংশ)
সিলভার কার্প	৫-৬	৫
বিগহেড	৫-৬	৩
কাতলা	৮-১০	১
রুই	৬-৮	৪
মৃগেল	৬-৮	৩
কমন কার্প	৩-৫	২
গ্রাসকার্প	৮-১০	১
সরপুঁটি	৩-৪	৩
ব্ল্যাক কার্প	৬-৮	১
মোট		২৩টি

সারণি-২২ : পোনা মজুদের নমুনা

প্রজাতি	পোনার আকার (ইঞ্চি)	পোনা মজুদ (সংখ্যা/শতাংশ)	
		গভীরতা ৩ ফুট	গভীরতা ৩ ফুটের উর্ধ্বে
সিলভার কার্প	৪-৬	৮-১০	১৫-১৬
কাতলা	৫-৬	১-২	৩-৫
রুই	৪-৬	২-৩	৫-৬
মৃগেল	৪-৬	১-২	৩-৫
কমন কার্প	৪-৫	৩-৪	৫-৭
সরপুঁটি	২-৩	৮-১০	১৫-১৬
গ্রাসকার্প	৫-৬	২-৩	৪-৫
	মোট	২৫-৩৪	৫০-৬০

খাদ্য ও সার প্রয়োগ : প্লাবনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকে। তারপরও স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার জন্য পরিমাণমতো সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে এই সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। তবে সম্পূরক খাদ্যে অবশ্যই ১৫-২০% হজমযোগ্য প্রোটিন থাকতে হবে।

খাদ্য উপাদান : খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, ভুট্টার আটা প্রভৃতি সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রাসকার্প ও থাই সরপুঁটির জন্য নরম সবুজ কচি ঘাস, কলাপাতা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি প্রয়োগ করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

খাদ্যের পরিমাণ ও প্রয়োগের সময় : প্রতিদিন সকালে অথবা বিকেলে মাছের মোট ওজনের ২-৩% হারে খাদ্য দিতে হবে। তবে কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড, গ্রাস কার্পের মোট ওজন বাদ দিয়ে এই হিসেবে তৈরি করতে হবে।

খাদ্য প্রদানের স্থান : আয়তন অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্য দিতে হবে। প্রতি একরের জন্য ২টি স্থান হওয়া ভালো।

খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্ধেক খৈল ও অর্ধেক কুঁড়া/গমের ভুসি/ভুট্টার আটা পরিমাপ করে নিতে হবে। এরপর সরিষার খৈল সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভেজা খৈলের সাথে ভুসি মিশিয়ে বল তৈরি করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। বল শক্ত করার জন্য আটা অথবা চিটা গুড় ব্যবহার করলে খাদ্যের বলগুলো পানিতে দ্রুত গলে যাবে না। প্রত্যেক দিন একই সময়ে একই স্থানে খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত।

সার প্রয়োগ : প্লাবন ভূমিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখার জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তবে সার প্রয়োগের পূর্বে পানি পরীক্ষা করে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ নিশ্চিত হয়ে সার প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণভাবে পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামি সবুজ থাকলে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাণ মতো আছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তখন সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। আবার পানি বর্ণহীন অথবা ধূসর বর্ণের হলে সার প্রয়োগ করতে হবে। নিচে শতাংশপ্রতি সার প্রয়োগের মাত্রা উল্লেখ করা হলো।

সারণি-২৩ : শতাংশপ্রতি সার প্রয়োগের মাত্রা

সারের নাম	প্রয়োগের মাত্রা (প্রতি শতাংশ)		
	৭ দিন পর	১৫ দিন পর	১ মাস পর
ইউরিয়া	৪০ গ্রাম	৮০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	২০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
গোবর অথবা	১ কেজি	২ কেজি	৫ কেজি
কম্পোষ্ট সার	৫০০ গ্রাম	১ কেজি	২ কেজি

প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার তিনগুণ পানির সাথে মিশিয়ে ১২ ঘণ্টা পর প্রকল্পে/খামারে ছিটিয়ে দিতে হবে।

নমুনায়ন : পোনা মজুদের পর থেকে প্রতি মাসে অন্তত ১ বার করে মাছের নমুনায়ন করা উচিত। এতে মাছের সংখ্যা, বৃদ্ধি, সুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়।

আংশিক আহরণ : পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পরে আংশিক আহরণ করে মাছ বিক্রি করা যেতে পারে। অনেক সময় প্রকল্পে আপনা-আপনি মলা, ঢেলা, চেলা, পুঁটি ইত্যাদি ছোট ছোট মাছ জন্ম নেয়। তাই প্রথমেই এসব প্লাবনভূমিতে জন্মানো ছোট ছোট মাছ আহরণ করে বিক্রি করা যেতে পারে। এতে বিনিয়োগকৃত পুঁজির একটি বড় অংশ হাতে চলে আসে। যা থেকে পরবর্তী পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা যায়। এতে চাষের মাছগুলো পর্যাপ্ত খাবার ও জায়গা পেয়ে দ্রুত বড় হয়ে ওঠে, ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমে যায় এবং রোগ বালাই সহ অন্যান্য ঝুঁকি কমে যায়।

শীতপূর্ব চুন প্রয়োগ : মাছের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

মাছ আহরণ ও বিক্রি : মাছের পূর্ণ আহরণের পূর্বে অবশ্যই বিক্রির সু-ব্যবস্থা করতে হবে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে মাছের ভালো বাজারমূল্য থাকে বলে সে সময়ে মাছ পুরোপুরি আহরণ করে বিক্রি করলে ভালো মূল্য পাওয়া যেতে পারে। তবে অঞ্চলভেদে এ সময়ের তারতম্য হতে পারে।

অনুশীলনী-১০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ কত লক্ষ হেক্টর?
২. প্লাবনভূমির পরিমাণ কত লক্ষ হেক্টর?
৩. প্লাবনভূমিতে সাধারণ ব্যবস্থাপনায় শতাংশপ্রতি কতটি রুই জাতীয় মাছ মজুদ করা হয়?
৪. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে রোগ বালাই প্রতিরোধকল্পে শতাংশে কতটুকু চুন প্রয়োগ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্লাবনভূমি বলতে কী বুঝ?
২. প্লাবনভূমিতে প্রতি সপ্তাহে শতাংশপ্রতি কতটুকু ইউরিয়া ও টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে?
৩. নমুনায়ন বা স্যাম্পলিং এর গুরুত্ব কী?
৪. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে কেন আংশিক আহরণ করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. মাছচাষে প্লাবনভূমি নির্বাচনে কী কী বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনা করা যেতে পারে ?
৩. প্লাবনভূমিতে মাছচাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায়

অ্যাকোয়েরিয়ামে বাহারি মাছ পালন ও পরিচর্যা

অ্যাকোয়েরিয়াম হচ্ছে কাচের তৈরি কৃত্রিম জলাধার যেখানে প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের বর্ণালি মাছ লালন করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় অ্যাকোয়েরিয়াম হলো মানুষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি জলজ বাগান, যেখানে জলজ উদ্ভিদ ও মাছ এমনভাবে অবস্থান করে যা প্রায় প্রকৃতিতে অবস্থানের ন্যায়।

অ্যাকোয়েরিয়ামের গুরুত্ব : সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বাহারি মাছ যখন স্বচ্ছ কাচের জলজ বাগানে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায় তা দেখে চোখ জুড়ায়। অ্যাকোয়েরিয়াম অফিস এবং ড্রয়িংরুমের সৌন্দর্য বাড়ায়। এছাড়া অ্যাকোয়েরিয়ামে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। অ্যাকোয়েরিয়ামের সঠিক ব্যবহার প্রাকৃতিক ইতিহাস, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও জীববিদ্যা পাঠকে উপভোগ্য ও সহজবোধ্য করে দিতে পারে। জাপানে অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছের আকস্মিক ছোটাছুটি দেখে সেখানকার মানুষ আগাম ভূমিকম্প সম্পর্কে জানতে পারে। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে অ্যাকোয়েরিয়ামের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে মাছের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে তার উচ্চ রক্তচাপ অনেকাংশে স্বাভাবিক হয়ে আসে। শুধুমাত্র অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ প্রতিপালনই নয়, মাছের সাথে সাথে অ্যাকোয়েরিয়াম সাজানোর কিছু আনুষাঙ্গিক দ্রব্য, যেমন- প্লাস্টিকের ফিডার (খাবার পাত্র), প্লাস্টিকের গাছ, এরেটর, কাঠের ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি ও সরবরাহের মাধ্যমে ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষিত ও বেকার যুবক তাদের জীবিকা অর্জন করছে। ক্রমেই এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অ্যাকোয়েরিয়ামে বাহারি মাছ প্রতিপালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অ্যাকোয়েরিয়াম তৈরি : অ্যাকোয়েরিয়াম সাধারণতঃ কাঁচ বা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত দ্রব্যসমূহ বাহির থেকে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অ্যাকোয়েরিয়ামটি সাধারণত আয়ত-কার হয়ে থাকে। তবে বর্গাকার বা অন্যান্য আকারেরও হতে পারে। যে ঘরে স্থাপন করা হবে তার আকারের ওপর নির্ভর করে অ্যাকোয়েরিয়ামের আকার নির্ধারণ করা হয়। তবে ঘরে রাখার জন্য ২৪"x১২"x১২" আকারের অ্যাকোয়েরিয়ামই উপযুক্ত। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অ্যাকোয়েরিয়াম লম্বায় বা প্রস্থে যতই বড় হোক না কেন, উচ্চতায় যেন ১৮ ইঞ্চির বেশি না হয়। তার কারণ এসব মাছ অল্প পানিতে বসবাস করে। পানির উচ্চতা বেশি হলে মাছ পানির চাপ সহ্য করতে পারবে না। অবশ্য কোনো কারণে অ্যাকোয়েরিয়ামের উচ্চতা বেশি হলে পানি রাখার সময় সর্বোচ্চ ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ পানি রাখলেই চলবে। অ্যাকোয়েরিয়ামে যে কাচ ব্যবহার করা হয় তার পুরুত্ব ৬ মি.মি. হলেই চলবে। কাচের স্লাইডগুলোকে সিলিকা গাম বা উন্নত মানের আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হয়, যাতে করে জোড়া দেওয়া অংশও স্বচ্ছ থাকে এবং দৃষ্টিনন্দন হয়।

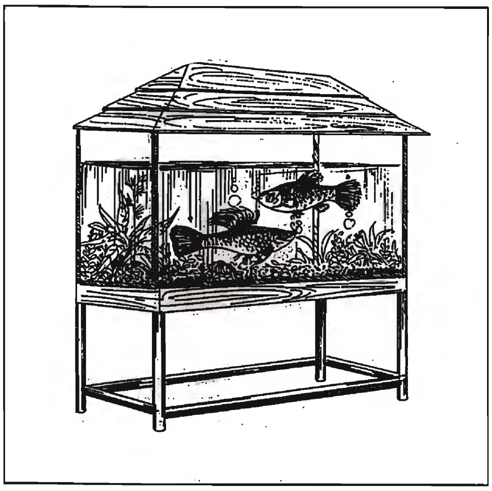

চিত্র-১৩ : অ্যাকোয়েরিয়ামে বাহারি মাছ

অ্যাকোয়েরিয়ামের আকারের সাথে মিল রেখে সুদৃশ্য কাঠের বা টিনের ঢাকনা ব্যবহার করা হয়। ঢাকনার এক

প্রান্ত যাতে প্রয়োজনানুসারে খোলা ও বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। ঢাকনার মাঝে কিছুটা ফাঁক রাখা হয় যাতে করে বাতাস সুষ্ঠুভাবে চলাচল করতে পারে এবং ক্ষতিকারক গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে।

কৃত্রিম আলোকসজ্জা : মাছের অবিশ্রান্ত বিচরণ সহজে দেখার জন্য এবং বাহারী মাছের বর্ণিল রূপ দর্শনের জন্য অবশ্যই আলো দরকার। এক্ষেত্রে ২৪"x১২"x১২" আকারের একটি অ্যাকোয়েরিয়ামের জন্য ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব দৈনিক অন্তত ৮ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা দরকার। অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ রাখার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করতে হবে।

ক. পরিষ্কার থিতানো পানি দ্বারা অ্যাকোয়েরিয়ামের ভিতর এবং বাহির পরিষ্কার করে নিতে হবে। কখনও সাবান বা অন্য কোনো ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। তবে লবণের ঘন দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. পরিষ্কার মোটা দানার বালি অথবা ছোট ছোট পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানি দ্বারা ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

গ. ধৌত করা বালি বা নুড়ি পাথর অ্যাকোয়েরিয়ামের তলদেশে ৪ ইঞ্চি পুরু করে ভালোভাবে বিছিয়ে দিতে হবে।

ঘ. পানি ভর্তি করার আগে অ্যাকোয়েরিয়ামকে বাড়ির একটি নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দর একটি কাঠের ফ্রেমের উপর স্থাপন করে সম্ভব হলে যেখানে আংশিক সূর্যালোক পড়ে এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত।

ঙ. এবার থিতানো ও ক্লোরিনমুক্ত পানি দ্বারা অ্যাকোয়েরিয়াম পূর্ণ করতে হবে। পানির উপরিতল অ্যাকোয়েরিয়ামের উপরিতল থেকে ৩ ইঞ্চি বা ৪ ইঞ্চি নিচে হতে হবে।

চ. পানি দ্বারা পূর্ণ করার পরে বড় ধরনের অ্যাকোয়েরিয়ামের ক্ষেত্রে ভেলিসনেরিয়া, অ্যানাকারিস, আমাজন সোর্ড প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে। এসব জলজ উদ্ভিদ একদিকে যেমন- অ্যাকোয়েরিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, অন্য দিকে মাছের আশ্রয়স্থল ও শ্বাসকার্যে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে ছোট ছোট অ্যাকোয়েরিয়ামের ক্ষেত্রে অনেকেই প্লাস্টিকের তৈরি গাছ ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অ্যাকোয়েরিয়ামে বালি বা নুড়ি পাথরের উপর সুন্দর সুন্দর কোরাল বা ঝিনুকের খোলস ব্যবহার করে থাকেন।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন : অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ লালন-পালনের ক্ষেত্রে মাছের প্রজাতি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশী-বিদেশী বাহারি রঙে শোভিত চকচকে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মাছ অ্যাকোয়েরিয়ামে লালন-পালন করা হয়। আমাদের দেশে অ্যাকোয়েরিয়ামে বাহারি মাছের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। নিচে অ্যাকোয়েরিয়ামে পালন যোগ্য কিছু দেশী এবং বিদেশী মাছের নাম দেওয়া হলো।

দেশী মাছ	বিদেশী মাছ
খলিসা, পুঁটি, গুতুম, বউ বা রাণি মাছ, বাইম, বেলে, চিংড়ি, পটকা, শিং, মাগুর, কৈ ইত্যাদি।	সোর্ড টেইল, অ্যানজেল, গোরামী, ব্ল্যাক মলি, গোল্ড ফিস, সার্ক, জেব্রা ফিশ, রেইনবো, গাপ্পি, ফাইটিং ফিশ, ইত্যাদি।

মাছের সংখ্যা : অ্যাকোয়েরিয়ামে বেশি সংখ্যক মাছ ছাড়ার চেয়ে অল্প সংখ্যক সুন্দর, সুস্থ ও সবল মাছ ছাড়াই উত্তম। তবে অ্যাকোয়েরিয়ামে কী পরিমাণ বা কত সংখ্যক, কোন প্রজাতির সাথে কোন প্রজাতির মাছ ছাড়া যাবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে অ্যাকোয়েরিয়ামের আকারের ওপর। সাধারণভাবে ১ ইঞ্চি আকারের মাছের জন্য ১ গ্যালন পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়। সেই হিসাবে ২৪"x১২"x১২" আকারের একটি অ্যাকোয়েরিয়ামে ১-১.৫ ইঞ্চি আকারের ১০-১২টি মাছ অনায়াসেই বেঁচে থাকতে পারে।

মাছের খাদ্য : অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ ছাড়ার পর নিয়মিত মাছের খাদ্য প্রদান করা উচিত। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং পানির তাপমাত্রা মাছের খাদ্য গ্রহণকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অ্যাকোয়েরিয়ামে সাধারণত সকাল বেলায় মাছকে খাবার দিতে হয়। সকালে অ্যাকোয়েরিয়ামে লাগানো গাছ অক্সিজেন সরবরাহ করে ফলে মাছ খাদ্য গ্রহণে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। অধুনা বাজারে অ্যাকোয়েরিয়াম মাছের বিভিন্ন প্রকার ভাসমান পিলেট জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়। এসব খাদ্য সংগ্রহ করে মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে। ভাসমান খাদ্য খাওয়ানো হয় বলে মাছ কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করছে তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আবার সহজে পাওয়া যায় এমন খাদ্য যেমন টিউবিফেক্সও মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে। খাবার মাছের দৈহিক ওজনের ৫ শতাংশ হারে দিতে হয়। সম্ভব হলে সকালে এবং বিকেলে ২ বার মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে মাছ যতটুকু খাবার গ্রহণ করে ততটুকু খাবারই প্রয়োজন ছিল বলে ধরে নিতে হবে। তবে ভাসমান খাদ্যের ক্ষেত্রে কতটুকু খাদ্য মাছ গ্রহণ করল তা সহজেই বুঝা যায়।

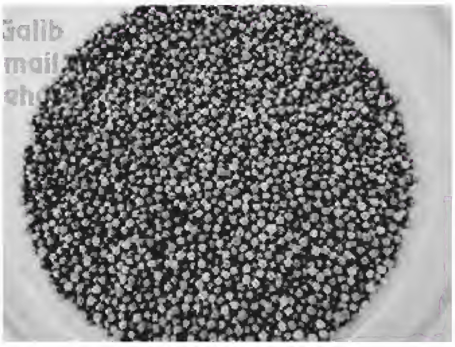

চিত্র-১৪ : অ্যাকোয়েরিয়ামে ব্যবহৃত ভাসমান খাদ্য

কৃত্রিম বায়ু সঞ্চালন ও পানি পরিস্রাবণ : অ্যাকোয়েরিয়াম মূলত একটি কৃত্রিম পরিবেশ। এই পরিবেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ লাগানো সত্ত্বেও অনেক সময় অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। তাই অ্যাকোয়েরিয়ামে এরেটরের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হয়। বাজারে বিভিন্ন মানের এবং বিভিন্ন দামের এরেটর পাওয়া যায়। এরেটর দ্বারা বাহিরের বাতাসকে চিকন নলের ভিতর দিয়ে পানিতে চালনা করা হয়। এই নলের অপর প্রান্তে ছিদ্রযুক্ত পাথর থাকে যা বাতাসকে বুঁদবুঁদে রূপান্তরিত করে। অনেক সময় পাথরের পরিবর্তে বিভিন্ন বর্ণের ও রঙের পুতুল, পশু-পাখির আকৃতি সম্বলিত প্লাস্টিকের বা অন্য যেকোনো ধাতব বস্তু দ্বারা এরেটরকে সজ্জিত করে। অ্যাকোয়েরিয়ামের পানির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা আবশ্যক। যদি পানি পরিবর্তন করা সম্ভব না হয়, তবে পানি ফিল্টার করে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত পাওয়ার ফিল্টার ও বায়োলজিক্যাল ফিল্টার পানি পরিশোধনের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আক্রান্ত মাছের চিকিৎসা : অনেক সময় অ্যাকোয়েরিয়ামের মাছের গায়ে, মুখে এবং ঠোঁটে ঘা হতে পারে। যদি মাছের গায়ে ঘা দেখা দেয় তাহলে আক্রান্ত মাছকে স্কুপনেট দ্বারা অ্যাকোয়েরিয়াম থেকে তুলে নিয়ে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা ২০০ গ্রাম লবণ গুলে নিয়ে সেই পানিতে সহ্য করার মতো সময় (২ মিনিট) মাছকে রেখে পুনরায় অ্যাকোয়েরিয়ামে রেখে দিতে হবে। এভাবে পর পর ৩ সপ্তাহ চিকিৎসা করলে আক্রান্ত মাছ অনেকাংশে ভালো হয়ে যায়।

অনুশীলনী-১১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যাকোয়েরিয়ামে আলোর জন্য দৈনিক কত ঘণ্টা আলো জ্বালিয়ে রাখা দরকার?

২. একটি স্বাভাবিক আকৃতির অ্যাকোয়েরিয়ামের আকার কত?

৩. স্বাভাবিক আকৃতির অ্যাকোয়েরিয়ামে কতটি মাছ পালন করা যেতে পারে?

৪. অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ পালনের ক্ষেত্রে ১ ইঞ্চি আকারের মাছের জন্য কত গ্যালন পানির প্রয়োজন হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যাকোয়েরিয়ামের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত হয় এমন দুটি জলজ উদ্ভিদের নাম লেখ।

২. অ্যাকোয়েরিয়ামে পালনযোগ্য দুটি দেশী মাছের নাম লেখ।

৩. অ্যাকোয়েরিয়ামে পালনযোগ্য দুটি বিদেশী মাছের নাম লেখ।

৪. অ্যাকোয়েরিয়াম ফিশের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছ পালনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. অ্যাকোয়েরিয়াম তৈরির কলা-কৌশল বর্ণনা কর।

৩. অ্যাকোয়েরিয়ামে মাছকে কীভাবে খাবার দিতে হয় তা বর্ণনা কর?

দ্বাদশ অধ্যায়

মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

মাছ ধরার পর ধৃত মাছের গুণগতমান সঠিক রাখা এবং ক্রেতার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত মাছের সতেজতা বজায় রেখে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকেই মাছ সংরক্ষণ বলে। এ অধ্যায়ে মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- বরফ দ্বারা, রোদে শুকিয়ে, টিনজাত করে, লবণায়ন ও ধূমায়িতকরণ বর্ণনা করা হলো।

মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা : মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য এবং পচন থেকে রক্ষা করার জন্য ধরার পর থেকে মাছ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পচনশীল দ্রব্যের মধ্যে মাছ অন্যতম। তাই মাছ ধরার পর থেকে এর সংরক্ষণ প্রয়োজন। মাছ ধরার একটা নির্দিষ্ট সময় পর থেকে এর পচনক্রিয়া শুরু হয়। মাছ একবার পচে গেলে কোনোভাবেই তা আর পূর্বাবস্থায় ফিরানো যায় না। অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে মাছ পচে থাকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের মাধ্যমে মাছের এই পচনক্রিয়া রোধ করা যায়। মাছের দেহে পানি, আমিষ ও স্নেহ বা তেল জাতীয় পদার্থ বেশি থাকে এবং শর্করা জাতীয় উপাদান খুব সামান্য পরিমাণে থাকে, ফলে মাছ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা তাড়াতাড়ি পচে। প্রধানত দুটো কারণে মাছ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তা হলো- ক) ভালো দামে বিক্রির জন্য, এবং খ) মাছের সতেজতা ও পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য।

মাছ পচার কারণসমূহ : মাছের সতেজতা নষ্ট হওয়া বা মাছ পচে যাওয়ার কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো। সাধারণত তিনটি কারণে মাছের সতেজতা নষ্ট হয়ে যায় বা মাছ পচে যায়। এগুলো হলো−

১. ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে;
২. এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে এবং
৩. বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার কারণে।

১. ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণ : মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ, যেমন- আঁইশ, ফুলকা, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদিতে অসংখ্য জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় এরা মাছের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মাছ মরার পর থেকেই পরিচর্যার সময় মানুষের হাত, পরিবহনে ব্যবহৃত পাত্র এবং পরিবেশ থেকেও মাছ ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সংক্রমিত হতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়া মাছের দেহে এনজাইম নিঃসরণ করে। ফলে মাছের মাংসপেশি নরম হয়ে যায় এবং দ্রুত পচনক্রিয়া শুরু হয়। মাছ আস্তে আস্তে নরম হতে থাকে। এ সময় বাতাসের অক্সিজেন মাছের দেহের চর্বি ভেঙে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। এভাবে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সময়ের সাথে সাথে পচনের মাত্রা বাড়তে থাকে।

২. এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে : মাছের দেহে বিভিন্ন এনজাইম থাকে। জীবিত অবস্থায় খাদ্য হজমে মাছ এ এনজাইম ব্যবহার করে। কিন্তু মাছ মারা যাওয়ার পরও এই এনজাইম নিঃসৃত হতে থাকে এবং তার ক্রিয়া চলতে থাকে। এসব এনজাইমের ক্রিয়ায় মৃত মাছের কোষ-কলা ভেঙ্গে যায় এবং মাছ পচতে শুরু করে। এই ক্রিয়াকে অটোলাইসিস (Autolysis) বলে।

৪. বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার কারণে : মাছের দেহ বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। তার মধ্যে প্রোটিন ও চর্বিই প্রধান। মাছের চর্বিতে প্রচুর পরিমাণে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। মাছ মারা যাওয়ার পর

মাছের এই অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডসমূহ বাতাসের সংস্পর্শে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পার-অক্সাইড, অ্যালডিহাইড, কিটোন ইত্যাদি বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। অধিক মাত্রায় এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থ উৎপন্ন হলে মাছের স্বাভাবিক রং, স্বাদ, তথা গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং মাছে পচন ধরে বা মাছ পচে যায়।

মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ : আমাদের দেশে মাছ সংরক্ষণের তেমন কোনো উন্নত বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। ফলে প্রতি বছর মাছ ধরার ভরা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে মাছ নষ্ট হয়ে যায়। মাছের এই পচন রোধকল্পে নিচে মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১. বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণ;
২. শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ;
৩. টিনজাত, লবণায়ন এবং ধুমায়িত প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ; এবং
৪. হিমায়নের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ।

১. বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণ : বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণ একটি স্বল্পকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বরফ ব্যবহার করে মাছের দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস কিংবা তার কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়। এতে ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে এদের আক্রমণও বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া মাছের নিজস্ব এনজাইমের কার্যকারিতা ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়াও বিলম্বিত হয়। ফলে মাছের পচন বিলম্বিত হয়।

বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের সুবিধা

- এ পদ্ধতি যেকোনো মৌসুমে প্রয়োগ করা যায়;
- এ পদ্ধতি মাছ সংরক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সহজ;
- ছোট-বড় সব ধরনের মাছই এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়;
- বরফ দিয়ে সংরক্ষিত মাছ সহজেই পরিবহন করা যায় ও
- এ পদ্ধতিতে গলিত বরফের ঠান্ডা পানি সংরক্ষিত মাছের শরীরে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া, রক্ত ও ময়লা ধুয়ে সরিয়ে ফেলে যা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়।

বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা

- বরফ তৈরিতে প্রায়শ অপরিষ্কার পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে বরফের মাধ্যমে পচনশীল ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু মাছের দেহে সংক্রমিত হতে পারে।
- ব্যবহৃত বরফের টুকরাগুলো বড় এবং বিভিন্ন সাইজের হওয়ার ফলে এবং অনেক সময় বরফের টুকরোর কোনার আঘাতে মাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফলে মাছের বাজারমূল্য কমে যায়।
- বরফ এবং মাছের অনুপাত সঠিকভাবে দেয়া হয় না বলে সংরক্ষিত মাছের পুষ্টিমান ঠিক থাকে না, ও
- অনেক সময় তাপ কুপরিবাহী পাত্র ব্যবহার করা হয় না বলে বরফের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

বরফ ও বরফের প্রকারভেদ : আমরা জানি, পানি শূন্য ডিগ্রি (০° সে.) সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জমে যায় একেই আমরা বরফ বলে থাকি। নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ অপসারণের মাধ্যমে পানিকে বরফে পরিণত করা হয়। কারখানাতে সাধারণত ৩ ধরনের বরফ তৈরি করা হয়। যেমন- ব্লক (Block), ফ্লেক (Flake) এবং টিউব (Tube) আইস। আমাদের দেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্লক আইস (Block)-ই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে মাৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ব্যবহারের জন্য ব্লক আইসের চেয়ে ফ্লেক আইস বেশি উপযোগী।

ব্লক আইস : আমাদের দেশের অধিকাংশ কারখানাতে ব্লক আইস তৈরি হয়। ব্লক আইস তৈরির পাত্রগুলো প্রতিবারে ভর্তি করার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পাত্রগুলো মসৃণ ও ক্ষয়রোধক ধাতব পদার্থের (Stainless Steel) হওয়া উচিত। যদিও আমাদের দেশে অধিকাংশ কারখানাতে গ্যালভানাইজড শিটের (Galvanized Sheet) তৈরি পাত্র ব্যবহার করা হয়। ব্লক আইস বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ওজনের হয়ে থাকে। যেমন- ১০ কেজি থেকে ১৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

ফ্লেক আইস : ফ্লেক আইস খুবই ছোট ছোট আকারের হয়ে থাকে এবং এর পুরুত্ব ০.৫ সে.মি. এর চেয়ে কম হয়। এগুলো গুঁড়ো আকারের হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ফ্লেক আইস ব্যবহার করাই শ্রেয়। কারণ ফ্লেক আইসের টুকরা খুব ছোট হওয়ায় এগুলো মাছ কিংবা চিংড়ির গায়ের সাথে লেগে থাকে। ফলে মাছ কিংবা চিংড়ি দ্রুত ঠাণ্ডা হয়।

টিউব আইস : টিউব আইস দেখতে গোলাকার টেস্ট টিউবের মতো। এদেরকেও ব্লক আইসের মতো গুঁড়ো করে ব্যবহার করতে হয়।

ব্লক আইস ও টিউব আইস গুঁড়ো করার পদ্ধতি : ব্লক আইস অথবা টিউব আইস গুঁড়ো করার জন্য এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটিতে একটি লোহার রোলিং ড্রামের চারিদিকে বড় বড় কাঁটা থাকে। লোহার ড্রামে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উপরের দিকে বরফ খণ্ড দিলে সাথে সাথে কাঁটার আঘাতে বরফ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গুঁড়ো আকারে পাত্রে জমা হয়। যেখানে এ ধরনের সুবিধা নেই সেখানে শক্ত কাঠের টুকরা কিংবা রডের সাহায্যে হাতুড়ির ন্যায় আঘাত করেও ব্লক আইস গুঁড়ো করা যায়। সাধারণত বরফ সংরক্ষণের জন্য আলাদা সংরক্ষণাগার থাকে। বরফ সংরক্ষণাগার সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হবে। বরফ তৈরি, সংরক্ষণ, গুঁড়ো করা বা ব্যবহার করার সময় বরফের মাধ্যমে যাতে মাছে সংক্রমণ ঘটতে না পারে সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা উচিত। আবার মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত বরফ যেন অবশ্যই পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত খাওয়ার উপযোগী পানি দ্বারা তৈরি করা হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

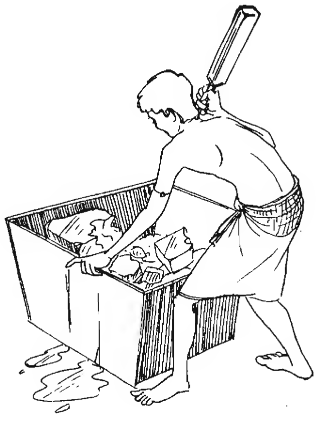

চিত্র-১৫ : হাতুড়ির সাহায্যে ব্লক আইস গুঁড়ো করা

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি : আমাদের দেশে বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে মাছকে সাধারণ পানিতে ধুয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে মাছের আঁইশ কিংবা নাড়িভুঁড়ি বের করা হয় না। বাঁশের চাটাই কিংবা হোগলার তৈরি টুকরিতে বরফ এবং মাছ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। এসব ক্ষেত্রে বরফ এবং মাছের অনুপাত আনুমানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত ৪ ভাগ মাছের সাথে এক ভাগ

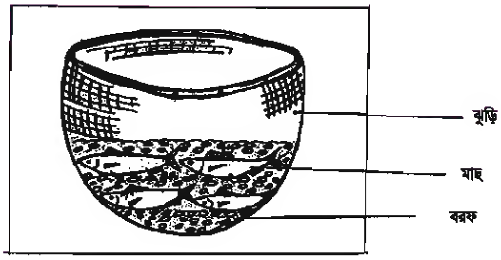

চিত্র ১৬ : বাঁশের ঝুড়িতে স্তরে স্তরে সাজানো বরফ ও মাছ

বরফ ব্যবহার করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ভালো ফল পেতে হলে অবশ্যই শীতকালে বরফ এবং মাছের অনুপাত ১ঃ২ এবং গ্রীষ্মকালে ১ঃ১ হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ও বরফ পাত্রে রাখার পর এর উপর একটি হোগলার মাদুর বা চটের টুকরো দিয়ে চেপে সেলাই করে দেয়া হয়। অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থানে সরবরাহের বেলায় এই পাত্রটি অন্য একটি কাঠের বাক্সে পুরে নেয়া হয়। আমাদের দেশে সাধারণত ইলিশ মাছ এভাবে দূরবর্তী স্থানে পরিবহন করা হয়।
অনেক সময় অধিক পরিমাণে মাছ এক সাথে প্যাকিং করার ফলে উপরের মাছের চাপে নিচের মাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ পদ্ধতিতে মাছকে ৩ থেকে ৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বরফ ও মাছের যথাযথ অনুপাত এবং সঠিক পাত্র ব্যবহার করলে ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করার আধুনিক পদ্ধতি : বর্তমানে মাছ পরিবহনে ব্যবহৃত বাঁশের ঝুড়িকে এই পদ্ধতিতে অতি সহজে এবং সস্তায় তাপ চলাচল প্রতিরোধী বরফ বাক্সে পরিণত করা হয়। উপকূলীয় মৎস্যজীবী গ্রামগুলোতে খুবই কার্যকরভাবে এ ধরনের পরিবর্তিত বরফ বাক্সে ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই ধরনের ঝুড়িতে মাছ ঝুড়ির সংস্পর্শে আসে না। তাই বাঁশের চটির ফাঁক-ফোকর থেকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই। এমনকি পলিথিন দিয়ে আগাগোড়া মোড়ানো থাকে বলে ঝুড়ি পরিষ্কার করতেও সমস্যা হয় না। এই ক্ষেত্রে প্রথমে প্রমাণ সাইজের (২০-৩০ কেজি) বাঁশের ঝুড়ির ভিতরের দিকটা প্লাস্টিকের বস্তা দিয়ে সেলাই করে মুড়ে দিতে হবে। চটের কিছু অংশ বাড়তি থাকবে। চট দিয়ে মোড়ানোর পর ঝুড়ির ভিতরে এমনভাবে হোগলার পাটি বিছিয়ে দিতে হবে যাতে হোগলার কিছু অংশ বাড়তি থাকে। হোগলার উপর আর এক প্রস্থ প্লাস্টিকের বস্তা পূর্বের ন্যায় সেলাই করে দিতে হবে। এবার সেলাই করা প্লাস্টিকের উপর পাতলা পলিথিন শিট বিছিয়ে দিয়ে বরফ দেয়া মাছ পরিবহন করতে হবে। প্রথমে পলিথিন শিটের উপর এক স্তর বরফ রেখে মাছ সাজিয়ে দিতে হবে। এর পর ভাঁজে ভাঁজে বরফ ও মাছের স্তর সাজিয়ে উপরে অতিরিক্ত বরফ দিয়ে বাড়তি চট, হোগলা ও পলিথিন শিট এক সাথে মুড়ে ঝুড়ির মুখ বাঁধাই অবস্থায় মাছ পরিবহন করতে হবে। এই ধরনের ঝুঁড়ির ক্ষেত্রে ঝুড়ির তলায় বরফ গলা পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য ছিদ্র থাকে। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে বাঁশের ঝুঁড়িতে মাছ পরিবহনের সময় ছিদ্র না থাকার কারণে বরফ গলা পানি সমস্যা সৃষ্টি করে।

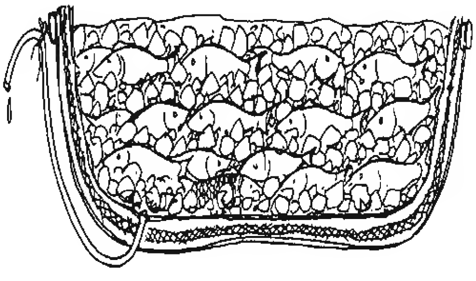

চিত্র-১৭ : মাছ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক বাক্সে স্তরে স্তরে মাছ ও বরফ সাজানোর দৃশ্য

এই পদ্ধতিতে ঝুড়ির তলার পলিথিন, হোগলা ও প্লাস্টিকের চট ছিদ্র করে ১ সে.মি. ব্যাসের ২ ফুট লম্বা একটি প্লাস্টিকের নল ঢুকিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়। এবার নলের অপর প্রান্ত বাঁকিয়ে ঝুড়ির উপরের দিকে এক প্রান্তে বেধে রাখা হয়। মাঝে মাঝে নলের মুখ নামিয়ে দিলে বরফ গলা পানি নল দিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবে বরফ দেয়া মাছ ২৪ ঘণ্টা পুনরায় বরফ না দিয়েও গুণাগুণ যথাযথ রেখে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি ২৪ ঘণ্টা

অন্তর অন্তর একবার করে মাছের উপর সামান্য বরফ দিয়ে প্রায় ৫-৬ দিন পর্যন্ত খুব ভালভাবে এই পদ্ধতিতে মাছকে বরফে সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে হোগলা পাতা একটি চমৎকার তাপ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

বরফের গুণাগুণ বাড়ানোর উপায় : মাছ সংরক্ষণে বরফের গুণগতমান বাড়ানোর লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যেমন-

- বরফ তৈরিতে সব সময় দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।
- সমুদ্রের লোনা পানি থেকে তৈরি বরফের সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই স্বাদু পানিতে ৩% খাবার লবণ মিশিয়ে এই বরফ তৈরি করা যায় ও
- বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সংরক্ষক, যেমন- সোডিয়াম বেনজোয়েট, সোডিয়াম নাইট্রেট, বেনজোয়িক এসিড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ইত্যাদি বরফের সাথে মিশিয়ে এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

বরফে সংরক্ষিত মাছ পরিবহন : বরফে সংরক্ষিত মাছ সাধারণত বাঁশের চাটাই কিংবা হোগলার তৈরি ঝুড়িতে করে পরিবহন করা হয়। এসব ঝুড়ির ভিতরের দিকে শুকনো পাতা কিংবা চটের একটি পাতলা আস্তরণ দেয়া হয়। এসব পাত্রের উপরে ঢাকনা দিয়ে সমস্ত ঝুড়িটাকে চটের আস্তরণ দিয়ে সেলাই করা হয়। পুরাতন কাঠ (চা-বাক্স) দিয়ে বাক্স তৈরি করেও অনেক সময় মাছ পরিবহন করা হয়। ইনসুলেটেট (Insulated) ভ্যানে মাছ পরিবহন করতে পারলে মাছের গুণগতমান দীর্ঘ সময় ভালো রাখা সম্ভব। ইনসুলেটেড ভ্যান না থাকলে ট্রাক বা ট্রেনের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে মাছ পরিবহন করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে যেন মাছের বাক্সগুলো এক সাথে স্তূপাকারে রাখা না হয়। এতে করে উপরের বাক্সের চাপে নিচের মাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ট্রেন বা ট্রাক থেকে মাছ উঠানো নামানোর সময় বিশেষ নজর দিতে হবে যেন মাছের বাক্স জোরে ফেলা না হয়। গন্তব্যস্থলে পৌছার পর পাইকারি বাজারে বিক্রি শেষে খুচরা বাজারে প্রেরণের সময় পুনরায় নতুন বরফ যোগ করে পরিবহন করা উচিত।

২. শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ : শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি। আমাদের দেশে মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি একটি ব্যাপক ব্যবহৃত পদ্ধতি। তবে সব ধরনের মাছ এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায় না। যেমন- ইলিশ মাছসহ যেসব মাছে চর্বি বেশি সেসব মাছ এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায় না। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সূর্যালোক ও বাতাসের মাধ্যমে মাছ থেকে পানি বা জলীয় অংশ হ্রাস করানোকে শুঁটকিকরণ বলে। শুঁটকিকরণের ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। তাই মাছের দেহে পানির পরিমাণ কমে যায়। ফলে ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবসমূহ জন্মাতে বা বৃদ্ধি পেতে পারে না। ফলে মাছের পচন রোধ হয়। উল্লেখ্য টাটকা বা তাজা মাছের শরীরে প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ পানি থাকে।

শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি : নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা যায়।

ক. সূর্যালোকে শুকিয়ে মাছ শুঁটকিকরণ,
খ. পলিথিন তাঁবু বা সোলার টেন্ট ড্রায়ার ব্যবহার করে মাছ শুঁটকিকরণ;
গ. নিরুদীকরণ (Dehydration) -এর মাধ্যমে মাছ শুঁটকিকরণ, ও
ঘ. সিঁদল বা চেপা শুঁটকিকরণ।

ক. সূর্যালোকে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ : আমাদের দেশে সাধারণত শীত মৌসুমে সূর্যালোকে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। এ সময়ে আর্দ্রতা ও বৃষ্টি কম থাকে। তাছাড়া সূর্যালোকের স্থায়িত্বের কারণে শুঁটকিকরণের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। আবার এ সময়ে বিল বা হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। ফলে চাহিদার অতিরিক্ত মাছ বাজারে এলে বাজারে মাছের দাম কমে যায়, তাতে মৎস্যজীবীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই এ সময়ে মৎস্যজীবীরা তাৎক্ষণিকভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অতিরিক্ত মাছ সংরক্ষণ করে থাকেন।

ছোট মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে ছোট মাছ, যেমন- চান্দা, পুঁটি, মলা, ঢেলা, চাপিলা, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছের ক্ষেত্রে সাধারণত আঁইশ, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলা হয় না। শুধুমাত্র শুকানোর আগে পরিষ্কার পানিতে মাছগুলোকে ধোয়া হয়। পরে মাছগুলোকে চাটাই -এর উপর বিছিয়ে দেয়া হয় এবং একটি কাঠি দ্বারা কয়েক ঘণ্টা পর পর মাছগুলো নাড়াচাড়া করে উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেয়া হয়। এতে মাছ শুকাতে সাধারণত কম সময় লাগে। ভালো আবহাওয়া থাকলে এ পদ্ধতিতে সাধারণত ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে মাছ শুঁটকিকরণ সম্পন্ন হয়।

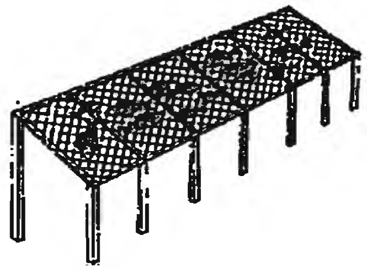

চিত্র-১৮ : বাঁশের মাচার উপর ছোট মাছ শুঁটকিকরণের দৃশ্য।

বড় মাছ শুটকীকরণ পদ্ধতি : আমাদের দেশে যে সকল বড় মাছ শুটকী করা হয় সেগুলো হলো- শোল, গজার, বোয়াল, টাকি, ছুরি, লইট্যা, রূপচাঁদা ইত্যাদি। এ জাতীয় মাছ শুঁটকিকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে মাছকে ধোয়া হয়। ধোয়ার পর মাছকে মাথা থেকে লেজের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর এমনভাবে কাটা হয় যেন লেজের কাছে সামান্য অংশ লেগে থাকে, যা মাছকে শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এভাবে কাটা প্রত্যেকটি মাছকে ছুরি দিয়ে মাঝ বরাবর ২/৩ বার কাটা হয় যা মাছকে দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে। ফালি করার পর মাছকে বাঁশের মাচার উপর চাটাইয়ে বিছিয়ে দেয়া হয় অথবা দু'দিকে দুটি বাঁশের লাঠির সাথে রশিতে ঝুলিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণকালে প্রথম তিন দিনে মাছ থেকে অধিকাংশ পানি শুকিয়ে যায়। তবে আবহাওয়া, মাছের আকার, পুরুত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে মাছ শুকাতে ৭-৮ দিন সময় লাগে। সাধারণত শুঁটকি মাছে জলীয় অংশের পরিমাণ ১০-২০% থাকে।

বর্তমানে আমাদের দেশে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় কিছু কিছু মাছ, যেমন- পোয়া, ফাঁসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে লবণ ব্যবহার করার পর শুঁটকি করা হয়। এক্ষেত্রে মাছের নাড়িভুঁড়ি ও ফুলকা কেটে ফেলার পর মাছকে ৬ ভাগ পানি ও ১ ভাগ লবণ দ্রবণে ১২-১৮ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা হয়। লবণ দেয়ার পর মাছ শুঁটকি করলে মাছি, পোকামাকড়, মাইটস ইত্যাদি সহজে মাছকে আক্রমণ করতে পারে না। লবণ সহযোগে পানি নিষ্কাশিত করে মাছকে শুকানো হয় বলে এ মাছকে 'সল্টেড ডিহাইড্রেটেড' বলা হয়। এই পদ্ধতিতে শুকানো মাছে সাধারণত ৩৫-৪০ ভাগ জলীয় অংশ থাকে।

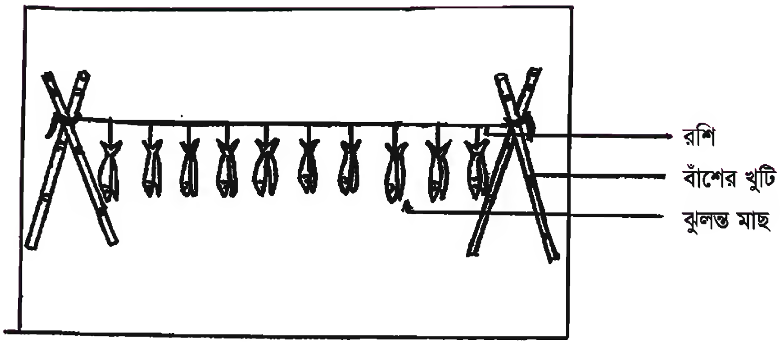

চিত্র-১৯ : রশিতে ঝুলিয়ে বড় মাছ শুকানোর দৃশ্য।

রৌদ্রে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ এবং তার প্রতিকার

সুবিধাসমুহ

- এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণে খরচ কম হয়।
- রৌদ্রে শুকিয়ে শুঁটকিকরণের ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে যায় বলে প্রয়োজনীয় পানির অভাবে অণুজীবসমূহ জন্মাতে বা বৃদ্ধি পেতে পারে না।
- এ পদ্ধতিতে যেকোনো ঋতুতে সূর্যালোকের সাহায্যে মাছ শুঁটকিকরণ করা যায়।

অসুবিধাসমূহ

- সূর্যালোকের সাহায্যে মাছ শুঁটকিকরণ সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল, তাই বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হলে মাছ শুকাতে বেশি সময় লাগবে।
- শুকানোর পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কটু গন্ধের কারণে ক্রেতার নিকট শুঁটকি গ্রহণযোগ্য হয় না।
- যেহেতু মাছকে একেবারে খোলা জায়গায় শুকানো হয় তাই বিভিন্ন ধরণের মাছি, পোকামাকড় শুঁটকিতে ডিম পাড়ে যা পরবর্তীতে গুদামজাতকরণের সময় পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয় এবং শুঁটকির ক্ষতি করে, ও
- বাজারের অবিক্রীত পচা মাছ দ্বারা অনেক সময় শুঁটকি করা হয় বলে শুঁটকির গুণগতমানের মারাত্মক অবনতি ঘটে।

অসুবিধা দূর করার উপায়সমূহ

- শুঁটকি তৈরির সময় অবশ্যই টাটকা মাছ ব্যবহার করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বাসি বা পচা মাছ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- শুঁটকি তৈরির সময় সর্বদা স্বাস্থ্যসম্মত বিধি অনুসরণ করা উচিত। ব্যবহার্য সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে ও পরে ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত। এতে ক্লোরিন পানি ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- শুঁটকি করার সময় মাছকে মাছি ও পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বচ্ছ পলিথিন বা জাল দিয়ে ঢেকে শুকানো উচিত।

- শুকানোর সময় কীটপতঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ রোধ করার জন্য সোলার টেন্ট ড্রায়ার ব্যবহার করা উচিত। এটা মাছ শুকানোর মাত্রাকেও ত্বরান্বিত করে।
- মাছ শুকানোর পূর্বে লবণ দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে নিলে শুকানোর সময় মাছি ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়, ও
- গুদামজাতকালে শুঁটকির জারণ ক্রিয়া রোধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. পলিথিন তাঁবু বা সোলারটেন্ট ড্রায়ার (Solartent dryer) ব্যবহার করে মাছ শুঁটকীকরণ : এটিও সূর্যালোকে মাছ শুঁটকিকরণের একটি আধুনিক এবং উন্নত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত পলিথিন তাঁবুর কোন আদর্শ মাপ বা নকশা নেই। এটা শুধুমাত্র প্রথাগত মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতির উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হয়। পলিথিন তাঁবু তৈরির জন্য পুরো পলিথিন দিয়ে বাঁশের কাঠামোর উপর দুই-চাল বিশিষ্ট ঘর তৈরি করা হয় যা দেখতে ছোট কুঁড়েঘরের মতো। ঘরের পিছন দিকে এবং মেঝেতে কালো পলিথিন থাকে এবং সূর্যের দিকে মুখ করে স্বচ্ছ পলিথিন থাকে যার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ঐ তাঁবুতে ঢোকে এবং পিছনের কালো পর্দায় সূর্যরশ্মি শোষিত এবং বিকিরিত হয় ফলে ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। উপরের দিকে একাধিক ছিদ্র থাকে যে পথে জলীয় বাষ্প বের হয়ে যেতে পারে। এছাড়া নিচের দিকে এক পাশে ছিদ্র রাখা হয় যে পথে বাতাস প্রবেশ করে। মাছকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য পলিথিন তাঁবুর ভিতর অনুভূমিকভাবে স্থাপিত বাঁশের তাক থাকে। সূর্যের আলোর তাপে পলিথিন তাঁবুর মধ্যে তাকের উপর রক্ষিত মাছ থেকে পানি জলীয় বাষ্পাকারে উপরের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে তাপমাত্রা সাধারণত সূর্যের আলোর তাপমাত্রা থেকে অনেক বেশি। ফলে এই পদ্ধতিতে মাছ শুঁটকি করতে সাধারণত ৩-৫ দিন সময় লাগে, অন্যদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে শুঁটকি করতে ৭-৮ দিন সময় লাগে।

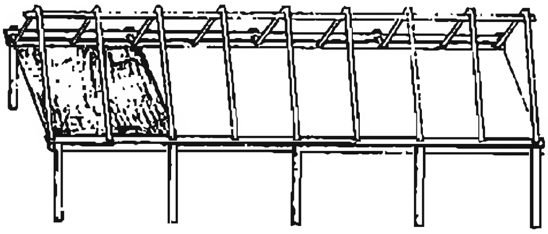

চিত্র-২০ : সোলার টেন্ট ড্রায়ার।

গ. নিরুদীকরণের (Dehydration) মাধ্যমে মাছ শুঁটকিকরণ : নিরুদীকরণ বা ডিহাইড্রেশান বলতে নিয়ন্ত্রিত ও কৃত্রিম উপায়ে শুঁটকিকরণের যেকোনো পদ্ধতিকে বুঝায়। এই পদ্ধতিতে উন্নত মানের শুঁটকি তৈরি করা হয়। যা গন্ধ, রং এবং পুষ্টিমানের দিক থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত শুঁটকির চেয়ে উন্নত। নিরুদীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মাছে বিদ্যমান পানিকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা হয়। এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো, এতে ধুলাবালি, পোকামাকড়, পাখি, অণুজীব ইত্যাদির আক্রমণ কমানো যায়। মাছকে নিরুদীকরণ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ড্রায়ার ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে নিচে লিখিতগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

- কেবিনেট ড্রায়ার (Cabinet dryer)
- টানেল ড্রায়ার (Tunnel dryer)
- উষ্ণ বায়বীয় ট্রে শুষ্ককরণ ড্রায়ার (Warm air tray dryer)
- ভ্যাকুয়াম ড্রায়ার (Vaccum dryer)

ঘ. সিঁদল বা চেপা শুঁটকি : আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলসমূহে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে সিঁদল শুঁটকি বা চেপা শুঁটকি অতি পরিচিত খাদ্য উপকরণ। প্রধানত সিঁদলের গুণগত দিকটার কথা বিবেচনা করে এর স্বাদ ও গন্ধ বেশির ভাগ লোকের কাছেই আকর্ষণীয়। সনাতন পদ্ধতিতে প্রস্তুত সিঁদলের যথেষ্ট খাদ্যমান রয়েছে। নিচে এ পদ্ধতিতে শুঁটকিকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

সনাতন পদ্ধতিতে সিঁদল শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীত মৌসুমে পুঁটি জাতীয় মাছকে সংগ্রহ করে এদের নাড়িভুঁড়ি, আঁইশ ফেলে দিয়ে খোলা আকাশের নিচে রোদে শুকিয়ে মাটির কলসে আবদ্ধ অবস্থায় তিন মাস রাখা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সিঁদল ফারমেন্টেড প্রডাক্টস ফিশপেস্টের আওতায় পড়ে।

আধুনিক পদ্ধতি সিঁদল শুঁটকিকরণ

১. আধুনিক পদ্ধতিতে সিঁদল শুঁটকিকরণের ক্ষেত্রে মাছ সংগ্রহের পর প্রথমে মাছগুলোকে একবার পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে মাত্র তিন মিনিটের জন্য ১০ শতাংশ লবণের পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ফলে মাছের আঁইশ বা দেহের বিভিন্ন অংশে যেসব ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষতিকর পরজীবীসমূহ থাকে তা মারা যাবে।

২. পরবর্তী ধাপে মাছ প্রক্রিয়াজাতকণের পর মাছগুলোকে একাধিকবার টিউবওয়েলের বা পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে রোদে দেয়া হয়। এতে কাটা মাছের দেহ থেকে রক্ত বা অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ ভালোভাবে ধুয়ে যাবে।

৩. তৃতীয় ধাপে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ সরাসারি খোলা আকাশের নিচে চাটাই বা বালির উপর শুকানোর পরিবর্তে বিশেষ সান ড্রায়ারের মাধ্যমে শুকানো হয়। ফলে পোকা মাকড় বা মাছির উপদ্রব হতে পারে না।

৪. পরবর্তীতে শুকানো মাছগুলো মাটির কলসি বা মটকির মধ্যে স্তরে স্তরে সাজিয়ে কলসটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় তিন মাস মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে কলসের মুখ দিয়ে যেন কোনো ক্রমেই বায়ু ঢুকতে না পারে। মাটির কলসে মাছ ভরার পূর্বে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

ক. মাটির কলসী বা মটকি ভালোভাবে পরিষ্কার করে ৩-৪ দিন রোদে শুকাতে হবে।

খ. কলসি রোদে শুকানোর পর ৪-৫ দিন যাবৎ ভালোভাবে মাছের তেল মাখিয়ে রোদে দিতে হবে। যখন দেখা যাবে কলসি আর তেল শোষণ করছে না তখন বুঝতে হবে কলসিতে মাছ ভরার উপযুক্ত সময় হয়েছে। সাধারণত একটি নতুন কলসি ৭৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পরিমাণ এবং পুরনো কলসি ৫০০ গ্রাম থেকে ৭৫০ গ্রাম তেল শোষণ করতে পারে।

গ. মাছ কলসিতে ভরার পূর্বে শুকানো মাছগুলোকে ৩-৫ রাত কুয়াশায় ভিজাতে হবে। এতে শুকানো মাছ কুয়াশা থেকে প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করতে পারবে এবং মাছের রং চকচকে সুন্দর ও তৈলাক্ত হবে। কুয়াশায় ভিজা মাছকে বস্তায় ভরে ৫/৭ দিন ঘরের ভিতরে রাখতে হবে।

ঘ. জাগকৃত মাছ কলসিতে ভরার পূর্বেই কলসিটি মাটির মধ্যে এমনভাবে পুঁততে হবে যাতে কলসি ও মাটির মধ্যে কোনো রকম ফাঁক না থাকে। অতঃপর জাগকৃত মাছ অল্প অল্প করে কলসির মধ্যে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে কলসির মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকে। এক্ষেত্রে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে পা মুড়িয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিতে হবে। এমনিভাবে কলসির গলা পর্যন্ত মাছ ভরতে হবে এবং পরে মাছের গুঁড়া দিয়ে কলসির মুখ বন্ধ করে উপরে পলিথিনের পেপার বা পলিথিনের পেপারের উপর মাটি দিয়ে মুখ বদ্ধ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কলসির ভিতরে কোনো রকম বাতাস ঢুকতে না পারে।

ঙ. এভাবে মাছভর্তি কলসি মাটির মধ্যে ৯০ দিন রাখার পর ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় চেপা বা সিঁদল শুঁটকিতে পরিণত হবে এবং তা বাজাজাতকরণের উপযুক্ত হবে।

শুঁটকি মাছের পুষ্টিমান : শুঁটকি তৈরিতে ব্যবহৃত মাছের গুণাগুণের উপর শুঁটকি মাছের পুষ্টিমান নির্ভর করে। শুঁটকি তৈরিতে ব্যবহৃত মাছ যদি পচা বা নষ্ট হয় তাহলে শুঁটকির গুণগতমান খারাপ হবে। সম ওজনের কাঁচা মাছের চেয়ে শুঁটকির পুষ্টিমান অনেক বেশি। কারণ মাছ শুকানোর ফলে মাছ থেকে পানি বের হয়ে যায়। কিন্তু পুষ্টি উপাদান বের হয় না বলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত শুঁটকি মাছে ৬০-৮০% প্রোটিন, ৮-২০% তৈল এবং ১০-২০% পানি বিদ্যমান থাকে।

শুঁটকি মাছ সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ : মাছ শুঁটকি করার পর তার গুণাগুণ কেমন থাকবে তা নির্ভর করে সঠিকভাবে শুঁটকি গুদামজাতকরণের ওপর। শুঁটকি মাছ গুদামজাতকরণের সময় ছিদ্রহীন পলিথিন ব্যাগে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া টিনের পাত্রেও শুঁটকি মাছ মজুদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে টিন যেন বায়ু নিরোধক হয়। শুঁটকি মাছ চটের বস্তায়ও মজুদ করা যায়। শুঁটকির বস্তাগুলোও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে। এভাবে সঠিক পদ্ধতিতে গুদামজাত করে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো রাখা যায়। যেসব শুঁটকি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয় সেগুলোকে প্রথমে ছোট পলিথিনে মুড়ে, পরে ছোট পলিথিনগুলোকে বড় পলিথিনের ভিতর রেখে পলিথিনের মুখ বন্ধ করে প্যাকেটটি করোগেটেড কাগজের তৈরি মাস্টার কার্টনের মধ্যে রাখা হয় পরে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

৩. টিনজাত, লবণায়ন এবং ধূমায়িত প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ

টিনজাতকরণ বা ক্যানিং : টিনজাতকরণ বা ক্যানিং খাদ্য সংরক্ষণের একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। উন্নত দেশে বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশে মাছ সংরক্ষণে টিনজাতকরণ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মাছ টিনজাতকরণ হলো সংরক্ষণের এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় মাছকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ বলতে বুঝায়, ততটুকু জীবাণুমুক্তকরণ যার ফলে সব ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মারা যায় বা ধ্বংস হয়। টিনজাতকরণ বা ক্যানিং -এর উদ্দেশ্য হলো কোনো খাদ্যদ্রব্যকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গুদামজাত করা যাতে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ঐ খাদ্যদ্রব্য রুচিকর ও খাওয়ার উপযোগী থাকে। এই পদ্ধতিতে মাছকে অতি উচ্চ তাপে বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ করা হয় বলে মাছের নিজস্ব এনজাইম এবং ব্যাকটেরিয়া মাছকে পচাতে পারে না। ফলে মাছ দীর্ঘদিন সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। টিনজাতকৃত মাছের গুণগতমান ২-৫ বছর পর্যন্ত ভাল থাকে।

টিনজাতকরণ পদ্ধতি : টিনজাতকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নিম্নলিখিত ধাপসমূহ সম্পন্ন করার মাধ্যমে মাছ টিনজাত করা হয়।

ক. কাঁচামাল নির্বাচন : প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত মাছ যত ভালো হবে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য তত ভালো হবে। বড়, মাংসল এবং চর্বিযুক্ত টাটকা মাছ টিনজাতকরণের জন্য বেশি উপযোগী। টিনজাতকরণের পূর্বে মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি, মাথা ইত্যাদি অপসারণের পর মাছকে টুকরা টুকরা করা হয়। বড় মাছের ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড ফেলে দেয়া হয়। কাটা মাছকে ক্লোরিনযুক্ত পানি দ্বারা ধোয়া হয়। ফলে অণুজীবের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং রক্ত ও অন্যান্য ময়লা দূরীভূত হয়। বড় মাছ, যেমন- টুনা মাছের ক্ষেত্রে টিনে ভরার পূর্বে মাছের টুকরাগুলোকে সিদ্ধ করা হয়। এতে মাছ থেকে কিছুটা পানি ও তেল বের হয়ে যায় এবং মাংসপেশি নরম হয়।

খ. টিন বা কৌটা ভর্তিকরণ : কৌটা হিসেবে টিনের পাত্রের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম বা কাচের পাত্র ব্যবহৃত হয়। কৌটাকে হাত দ্বারা বা মেশিনের সাহায্যে পূর্ণ করা হয়। যন্ত্রের চেয়ে হাত দ্বারা কৌটা ভর্তি করলে ভালো হয়। তবে হাত দ্বারা কৌটা ভর্তি শ্রমসাধ্য। খুব সতর্কতার সাথে কৌটার মধ্যে মাছ পূর্ণ করা উচিত যেন কৌটায় কোনো খালি জায়গা না থাকে। সাধারণত কৌটার উপরিভাগে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা জায়গা রাখা হয় যাতে পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় গ্যাস উৎপন্ন হলে ঐ ফাঁকা জায়গায় জমা হয়। সাধারণত নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা এই ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করা হয়।

গ. বিভিন্ন উপাদান সংযোজন : সাধারণত খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বৃদ্ধির জন্য মাছের উপরিভাগে বিভিন্ন ধরণের উপাদান যোগ করা হয়। যেমন- লবণ দ্রবণ, গ্লুটামেট, তেল, টমেটো সস, বিভিন্ন ধরনের মসলা ইত্যাদি।

ঘ. বায়ুশূণ্যকরণ ও কৌটাবদ্ধকরণ : কৌটার স্ফীতি, জারন এবং টিনের ক্ষয়রোধ করার জন্য কৌটাকে বায়ুশূন্যকরণ আবশ্যক। কৌটাকে বায়ুশূন্য ও বদ্ধকরণ একই সাথে করা হয়। সাধারণত দুইভাবে বায়ুশূন্য ও বন্ধ করা হয়।

i) কৌটাস্থিত দ্রব্যকে উত্তপ্ত করে এবং ii) যান্ত্রিকভাবে।

ঙ. ধৌতকরণ : বদ্ধকৃত কৌটার গায়ে লেগে থাকা ময়লা অপসারণ করার জন্য কৌটা ধৌতকরণ আবশ্যক। সোডিয়াম ফসফেট (১-১.৫%) মিশ্রিত গরম পানির (৮০ ডিগ্রী সে.) মধ্য দিয়ে কৌটাগুলোকে অতিক্রম করার মাধ্যমে ধৌত করা হয়।

চ. প্রক্রিয়াকরণ ও উত্তপ্তকরণ : তাপ প্রয়োগ এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৌটার খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করা। উচ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কৌটাস্থিত খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। স্টিলের নেটের তৈরি ট্রে-এর উপর কৌটাগুলো রাখা হয়। এখানে আর্দ্র তাপের মাধ্যমে তাপ প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে সব ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য ১৫ পাউন্ড/ইঞ্চি চাপে ১২০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ৪ মিনিট অথবা ১১৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ১০ মিনিট কৌটাগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। তবে কত সময় ধরে তাপ দিতে হবে তা কৌটার আকার ও মাছের টুকরার পুরুত্বের উপর নির্ভর করে। সাধারণত ৩০ মিনিট তাপ দিতে হয়। অধিক সময় ধরে তাপ দিলে মাছের টুকরাগুলো কুঁচকে যেতে পারে অথবা কৌটার গায়ে লেগে থাকা টুকরার অংশ পুড়ে যেতে পারে।

ছ. ঠাণ্ডাকরণ : তাপ প্রয়োগের সময় কোনো কোনো উপাদানের দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় যা রোধ করার জন্য দ্রুত ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। ঠাণ্ডা বায়ু বা ঠাণ্ডা পানি প্রবাহ দ্বারা ঠাণ্ডাকরণ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে পানিই উত্তম।

জ. লেবেলিং : ঠাণ্ডা করার পর কৌটাতে লেবেল লাগানো হয়। লেবেলিং অবশ্যই খাদ্য আইন অনুসারে করা উচিত। টিনজাত দ্রব্যকে সঠিকভাবে এবং সহজেই চেনার জন্য কৌটা লেবেলিং করা হয়। কৌটার লেবেলে নিচে লিখিত বিষয় গুলো উল্লেখ থাকা উচিত।

(i) দ্রব্যের নাম
(ii) কোড নম্বর
(iii) দ্রব্যের গুণাগুণ
(iv) কৌটাজাতকরণের তারিখ
(v) দ্রব্যের পরিমাণ
(vi) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
(vii) কৌটার আকার
(viii) ব্যবহারের নিয়ম
(ix) কোম্পানির নাম

ঝ. গুদামজাতকরণ : কৌটাজাতকরণের পর পরই তাৎক্ষণিকভাবে তা বাজারজাত করা উচিত নয়। বেশ কিছু দিন মজুদ করে রাখা উচিত। সংযুক্ত দানাদার লবণ এবং অন্যান্য উপাদান মাছে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত স্বাদ এবং গন্ধের উন্নয়নের জন্য কৌটাকে কিছু দিন মজুদ করা উচিত। সাধারণত সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ২-৩ সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করা উচিত। নিম্ন তাপমাত্রায় (১০-১৫xসে.) মজুদ করলে দ্রব্যের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

লবণায়নের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ

লবণজাত প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ একটি সহজ এবং দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। এ পদ্ধতি চর্বিযুক্ত মাছ, যেমন- ইলিশ সংরক্ষণ করার জন্য খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে ভরা মৌসুমে যখন প্রচুর পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়ে তখন দাম খুব কমে যায়। এ সময় লবণায়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করা যায়। লবণায়নের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতিতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছের দেহে লবণ প্রবেশ করানো হয়। ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে আসে। পানি বের হয়ে আসে বিধায় মাছে লবণের ঘনত্ব বেড়ে যায় যা অণুজীবের জন্ম এবং বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে মাছ সংরক্ষিত হয়। লবণায়নের ফলে মাছের দেহের গঠনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এবং আকর্ষণীয় গন্ধের সৃষ্টি হয়। এভাবে সংরক্ষিত মাছ তাজা মাছের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

লবণায়নের প্রকারভেদ : লবণায়ন পদ্ধতিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. শুষ্ক লবণায়ন : এই পদ্ধতিতে মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি অপসারণ করে ধোয়ার পর দানাদার লবণ মাছের দেহে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেয়া হয়। এর প্রভাবে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছের দেহ থেকে পানি নির্গত হয়ে একটি শুষ্ক লবণ দ্রবণে পরিণত হয় এবং ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দ্রবণ হতে লবণ মাছের দেহে প্রবেশ করতে থাকে, আর দেহ থেকে পানি বের হতে থাকে। একটা সাম্যাবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ চলতে থাকে। মাছকে শুষ্ক লবণায়ন করার পর কাঠের বা বাঁশের মাচায় বিছিয়ে মাদুর বা চট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। মাছ ছোট আকারের হলে টুকরা করার প্রয়োজন হয় না। তবে বড় আকারের হলে অবশ্যই পাতলা ফালি বা ছোট টুকরা করতে হয়। ৭-১০ দিনের মধ্যে মাছ পরিপক্ব হয় বা মাছের লবণায়ন প্রক্রিয়া শেষ হয়। বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে প্রধানত ইলিশ মাছ লবণায়ন করা হয়।

সুবিধা

- লবণ ব্যাকটেরিয়ার জন্ম ও বৃদ্ধি প্রতিহত করে;
- লবণের পানিগ্রাহী গুণের কারণে মাছের কোষ হতে সরাসরি পানি শোষণ করে। ফলে মাছকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

অসুবিধা

- উৎপাদিত পণ্যে লবণের পরিমাণ খুব বেশি হয়।
- মাছের দেহে লবণ সমভাবে মিশতে পারে না। ফলে সংরক্ষণ ভালো হয় না।
- মাছের শারীরিক গঠন নষ্ট হয়, কুঁচকে যায় এবং রঙের পরিবর্তন ঘটে।
- নির্গত পানি পরিবেশ দূষিত করে।

২. আর্দ্র লবণায়ন : এই পদ্ধতিতে মাছকে তাৎক্ষণিকভাবে ধৌত করে আঁইশ, পাখনা ও নাড়িভুঁড়ি ছাড়ানোর পর সুবিধামতো টুকরা করে পূর্বে তৈরিকৃত লবণ দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। মাছকে কতক্ষণ লবণ দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হবে তা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণয় করা হয়। মাছের দেহে লবণ প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে পানি বেরিয়ে আসে। ফলে লবণ দ্রবণের ঘনত্ব কমে যায়। এজন্য দ্রবণের ঘনত্ব সমান রাখার জন্য লবণ দ্রবণে বার বার লবণ যোগ করতে হয়।

সুবিধা

- মাছের দেহের সর্বত্র সমানভাবে লবণ ঢোকে;
- দৈহিক আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ মাছের দেহ কুঁচকে যায় না।

অসুবিধা

- মাছের টুকরা লবণ দ্রবণে ভেসে ওঠে বলে বাতাসের সংস্পর্শে এসে চর্বির জারণ ঘটে পণ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়।
- প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাত্র খোলা যায় না। তাই পরিপক্বতার মাত্রা বুঝা যায় না,
- মাছের দেহ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি বের হয়ে লবণ দ্রবণের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়।

৩. মিশ্র লবণায়ন : এটা এমন একটা পদ্ধতি যেখানে মাছকে শুষ্ক লবণ ও লবণ দ্রবণের সাহায্যে একত্রে লবণ-জাতকরণ করা হয়। এটা আর্দ্র লবণায়ন অপেক্ষা ভালো পদ্ধতি। মাছের আঁইশ, পাখনা, ও নাড়িভুঁড়ি ছাড়ানোর পর টুকরা করে শুকনো লবণ ভালোভাবে ঘষে ঘষে মাছের দেহে লাগানো হয়। অতঃপর টুকরোগুলো লবণ দ্রবণে ডুবিয়ে দেয়া হয়। শুষ্ক লবণ লাগানোর ফলে মাছের দেহ হতে পূর্বেই পানি বের হয়ে যায়। ফলে মাছের দেহের পানি লবণ দ্রবণকে পাতলা করতে পারে না।

সুবিধা

- পূর্বেই শুষ্ক লবণায়ন করার ফলে মাছের দেহ নিঃসৃত পানি দ্বারা লবণ দ্রবণ পাতলা হতে পারে না।
- মাছের শারীরিক গঠনে তেমন কোন পরিবর্তন হয় না।
- মাছের দেহের সর্বত্র সমানভাবে লবণ প্রবেশ করে।

অসুবিধা

- এ ক্ষেত্রেও মাছের টুকরা লবণ দ্রবণে ভেসে ওঠে চর্বির জারণ ঘটায়।

লবণায়িত মাছের পরিপক্বতা (Ripening) : লবণায়িত মাছের পরিপক্বতা হচ্ছে পণ্যের গঠন, বর্ণ ও গন্ধের একটি বিশেষ অবস্থা যা গুণাগুণের পরিপূর্ণতা নির্দেশ করে। মাছের দেহ কলায় বিভিন্ন রাসায়নিক এবং ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এই পরিপক্বতা অর্জিত হয়। এসব পরিবর্তন সাধারণত দেহস্থিত পাচক রস ও ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক নিঃসৃত পাচকরস দ্বারা ঘটে থাকে যা আমিষ ও চর্বিকে ভেঙে ফেলে। ফলে কিছু পরিমাণ অ-নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ মাছের দেহ হতে ব্যাপিত হয়ে বাইরের লবণ দ্রবণে চলে আসে। লবণজাত পণ্যে এগুলোর পরিমাণ কমলে পণ্যের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও টেকচারের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয়। মাছের পরিপক্বতার হার নিচে লিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে।

- মাছের রাসায়নিক গঠন;
- লবণের সংযুক্তির ওপর;

- তাপমাত্রা;
- মাছের দেহ কলায় লবণের পরিমাণ;
- নাড়িভুঁড়ির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।

লবণায়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ : আমাদের দেশে শুষ্ক লবণায়নের মাধ্যমে বেশির ভাগ ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করা হয়। ইলিশ মাছ অধিক চর্বিযুক্ত মাছ। তাই একে শুঁটকিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় না। বরফায়ন যেহেতু একটি স্বল্প মেয়াদি সংরক্ষণ পদ্ধতি তাই এই পদ্ধতিতে ইলিশ মাছকে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। অন্য দিকে হিমায়ন একটি ব্যয় বহুল পদ্ধতি যার ব্যবহার আমাদের দেশের জন্য উপযোগী নয়। ভরা মৌসুমে যখন প্রচুর পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়ে তখন দাম খুবই কমে যায় এবং মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সময় লবণায়নের মাধ্যমে জেলেরা বেশির ভাগ ইলিশ সংরক্ষণ করে থাকে।

সংরক্ষণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রথমে মাছের আঁইশ, পাখনা, ফুলকা, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দেয়া হয়। প্রায়শই কাটা মাছকে পানি দিয়ে ধৌত করা হয় না। মাথার পিছনে ঘাড়ের দিকের ত্রিকোণাকার ছোট একটি টুকরা কেটে ফেলা হয়। ফলে মাছের দেহে লবণ দিতে ও মাছ বাঁকা ও চন্দ্রাকৃতি করে বিছিয়ে দিতে সুবিধা হয়। এরপর মাছকে বটিতে ফেলে পৃষ্ঠদেশ থেকে অঙ্কীয় দিকে প্রস্থ বরাবর আড়াআড়িভাবে কাটা হয় যেন মাছ অংকীয় দেশে লেগে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো এলাকায় অঙ্কীয় দেশ থেকে পৃষ্ঠ দিকে কাটা হয়। মাছের ওজনের এক-চতুর্থাংশ লবণ দ্বারা সারা গায়ে এবং চোখ, ফুলকা, উদর-গহবর ও টুকরার ভাঁজে ভাঁজে ঘষে ঘষে লাগানো হয়। অতপর লবণজাত মাছকে একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্রে রাখা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়। মাছ রাখার আগে ঝুড়ির ভিতর চতুর্পার্শ্বে লবণ ছিটিয়ে দেয়া হয় যাতে ঝুড়িতে থাকা সব ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। এবার ইলিশ মাছ একটি একটি করে এমনভাবে রাখা হয় যেন মাছের অঙ্কীয় দেশ উপরের দিকে থাকে। অঙ্কীয় দেশে (পেটের মাংশপেশিতে) মজুদ চর্বি নির্গত পানির সাথে বের হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য এরূপ করা হয়ে থাকে। সবশেষে হোগলা, চট বা মাদুর দিয়ে ঝুড়িকে ঢেকে দেয়া হয়।

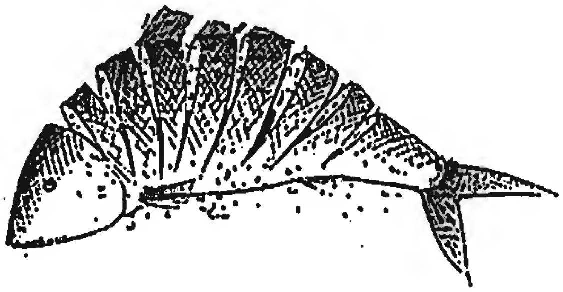
চিত্র-২১ : লবণায়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ

প্রচলিত পদ্ধতিতে ইলিশ মাছে লবণ প্রয়োগের জন্য কোনো আদর্শ অনুপাত অনুসরণ করা হয় না। অঞ্চলভেদে ও মাছের আকারের উপর ভিত্তি করে এই অনুপাত পরিবর্তিত হয় যা অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাধারণত মাছ ও লবণের অনুপাত ৪ : ১ হয়ে থাকে। লবণ মাছের দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ হতে পানি বের হয়ে আসে এবং একটি সাম্যাবস্থায় না আসা পর্যন্ত এটি অব্যাহত থাকে। আকৃতিভেদে ১০-১২ দিনের মধ্যে মাছের পরিপক্বতা আসে। এ সময় লবণায়িত মাছ উজ্জ্বল বর্ণ ও সুন্দর গন্ধ লাভ করে। পরিপক্ব লবণায়িত মাছকে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় শুকনো ও শীতল স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

লবণায়নের সুবিধা

- ইলিশ চর্বিযুক্ত মাছ। তাই রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ সম্ভব নয়। লবণায়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ সম্ভব;
- এই পদ্ধতি সহজ এবং জেলেদের নিকট প্রচলিত;
- এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মাছের পুষ্টিমানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

অসুবিধা

- অনেক সময় এই পদ্ধতিতে মাছ ও লবণের অনুপাত ঠিক রাখা হয় না ফলে কাঙ্ক্ষিত গুণগতমান বজায় রাখা যায় না;
- লবণায়নের পর যদি মাছ খোলা অবস্থায় রাখা হয় তখন মাছের চর্বি বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জারণের ফলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদের গুণগতমান খারাপ হওয়ার ফলে চাহিদা কমে যায়।

ধূমায়িত প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ : ধূমায়ন মাছ সংরক্ষণের এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোঁয়ার তাপমাত্রা ও ধোঁয়া কণার যৌথ ক্রিয়ায় মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়। বর্তমানে মাছের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে সংরক্ষণ কাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার সীমিত।

ধূমায়ন প্রক্রিয়া

ধূমায়িত মাছের গুণাগুণ নির্ভর করে কাঁচামালের জৈবিক গুণাগুণ এবং মাছের টাটকা অবস্থার ওপর। পরিপক্ব এবং চর্বিযুক্ত মাছ ধূমায়নের জন্য খুবই উপযোগী। স্ত্রী মাছে বেশি চর্বি থাকে বলে পুরুষ মাছের চেয়ে স্ত্রী মাছ ধূমায়নের জন্য বেশি উপযোগী। ধূমায়নের জন্য সাধারণত ছোট মাছ কাটতে হয় না। কিন্তু বড় মাছের ক্ষেত্রে মাছকে মেরুদণ্ড বরাবর লেজ পর্যন্ত কেটে কেটে ফিলেট তৈরি করা হয়। এতে ধূম্রকণাগুলো মাছের পেশিতে সহজে জমতে পারে। ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ডের বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার জন্য মাছকে ৬০-৭০% লবণ দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে মাছের পেশিতে ২-৩% লবণ প্রবেশ করে। মাছকে ধূমায়নের জন্য সাধারণত কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। কাঠের গুঁড়ায় প্রায় ১৫% পানি থাকে তাই কাঠের গুঁড়া মোল্ড দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। এজন্য লবণায়িত মাছকে কাঠের গুঁড়া থেকে দূরে রাখতে হবে।

বাণিজ্যিকভাবে ধূমায়নের জন্য চিমনি ব্যবহার করা হয়। কাটা মাছগুলোকে কাঠের প্লেটে সংযুক্ত হুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। চিমনির মেঝেতে কাঠের গুঁড়া পুড়িয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করা হয়, উৎপন্ন ধোঁয়া ফিলেটের গায়ে জমা হয়। চিমনির বহির্গমন পথ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় ঘরের মধ্যে ধোঁয়া অনবরত জমা হয় এবং ঘুরতে থাকে। এ অবস্থায় চিমনি ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং মাছ ধূমায়িত হয়। সাধারণত এই কাজ সারা রাতব্যাপী করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রার কারণে মাছের দেহ থেকে বিন্দু বিন্দু পানি বেরিয়ে আসে ফলে মাছের দেহে পানির পরিমাণ কমে যায়। চিমনি ঘর থেকে মাছ বের করার পর প্যাকিং করার পূর্বেই মাছ ঠাণ্ডা করে নেয়া হয়। গরম অবস্থায় প্যাকিং করলে প্যাকেটের ভিতর পানি জমে মোল্ড জন্মাতে পারে। ধূমায়িত মাছ সাধারণত কাঠের বাক্সে প্যাকিং করা হয়। অনেক সময় ধূমায়িত মাছকে রেফ্রিজারেটর বা ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। ধূমায়িত মাছের সংরক্ষণকাল ২ থেকে ৩ সপ্তাহ।

৪. হিমায়নের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ : হিমায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খুব নিম্ন তাপমাত্রা ব্যবহার করে মাছের দেহের সব পানিকে বরফে পরিণত করে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। হিমায়ন অণুজীবের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে এবং মাছের দেহের ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। ফলে মাছের গুণগতমান সংরক্ষিত হয়। মাছের দেহ কোষের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে; শূন্য ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় তা বরফে পরিণত হয় না এবং -১ ডিগ্রী সে. থেকে -৪০° ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হয়। মাছের দেহের প্রায় ৯০% পানি 'মুক্ত' (free) এবং ১০% আবদ্ধ (bound) অবস্থায় থাকে। মুক্ত পানি সহজে বরফে পরিণত হলেও আবদ্ধ পানিকে বরফে পরিণত করতে অত্যধিক কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। -৫০°সে. তাপমাত্রায়

যদিও বিশুদ্ধ পানি সম্পূর্ণরূপে বরফে পরিণত হয় তবে এই তাপমাত্রায় মাছের দেহের ২০% পানি তখনও বরফে পরিণত হয় না। তাই মাছকে সম্পূর্ণভাবে হিমায়িত করতে -৪০°সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন।

হিমায়ন : হিমায়ন একটি সংরক্ষণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাছের দেহের তাপ অপসারণের ফলে দেহস্থিত পানি সম্পূর্ণভাবে বরফে পরিণত হয়। সাধারণত -৪০°সে. তাপমাত্রায় মাছকে হিমায়িত করা হয়। হিমায়িতকরণে প্রয়োজনীয় সময়ের ওপর ভিত্তি করে হিমায়ন দু'ধরনের হতে পারে। ধীর হিমায়ন ও দ্রুত হিমায়ন। মাছের দেহের তাপমাত্রা ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রায় (০°সে. থেকে -৫°সে.) পৌঁছতে যদি ৩০ মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় লাগে তাহলে তাকে দ্রুত হিমায়ন এবং যদি তার চেয়ে বেশি সময় লাগে তাকে ধীর হিমায়ন বলে। দ্রুত হিমায়ন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মাছের গুণগতমান ধীর গতিতে হিমায়নের চেয়ে ভালো থাকে।

দ্রুত হিমায়ন পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

১. এই পদ্ধতিতে মাছের দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্ট বরফ ছোট ছোট কণায় পরিণত হয় বলে পেশিকলায় যান্ত্রিক ক্ষতি হয় না বা হলেও কম হয়।
২. যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় কম সময়ে দেহের অভ্যন্তরের পানি বরফে পরিণত হয় সেহেতু কম পরিমাণে পুষ্টি পানিতে দ্রবীভূত হয়।
৩. অণুজীবের বৃদ্ধি দ্রুত প্রতিরোধ হয়।
৪. এনজাইমের কার্যকারিতা দ্রুত বাধাগ্রস্ত হয়।

ধীর হিমায়নের অসুবিধা

১. এ ক্ষেত্রে হিমায়ন প্রক্রিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন হয় বলে দেহের ভিতরে বরফের কণাগুলো বড় বড় স্ফটিক (Crystal) আকার ধারণ করে।
২. স্ফটিক বড় হওয়ার কারণে মাছের দেহের অভ্যন্তরে কোষ প্রাচীর ফেটে যায়।
৩. যখন মাছকে থয়িং (Thawing) করা হয় তখন বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান অপচয় হয়।
৪. ধীর হিমায়নের সময় মাছের এনজাইম এবং ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপ কিছু সময় ধরে চলতে থাকে। ফলে সম্পূর্ণভাবে হিমায়নের পূর্বেই মাছের গুনগতমান কিছুটা হ্রাস পায়।

হিমায়ন যন্ত্রের প্রকারভেদ

মৎস্য হিমায়নে নিম্নলিখিত হিমায়ন যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হয়।
১. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার (Air blast freezer)
২. কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার (Contact plate freezer)
৩. ইমারশান ফ্রিজার (Immersion freezer)

১. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে হিমায়িত করার পদ্ধতি : এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার একটি তাপ পরিবাহী সুড়ঙ্গ বা কক্ষ যেখানে মাছকে ট্রলিতে সাজিয়ে ভিতরে ঢুকানো হয়। কক্ষের ভিতর পাখার সাহায্যে -৩৫°সে. থেকে -৪০°সে. তাপমাত্রায় বায়ু প্রবাহিত করা হয়। প্রবাহিত বাতাসের গতিবেগ থাকে ৫ থেকে ৭ মি./সে.। এয়ার ব্লাষ্ট ফ্রিজারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ এর বেশি হলে মাছের দেহে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এ ধরনের প্রভাবকে 'ফ্রিজার বার্ন' বলে। এ অবস্থায় মাছের পারিপার্শ্বিক জলীয় বাষ্পের চাপ কমে যায় ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে যেতে থাকে। এতে মাছের বর্ণ ও গঠন নষ্ট হয়ে যায়। এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো এতে সময় বেশি লাগে (প্রায় ৫ ঘণ্টা), বেশি জায়গা দখল করে এবং অন্য পদ্ধতির চেয়ে জ্বালানি খরচ বেশি।

২. কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার : মাছ ও চিংড়ি হিমায়নের এটি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। এই যন্ত্রে মাছকে সরাসরি হিমায়িত প্লেটের উপর রেখে হিমায়িত করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ কক্ষের মধ্যে এক পাশে এক বা একাধিক কন্টাক্ট ফ্রিজার থাকে। এই ফ্রিজের ভিতর কয়েকটি প্লেট বসানো থাকে যার উপর মাছ ভর্তি ট্রেগুলো সাজিয়ে দেয়া হয়। যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত ট্রেগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে একে অপরের সাথে লেগে থাকে। এ কারণে এ ফ্রিজকে কন্টাক্ট ফ্রিজ বা প্লেট ফ্রিজ বলে। এটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি হয়ে থাকে। এই ফ্রিজের ধারণক্ষমতা প্রতি লোডে ৩০০ কেজি থেকে ১ টন পর্যন্ত হতে পারে। এই ফ্রিজের তাপমাত্রা -৩৫°সে. থেকে -৪০°সে. পর্যন্ত হয়। ফ্রিজিং সময় নির্ভর করে মাছের পুরুত্বের উপর। সাধারণত ফ্রিজিং সময় ২-৩ ঘণ্টা। মাছের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য এই ফ্রিজের তাপমাত্রা -৩৫°সে. থেকে -৪০°সে. বজায় রাখা আবশ্যক। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে মাছ এবং চিংড়ি হিমায়িত করা হয়।

৩. ইমারশান পদ্ধতি : এক্ষেত্রে নিম্ন তাপমাত্রায় তরল পদার্থে মাছকে নিমজ্জিত করা হয়। এ ধরনের ঠাণ্ডা তরল পদার্থের মধ্যে মাছকে রেখে সরাসরি দেহের তাপমাত্রা কমানোর পদ্ধতি এয়ারব্লাস্ট ফ্রিজারের চেয়ে উন্নত। পানির চেয়ে এ ধরনের তরলের ফ্রিজিং পয়েন্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ইমারশান ফ্রিজারের কোন আদর্শ নক্শা নেই। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা লবণ দ্রবণ (২২% লবণ) অথবা এ জাতীয় রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা হয়। মাছকে সরাসরি এই জাতীয় দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয়। যেহেতু মাছ লবণ দ্রবণের সরাসরি সংস্পর্শে আসে সেহেতু মাছের দেহ থেকে খুব দ্রুত তাপ অপসারিত হয়। এক্ষেত্রে লবণ দ্রবণের তাপমাত্রা থাকে -২১°সে.। এই দ্রবণ ০.২মি./সেকেন্ড বেগে ঘুরতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে মাছকে -৩০°সে তাপমাত্রায় হিমায়নের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে মাছ কিছুটা লবণ শোষণ করে থাকে।

হিমায়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী নিয়ামকসমূহ

নিচে বর্ণিত প্রভাবকারী নিয়াকসমূহ মাছের হিমায়নকে প্রভাবিত করে থাকে–

১. **মাছের রাসায়নিক গঠন :** চর্বিযুক্ত মাছের চেয়ে কম চর্বিযুক্ত মাছ হিমায়নের জন্য ভালো। কারণ চর্বিযুক্ত মাছ জারণের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

২. **হিমায়ন পূর্ব পরিচর্যা :** হিমায়িত মাছের গুণগতমান নির্ভর করে কাঁচা মাছের গুণগতমানের ওপর। আংশিক পচা হিমায়িত মাছের সংরক্ষণ সময় টাটকা হিমায়িত মাছের সংরক্ষণ সময়ের চেয়ে অনেক কম। হিমায়নের পূর্বে মাছের সঠিক পরিচর্যা ও সংরক্ষণ হিমায়িত মাছের গুণগতমানকে নিশ্চিত করে।

৩. **হিমায়ন পদ্ধতি :** হিমায়িত মাছের গুণাগুণ নির্ভর করে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মাছকে হিমায়ন করা হয়েছে তার উপর। যেমন- দ্রুত হিমায়নের মাধ্যমে হিমায়িত মাছের গুণাগুণ ধীর হিমায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে হিমায়িত মাছের চেয়ে ভাল হয়ে থাকে।

৪. **তাপমাত্রা :** তাপমাত্রা এবং সংরক্ষণ সময় হিমায়িত মাছকে প্রভাবকারী দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। হিমায়িত মাছকে যদি উচ্চ তাপমাত্রায় রাখা হয় তাহলে তার গুণগতমান হ্রাস পাওয়ার গতি ত্বরান্বিত হয়।

৫. **প্যাকেজিং এবং গ্লেজিং :** হিমায়িত মাছ যদি সরাসরি বাতাসের সংস্পর্শে আসে তাহলে তার গুণগতমানের ক্ষতিকর পরিবর্তন হয়। জলীয় অংশ হ্রাস পাওয়ার ফলে মাছের দেহ শুকিয়ে যেতে পারে, এতে মাছ বিবর্ণ হয়ে যায় এবং খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয়। ফলে মাছকে প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণ প্রয়োজন। গ্লেজিং -এর ফলে মাছের গায়ে পাতলা আবরণ সৃষ্টি হয় যা মাছের জলীয় অংশ হ্রাস পাওয়া রোধ করে এবং পচন বাধাগ্রস্ত করে।

৬. **আপেক্ষিক আর্দ্রতা :** হিমায়িত মাছের দেহের আপেক্ষিক আর্দ্রতা পারিপার্শ্বিক আপেক্ষিক আর্দ্রতার চেয়ে বেশি থাকে বলে মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে যেতে পারে। তাই হিমায়িত মাছকে সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০% এর বেশি হওয়া উচিত।

অনুশীলনী - ১২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি জমে বরফে পরিণত হয়?
২. ব্লক আইস কাকে বলে?
৩. বরফের গুণগতমান বাড়ানোর লক্ষে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?
৪. মাছের শরীরে সচরাচর শতকরা কত ভাগ পানি থাকে?
৫. রৌদ্রে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা কী?
৬. টিনজাতকরণ বা ক্যানিং বলতে কী বুঝ?
৭. ইলিশ মাছ কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়?
৮. গ্লেজিং কী?
৯. লবণায়নের সময় সাধারণত মাছ ও লবণ কী অনুপাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে?
১০. মাছ হিমায়িত করতে সাধারণত কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছ সংরক্ষণ বলতে কী বুঝ?
২. কেন মাছ পচে যায়?
৩. কী কী কারণে মাছ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন?
৪. বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের দুটি সুবিধা লেখ।
৫. বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের দুটি অসুবিধা লেখ।
৬. শুঁটকি মাছের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাছ পচনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
২. মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ। বরফের সাহয্যে কীভাবে মাছ সংরক্ষণ করবে তা বর্ণনা কর।
৩. ইলিশ মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমির সমন্বয়ে গঠিত এদেশ। এদেশের স্বাদু পানিতে রয়েছে ২৭২ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি; সামুদ্রিক উৎসে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। এ বিপুল মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য আহরণ নীতিমালা, মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং মৎস্য বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মৎস্য আহরণ বা মৎস্য শিকারের মূলনীতি : বাংলাদেশের হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিল, নদী, পুকুর ডোবা ও বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব উৎস হতে মৎস্য শিকার বা আহরণের জন্য কত গুলো মূলনীতি অনুসরণ করা অতীব প্রয়োজন। মৎস্য শিকারের মূলনীতিমালা হলো–

- সঠিক মাত্রায় বা সহনীয় মাত্রায় মাছ আহরণ করতে হবে।
- মাছের ঘনত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে মাছ ধরতে হবে। যেমন- পুকুর বা নদীতে মাছের প্রজনন হার, প্রাকৃতিক প্রাচুর্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে মাছ ধরা উচিত। প্রজননের সময় মাছ আহরণ বা ধরা নিষিদ্ধ।
- মৎস্য আহরণ বা মাছ ধরার মূলনীতির একটি হলো- কম খরচে বেশি আহরণ করা, যেমন- ট্রলারের সাহায্যে মাছ ধরার সময় এর তেলের খরচ এবং জাল ও লোকজনের শ্রম-ব্যয় ইত্যাদি কম প্রয়োগ করে বেশি পরিমাণ মাছ আহরণ করা। আবার মাছের পোনা উৎপাদন, কৃত্রিম খাদ্য তৈরি ইত্যাদিতে কম খরচে বেশি মাছ উৎপাদন করা।
- পুরাতন বা সনাতন যন্ত্রপাতি (Gear) ব্যবহারের পরিবর্তে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।
- কম সংখ্যক জনবল নিয়োগ করে অধিক পরিমাণে মৎস্য আহরণ করা।
- অতিরিক্ত মাত্রায় মাছ আহরণ কমানো, ও
- জলাশয়ে অত্যধিক মাছের ঘনত্ব থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করা।

মাছ আহরণকালীন সময়ে করণীয় : পুকুর থেকে মাছ আহরণ বা ধরার পূর্বের দিন পুকুরে অবশ্যই জাল টেনে নিতে হবে এবং সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এতে মাছ পাকা হবে অর্থাৎ মাছের দেহ শক্ত হবে। কারণ মাছের পেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য থাকলে জীবিত অবস্থায় যে এনজাইম খাদ্য হজমে সহায়তা করতো ঠিক সেই এনজাইম এবং পচনকারী ব্যাকটেরিয়া মাছ মরার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত মাছকে পচাতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও যেসব মাছ Active feeding অবস্থায় থাকে তাদের দেহ নরম হয়। আঞ্চলিক ভাষায় সেসব নরম দেহ বিশিষ্ট মাছকে কাঁচা মাছ বলে। বাজারে এসব কাঁচা মাছের মূল্য পাকা মাছের তুলনায় অনেক কম। একজন দক্ষ পাইকার মাছ হাতে নিয়েই বলে দিতে পারে উক্ত মাছ কাঁচা না পাকা। সঠিক বাজারমূল্য প্রাপ্তির নিমিত্তে মৎস্যচাষিকে অবশ্যই উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তবে পাঙ্গাশের ক্ষেত্রে একদম খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা এবং জাল টানা যাবে না। পুকুর খুব বড় হলে পুরো পুকুরে একবারে জাল না টেনে আংশিকভাবে জাল টানতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার অনেকেই বিশেষ করে পুকুরে মাছ যখন কমে যায় তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুকুর হতে মাছ ধরার সময় মাছকে ধরে বেশ কিছু সময়ের জন্য হাপাতে রাখেন। এমনকি কখনও কখনও প্রায় ১০-১২ ঘণ্টাও মাছকে

এভাবে রাখা হয়। মাছকে এভাবে হাপায় রাখলে পালানোর জন্য মাছ অবিরামভাবে চেষ্টা করে। ফলে মাছের দেহে প্রচুর ল্যাকটিক এসিড জমে। এ কারণে এভাবে রাখা মাছের ক্ষেত্রে মাছ মরার সঙ্গে সঙ্গেই গুণগতমানের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। বাজারে এ অবস্থায় উত্তোলিত মাছকে আঞ্চলিক ভাষায় বাসি মাছ বলে। সদ্য ধৃত মাছ এবং বাসি মাছের বাজারমূল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। তাই সম্ভব হলে সদ্য ধৃত বা টাটকা মাছ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করলে ভালো বাজার মূল্য পাওয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ তুলে বাজারজাতকরণ করতে হবে। সম্ভব হলে ঈদ, পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে অতি সকালে মাছ বাজারজাত করতে হবে।

মাছ বাজারজাতকালীন সময়ে করণীয় : মাছ অত্যন্ত দ্রুত পচনশীল। আর এই পচনশীলতার মূল কারণ হলো-এর গঠনশৈলী অর্থাৎ পানির উপস্থিতি (৬৬-৮৪%)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবহনের সময় হাত বদলের কারণে ধৃত স্থান হতে ক্রেতা সাধারণের নিকট পৌঁছার অনেক আগেই মাছের গুণগত মানের প্রায় ৭০% নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে কিছু কিছু প্রোটিনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। ফলে পুষ্টি সাধনের যে উদ্দেশ্যে আমরা মাছ গ্রহণ করে থাকি সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। শুধু তাই না সদ্যধৃত মাছ বা টাটকা মাছ এবং অনেক পূর্বে মৃত মাছের বাজার মূল্যেরও বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। তাই ধৃত মাছ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুব সকালে নিকটবর্তী বাজারে টাটকা অবস্থায় বিক্রির ব্যবস্থা করলে মাছের ভালো বাজারমূল্য পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও একটু বেশি দূরত্বে পরিবহনের ক্ষেত্রে মাছের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে বরফে সংরক্ষণ, হিমায়ন ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই শুধু মাছের উৎপাদনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলেই চলবে না। উৎপাদিত মাছের যেন সঠিক বাজার মূল্য পাওয়া যায় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। আর বরফে সংরক্ষণ করা হলে তা সঠিক নিয়মে করা দরকার, নতুবা মাছের গুণগতমান ঠিক থাকবে না। একভাগ মাছ এবং এক ভাগ বরফ এভাবে পর্যায়ক্রমে মাছ এবং বরফ দিয়ে বাঁশের ঝুড়িতে মাছ সাজাতে হবে।

মাছের আংশিক ও পূর্ণ আহরণ : মাছের আংশিক আহরণ হলো বাজারজাত যোগ্য বড় মাছগুলো সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ বা আহরণ করা। আংশিক আহরণ অধিক উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। কারণ প্রত্যেকটি জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা আছে। মাছের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওজন ধারণক্ষমতার যত কাছাকাছি যাবে মাছের বৃদ্ধির হার তত কমে যাবে। ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে মাছ আর বাড়বে না। যেমন- কার্পজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থাপনায় পুকুরের ধারণক্ষমতা ২০ কেজি/শতাংশ। তবে প্রজাতি ও ব্যবস্থাপনা ভেদে জলাশয়ের এ ধারণক্ষমতা পরিবর্তনশীল। যেমন- পাংগাসের ক্ষেত্রে এর ধারণক্ষমতা কার্পের চেয়ে দ্বিগুণ। মাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যখনই ধারণক্ষমতার কাছাকাছি আসবে তখনই বড় আকারের মাছগুলো ধরে সে প্রজাতির উত্তোলনকৃত মাছের সংখ্যার সাথে ১০% যোগ করে পুনঃ মজুদ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আবার কার্পজাতীয় মাছের ওজন যখন ৪০০-৬০০ গ্রাম বা তার কাছাকাছি হয়ে যায় তখন তাদের বৃদ্ধির হার তুলনামূলক কমে যায়। তখন দেখা যায় মাছ খায় বেশি কিন্তু সে হারে বাড়ে না। তাছাড়া মাছ বাজারজাতকরণের বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ৫০০ গ্রাম বা কিছু বেশি ওজনের মাছই অধিক হারে বাজারে বিক্রি হয়। যেহেতু এ ওজনের মাছের ক্রেতা বেশি থাকে তাই যখনই মাছ উল্লেখিত ওজনের কাছাকাছি যাবে তখনই বড় সাইজের মাছগুলো আংশিক আহরণ করে পুনঃ পোনামজুদ করা উচিত। তাছাড়া এভাবে আংশিক আহরণ ও পুনঃ মজুদ করা হলে মাছের চুরিজনিত ক্ষতির ঝুঁকিও কমে আসবে। বছর শেষে সম্পূর্ণ মাছ বা পূর্ণ আহরণ করা যেতে পারে। তবে বানিজ্যিক ভিত্তিতে মাছচাষ করলে ১ কেজির নিচের আকারের মাছ বিক্রি লাভজনক নয়।

মাছ বাজারজাতকরণ পদ্ধতি : আমাদের দেশে স্বল্প এবং দীর্ঘ সময়ে মাছ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- স্বল্প দূরত্বে মাছ বাজারজাতকরণের সময়ে মাছ সংরক্ষণের কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই পুকুর, নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদি হতে যে অবস্থায় মাছ আহরণ করা হয় ঠিক সে অবস্থায় বাজারে নিয়ে আসা হয়। আবার মাছ যদি ধৃত স্থান হতে অনেক দূরে বাজারজাত করতে হয় তাহলে অধিকাংশ মৎস্য চাষি বরফ দ্বারা মাছের ঝুড়িতে করে মাছ বাজারজাতকরণ করে থাকে। বরফ দ্বারা মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মাছ ও বরফের সঠিক অনুপাত মানা হয় না বলে মাছের গুণগতমানের অবনতি ঘটে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক অনুপাতে (গ্রীষ্মকালে মাছ ও বরফের অনুপাত ১ঃ১ এবং শীতকালে মাছ ও বরফের অনুপাত ২ঃ১) বরফে সংরক্ষণ করে মাছ বাজারজাতকরণ করলে মাছের ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যেতে পারে।

মাছ বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধান : আমাদের দেশে মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো এবং কীভাবে সেসব সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে তার দিক নির্দেশনা নিচে দেয়া হলো।

সমস্যাসমূহ

১. প্রয়োজনীয় অবতরণ কেন্দ্রের অভাব : আমাদের দেশে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলো সাধারণত মাছ ধরার স্থান থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। ফলে ধৃত মাছ অবতরণ কেন্দ্রে আনতে অনেক সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে মাছের গুণগতমান অনেক কমে যায়। ফলে মৎস্যজীবীরা মাছের কম মূল্য পেয়ে থাকে।

২. মৎস্য বাজারে প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব : অধিকাংশ মৎস্য বাজার সমূহে যানবাহন প্রবেশের স্থানের অভাবে মাছ মাথায় করে কিংবা ঠেলাগাড়িতে করে বিক্রির জন্য বাজারে নিতে হয়। এতে করে মাছের ওপর চাপ পড়ে। আবার অনেক সময় রোদ বৃষ্টি হতে মাছকে রক্ষা করার জন্য মাছ বাজারে কোন ছাউনির ব্যবস্থা নেই। ফলে রোদ-বৃষ্টিতে মাছের গুণগতমানের যথেষ্ট অবনতি ঘটে ।

৩. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব : আমাদের দেশে অধিকাংশ মাছ বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে মাছ ধরা হয় সেখান থেকে মাছ বাজারে আনতে বেশির ভাগ মাছের গুণগতমান হ্রাস পায়।

৪. বরফ প্রাপ্তির অভাব : সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা ইত্যাদি জেলার অর্ন্তগত বিল ও হাওড় এলাকায় এবং উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, যেমন- সেন্টমার্টিনস্, কুতুবদিয়া ও দুবলার চর এলাকায় বরফের অভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে উল্লেখিত উপকূলীয় এলাকায় বরফের অভাবে মোট আহরিত মাছের ৪০% শুঁটকি করে বাজারজাত করে থাকে।

৫. অপর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার : বরফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায়শই সঠিক অনুপাত মেনে চলা হয় না। আমাদের দেশে শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১ : ২ এবং গ্রীষ্মকালীন ১ : ১ হওয়া উচিত। কিন্তু মৎস্যজীবীরা এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণে বরফ ব্যবহার করে থাকে বলে মাছের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

৬. ইনসুলেশনের অভাব : অনেক মাছ সংগ্রহকারী যান্ত্রিক নৌকায় ইনসুলেশনের ব্যবস্থা থাকে না। ফলে প্রচুর পরিমাণে বরফ নষ্ট হয়ে যায়। এসব মাছ সংগ্রহকারী নৌকায় হোগলা পাতা, কাঠের গুঁড়া, তুষ ইত্যাদি ব্যবহার করে বরফের সংরক্ষণ দীর্ঘায়িত করা যায়।

৭. পর্যাপ্ত প্যাকেজিং সুবিধাদির অভাব : মাছ পরিবহনের জন্য যেসব বাক্স ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাধারণত খুবই বড় হয়। এগুলোতে বেশি পরিমাণ মাছ ভর্তি করা হয়। ফলে উপরের মাছের চাপে নিচের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাক্সগুলোতে অতিরিক্ত মাছ (৮ মণ পর্যন্ত) রাখার ফলে মাছ ওঠানামা করতে খুবই অসুবিধা হয়। বিদেশে রপ্তানি কাজে ব্যবহৃত দেশে তৈরি কার্টনগুলোতে ভালো কাগজ ও মোম ব্যবহার করা হয় না বলে সহজেই মাছ নষ্ট হয়ে যায়।

৮. স্বাস্থ্য বিধি মানা হয় না : আমাদের দেশে মৎস্য বিপণনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যবিধির ওপর কম গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রায়শই মাছ রাখার পাত্র এবং বাক্স পরিষ্কার বা ধৌতকরণ করা হয় না। অধিকংশ খুচরা বাজারের মেঝে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয় না।

৯. মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব : মৎস্যজীবী কর্তৃক মাছ ধরার পর ধৃত মাছগুলো সরাসরি ক্রেতার নিকট পৌঁছায় না বরং বিপণন মাধ্যমের নিকারী, চালানী, আড়তদার, পাইকারি বিক্রেতার হাত ঘুরে ক্রেতার কাছে পৌঁছায়। এভাবে প্রতিবার হাত বদলের ফলে একদিকে মাছের গুণগত মানের অবনতি ঘটে অন্যদিকে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের লাভবান হবার কারণে মৎস্যজীবীরা ও ক্রেতাসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমাধান

১. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

২. মৎস্য বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ভূমি থেকে কমপক্ষে ২ ফুট উচু ভিটিসহ পাকা টিনের চালা ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. মৎস্য বাজারের সঙ্গে স্থল অথবা নৌ-পথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

৪. প্রয়োজনীয় সংখ্যক বরফ কল স্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যুতের অভাবে যেন বরফ কল বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণকালে সঠিক অনুপাতে বরফ ব্যবহার করতে হবে।

৬. বরফায়িত বা হিমায়িত মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে রেফ্রিজারেটেড ও ইনসুলেটেড ভ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি কাজে সঠিক মানের প্যাকেজিং দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

৮. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত কর্মীকে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে হবে।

অনুশীলনী-১৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাঁশ বা কাঁচা মাছ কাকে বলে?

২. আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ সংরক্ষণে কী ব্যবহার করা হয়?

৩. গ্রীষ্মকালে কী অনুপাতে মাছ ও বরফ ঝুড়িতে সাজানো হয়?

৪. শীতকালে কী অনুপাতে মাছ ও বরফ ঝুড়িতে সাজানো হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে কাঁচা মাছ পাকা করা হয়?

২. মাছ আহরণের পরে ভালো বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

৩. আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মৎস্য আহরণ বা মৎস্য শিকারের মূলনীতি বর্ণনা কর।

২. আমাদের দেশে মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা দেখা যায় এবং কীভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে তা আলোচনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম তৈরি ও সংরক্ষণ

অসংখ্য পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড় বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমির সমন্বয়ে এ দেশে রয়েছে বিশাল মৎস্য ভাণ্ডার। এই বিশাল মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য শিকার নীতিমালা, মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জাম শ্রেণিবিন্যাস, মাছ ধরার জাল তৈরি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত সরঞ্জাম শ্রেণিবিন্যাস : মৎস্য আহরণে যেসব সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় সেগুলো ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. মাছ ধরার জাল (Fishing nets),
২. মাছ ধরার ফাঁদ (Fishing traps),
৩. মাছ ধরার বড়শি (Fishing hooks) এবং
৪. কোঁচ জাতীয় যন্ত্রপাতি (Wounding gears)

১. মাছ ধরার জাল : জাল হলো মাছ ধরার একপ্রকার প্রধান উপকরণ। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় ধরনের তন্তু দ্বারা জাল তৈরি করা হয়। পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় থেকে মাছ বা মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য সুতার তৈরি ফাঁস বিশিষ্ট যে সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তাকে মাছ ধরার জাল বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের সুতা দিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরি করা হয়। আবার বিভিন্ন জালের ফাঁসের আকারও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

ফাঁসের আকার (Mesh size) : জালের বিস্তৃতি অবস্থায় দুটি বিপরীত গিটের মর্ধবর্তী সর্বাধিক কৌনিক দূরত্বকে জালের ফাঁস বা মেস সাইজ বলে।
ফাঁসের আকার = ২ x ফাঁসের এক বাহুর দৈর্ঘ্য

সুতার প্রকারভেদ : মাছ ধরার জাল তৈরির জন্য তন্তু ব্যবহৃত হয়। এসব তন্তু (Fibre) -কে সুতা বলা হয়। আর মাছ ধরার জালে ব্যবহৃত সুতার ক্ষুদ্রতম একক হলো তন্তু। মাছ ধরার জাল তৈরির সুতা দুই ধরনের ।

১. প্রাকৃতিক তন্তু (Natural fibre) : সাধারণত এগুলো মনো ফিলামেন্টের (Mono filament) হয়ে থাকে। যেমন- কটন, শণ, পাট, নারিকেলের ছোবড়া (coir) প্রাকৃতিক সিল্ক ইত্যাদি।

২. কৃত্রিম তন্তু (Synthetic fibre) : এগুলো মাল্টি ফিলামেন্ট (Multi filament) হয়ে থাকে। যেমন- নাইলন, ট্রেটন, অরলন, এনভাইলন, ভিনাইল ইত্যাদি।

মাছ ধরার জালের প্রকারভেদ : মাছ ধরার জাল প্রধানত দুই প্রকার যেমন-

১. গিঁটযুক্ত জাল (Knotted net)
২. গিঁটবিহীন জাল (Knot less net)

১. গিঁটযুক্ত জাল : যেসব জালের ফাঁসে গিঁট থাকে তাকে গিঁট যুক্ত জাল বলে। গিঁট হলো এক বা একাধিক টুয়াইন (Twine) যখন পরস্পর প্যাঁচানো অবস্থায় সংযুক্ত হয় তখন তাকে গিঁট বলে। আমাদের দেশে মৎস্য

আহরণে সাধারণত যে সমস্ত গিঁট যুক্ত জাল ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. বেড় জাল
খ. ভেসাল জাল
গ. স্রোতী জাল বা সুতি জাল
ঘ. ঝাঁকি জাল বা খেপলা জাল
ঙ. কৈ জাল
চ. ফাঁস জাল
ছ. ধর্ম জাল
জ. ঠেলা জাল

ক. বেড় জাল : এই জাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্লাবনভূমি, বিল-ঝিল এবং পুকুর-দিঘি হতে মৎস্য আহরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত লম্বায় ৫০ মিটার থেকে ২০০ মিটার ও পাশে ৫-৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। জালের ফাঁস ০.৫ সে.মি. থেকে ২.৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। জালকে ভাসমান রাখার জন্য জালের উপরের প্রান্তে ফ্লোট ও জালকে নিচের দিকে ডুবিয়ে রাখার জন্য Sinker হিসেবে জালের নিচের প্রান্তে মোটা রশি লাগানো থাকে। এই জাল সাধারণত অগভীর পানিতে স্থাপন করে একটি বিরাট এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। আবার কোনো কোনো বিলে যেখানে প্রচুর পরিমাণ জলজ আগাছা বিদ্যমান থাকে সেখানে জাল স্থাপন করে ভেতরের কচুরিপানা, শ্যাওলা ইত্যাদি পরিষ্কার করে জালের দুই প্রান্তে টেনে ঘেরের আকৃতি ছোট করে আনা হয়। এরপর আস্তে আস্তে জাল টেনে নৌকায় তোলা হয় ও পরে মাছ ধরা হয়। জালটি স্থাপন করে মাছ ধরতে সাধারণত ৮-১০ জন লোকের প্রয়োজন হয়। বেড় জালে সাধারণত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। তবে কোন প্রজাতির মাছ কী পরিমাণে ধরা পড়বে তা নির্ভর করে মাছ ধরার স্থান, মাছের প্রাচুর্য, সময় ও ঋতুর ওপর। বেড় জাল দ্বারা সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ এবং ছোট মাছের মধ্যে সাধারণত পুঁটি, টেংরা, চান্দা, চেলা, চাপিলা প্রভৃতি মাছ আহরণ করা হয়।

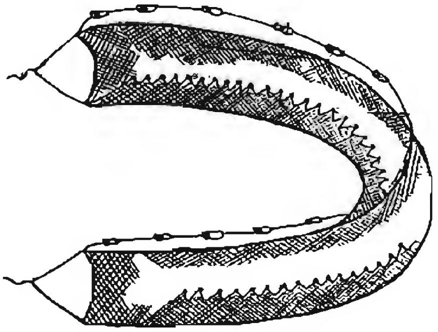

চিত্র-২২ : বেড় জাল

খ. ভেসাল জাল : কোনো কোনো এলাকায় ভেসাল জালকে খরা জাল বা টং জালও বলা হয়। এই জাল ব্যবহার করার জন্য জালের দুই পাশে দুটি লম্বা বাঁশ (জালের সমপরিমাণ) বেঁধে বাঁশ দুটির পেছনের অংশ একত্রে আটকানো হয়। সামনের দিকে জালের সমপরিমাণ লম্বা একটি মোটা সুতা দুই বাঁশের অগ্রভাগের সাথে বেঁধে দেয়া হয়। দুটি বাঁশের সাথে আটকানো ত্রিভুজাকার জালটি মাটিতে পোঁতা বাঁশের খুঁটির সাথে আটকানো হয়। জালটি বাঁশের ফ্রেমের সাথে এমনভাবে আটকানো হয় যাতে তা একটি ঢেঁকিকলের মতো কাজ করে। এই জাল সাধারণত খালের পরিষ্কার স্থানে, নদী ও বিলের সংযোগস্থলে, দুই বিলের সংযোগ স্থলে, কোনো রাস্তা বা বাঁধের ভেঙে যাওয়া অংশে বা প্রান্ত ঘেঁষে অথবা যেখানে মাছ চলাচল বেশি সেখানেই এটি স্থাপন করা হয়। এই জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় জালের পেছনের অংশ অর্থাৎ দুই বাঁশের সংযোগ স্থলকে উপরের দিকে তোলা হয় এবং তখনই জালের সামনের অংশ পানিতে ডুবে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময় পানিতে রাখার পর দুই বাঁশের মিলিত স্থানে উঠে চাপ দেয়া হলে এর সামনের অংশ পানি থেকে উপরে উঠে আসে। এরপর জাল ঝেড়ে মাছ সংগ্রহ করে নৌকায় বা হাঁপায় বা ঝুড়িতে রাখা হয়। বেড় জালের মতো ভেসাল জালেও বিভিন্ন প্রজাতির বড় মাছ যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেলসহ, পুঁটি, টেংরা, খলিসা, চান্দা, চেলা ইত্যাদি ছোট ছোট মাছ প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে।

গ. স্রোতী জাল বা সুতি জাল : এটি একটি ফানেল আকৃতির জাল। জালের মুখ খালের দুই পাশে বাঁশের খুঁটি দ্বারা স্থাপনের মাধ্যমে খোলা রাখা হয়। ব্যবহারের সময় জালের পিছনের অংশ (থলে) রশি দ্বারা বন্ধ করে রাখা হয়। জালের ফাঁস থলের দিকে (পেছনের অংশ) সাধারণত ০.৫ সে.মি. এবং মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়ে ৪.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময় পর পর থলের মুখ খুলে মাছ সংগ্রহ করা হয়। স্রোতী জাল সাধারণত অক্টোবর মাস থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিলের ভিতর বা সংযুক্ত খালের মধ্যে এই জাল ব্যববহার করা হয়। বর্ষা শেষে বিলের পানি যখন নেমে যেতে শুরু করে তখনই খালের মধ্যে স্রোতের বিপরীতে মুখ করে এই জাল স্থাপন করা হয়। ফলে পানির মধ্যে নেমে আসা প্রায় সব ধরনের মাছই এতে ধরা পড়ে। এই জালে প্রচুর পরিমাণে পুঁটি, টেংরা, চাপিলা, চান্দা, পাবদা ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে।

ঘ. ঝাঁকি জাল বা খেপলা জাল : ঝাঁকি জালকে অনেক অঞ্চলে খেপলা জাল বলে। আবার কোন অঞ্চলে একে কনুই জালও বলে। ঝাঁকি জাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাইলনের সুতার তৈরি, বৃত্তাকার এবং এর প্রান্তের দিকে পকেট ও লোহার কাঠি থাকে। জালের কেন্দ্রের সাথে থাকে ৫-৭ মিটার লম্বা রশি। লম্বা রশিটি ডান হাতের কব্জির সাথে বেঁধে নদী-খালের তীর বা নৌকা থেকে পানিতে জালটি নিক্ষেপ করা হয়। এ জাল বৃত্তাকার অবস্থায় পানিতে পড়ে এবং লোহার ওজন থাকার ফলে তাড়াতাড়ি পানির তলদেশে চলে যায়। তারপর রশি ধরে টেনে জাল উত্তোলন করা হয়। জালের পকেটে বা চূড়ায় আটকানো মাছ সংগ্রহ করা হয়। মাছ ধরার কাজে সারা বছরই এ জালের ব্যবহার হয়ে থাকে। ঝাঁকি জাল দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও, কালিবাউস, শোল, গজার, টেংরা, পুঁটি, মলা, ঢেলা ইত্যাদি মাছ আহরণ করা হয়ে থাকে।

ঙ. কৈ জাল : এটি এক ধরনের ফাঁস জাল। এই জালে কৈ মাছ বেশি আহরণ করা হয় বলে এ জালের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কৈ জাল সাধারণত ১০ -১২ মিটার লম্বা এবং ০.৬ মিটার থেকে ১.০ মিটার চওড়া হয়ে থাকে। এর ফাঁস ৩.২ সে.মি. থেকে ৪.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। খুবই চিকন সুতা (নাইলনের একক আঁশ বা সুতার কয়েকটি আঁশ) দ্বারা এ জাল তৈরি করা হয়। জালকে পানির মধ্যে টান টান অবস্থায় রাখার জন্য জালের উপরের অংশে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মোটা সুতা দ্বারা পানিতে ভাসমান কাঠি ব্যবহার করা হয়। এ জাল সাধারণত ধান ক্ষেতের আইলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাতা হয়। জালের প্রান্তদ্বয় শক্ত কোন খুঁটি বা ধানের তিন চারটি গোছা একত্র করে বাঁধা হয়। অনেক সময় একাধিক জাল এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে পাতা হয়। সাধারণত জুন-জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ জালের ব্যবহার হয়ে থাকে। এ জাল ব্যবহার করে কৈ মাছ ছাড়াও শিং, মাগুর, খলিসা, টাকি, প্রভৃতি মাছও ধরা হয়।

চ. ফাঁস জাল : এটি একটি বড় ফাঁসের গিলনেট। মাছের সাধারণত চলাচলের পথে যখন এই জাল পাতা থাকে এবং মাছ যখন এই জালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করে তখন মাছের মাথা জালে আটকা পড়ে এবং জালে জড়িয়ে যায় বলে এই জালকে ফাঁস জাল বা গিলনেট বলে। এই জালের ফাঁস ৪.৫ সে.মি. থেকে ১৫ সে. মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জাল দৈর্ঘ্যে ২০ মিটার থেকে ৫০০ মিটার এবং প্রস্থে ১ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। জালের উর্ধ্ব প্রান্তে ফ্লোট এবং নিম্ন প্রান্তে মাটির চারা (ওজন) সংযুক্ত থাকে। ফাঁস জালের উভয় প্রান্ত বাঁশের কাঠি বা খুঁটির সাথে বেঁধে পানিতে স্থাপন করা হয়। বেশির ভাগ সময় জালটি ধান ক্ষেতের আইলের মাঝে বা জঙ্গল পরিষ্কার করে তার মাঝে স্থাপন করা হয়। সাধারণত সন্ধ্যার দিকে জালটি স্থাপন করে সকালে তোলা হয়। আবার কখনও কখনও সকালে স্থাপন করে সন্ধ্যায় তোলা হয়। আগষ্ট থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত এ জালে প্রচুর পরিমাণ রুই, কাতলা, কার্পিও এবং ছোট মাছের মধ্যে পুঁটি, টাকি, ভেদা বা মেনি ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে। উপকূলীয় অঞ্চলে ইলিশ ধরার কাজেও ফাঁস জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ছ. ধর্ম জাল : ধর্ম জাল একটি চার কোনাকার জাল, যার চারটি কোণা আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত ২টি বাঁশের কঞ্চির মাধ্যমে একটি লম্বা বাঁশের সাথে যুক্ত থাকে। এই বাঁশ দিয়ে জালটি পানিতে ডোবানো হয় এবং কিছু সময় পর পর তুলে জালে প্রাপ্ত মাছ ধরে নেয়া হয়। ধর্ম জাল সাধারণত জুলাই থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই জালের ফাঁস ০.৫ সে.মি. থেকে ১.৫ সে.মি পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপরের স্তরের প্রায় সব মাছই যেমন- পুঁটি, মলা, চেলা, বাঁশপাতারি, বাতাসি, রাইখর ইত্যাদি মাছ এই জালে ধরা পড়ে।

জ. *ঠেলা* জাল : ত্রিকোণাকার বাঁশের ফ্রেমের সাথে এই জাল আটকানো থাকে। ফ্রেমটির একটি লাঠি কিছুটা লম্বা থাকে এবং তা হাতলের কাজ করে। হাতলের সাহায্যে জাল টেনে মাছ ধরা হয়। জালের ফাঁস ০.৫ সে.মি. থেকে ১.৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জাল সাধারণত অগভীর পানিতে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় কচুরিপানা বা আগাছার ভিতরে *ঠেলে* দিয়েই জালটি তোলা হয়। ফলে আগাছা বা কচুরিপানার মধ্যে যে সমস্ত মাছ লুকিয়ে থাকে সেগুলো এই জাল দ্বারা আহরণ করা যায়। এই জালে সাধারণত কৈ, শিং, মাগুর, চিংড়ি, খলিসা, পুঁটি, টাকি ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে।

গিঁটবিহীন জাল : যেসব জালে গিঁট থাকে না তাকে গিঁটবিহীন জাল বলে। এটি এমন এক ধরনের বিশেষ জাল যার ঘরগুলো পাকানো ইয়ার্নের সাহায্যে তৈরি করা হয় এবং একটির সাথে অপরটি বুননের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়।

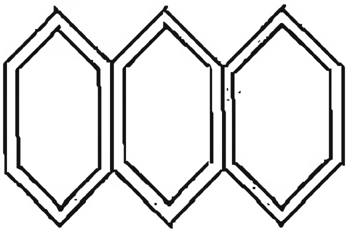

চিত্র-২৩ : গিঁটবিহীন জাল

জাল সংরক্ষণ : আমাদের দেশে মৎস্য আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ জেলে তাদের সুতার তৈরি জাল সংরক্ষণ করার জন্য গাব ফলের নির্যাস ব্যবহার করে থাকে। এ প্রাকৃতিক সংরক্ষক দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতে কম খরচে অতি সহজে সুতার তৈরি জাল সংরক্ষণ করা যায়। নিচে জাল সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ দেয়া হলো–

জাল সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ

- জাল সংরক্ষণ করলে জালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়;
- জালের শক্তি বাড়ে;
- জাল সংরক্ষণ করলে জালের কুঁচকানো রোধ করা যায়;
- জালে পচন ঘটায় এমন সব অণুজীবসমূহের বৃদ্ধি রোধ করে। ফলে জালের পচন রোধ হয়;
- জালে গাব ব্যবহার করলে জালের গিঁট স্থানান্তর (Kont slippage) রোধ করে;
- জাল সহজেই পানিতে ডুবে যায়;
- অতিরিক্ত পানি শোষন রোধ হয় এবং পচনকারী অণুজীবের ক্রিয়া বন্ধ হয়।

জাল সংরক্ষণের ধরন : মাছ ধরার জাল সংরক্ষণকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **জীবাণু ধ্বংস করার মাধ্যমে জাল সংরক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে পচনকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার লক্ষ্যে জাল সিদ্ধ করার পর রোদে শুকিয়ে কপার সালফেট দ্রবণে ভিজিয়ে পরে শুকিয়ে অথবা কপার নেপথোনেট দ্রবণে ভিজিয়ে তারপর শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

২. **আবরণ সৃষ্টি করে পচনকারী ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধের মাধ্যমে সংরক্ষণ** : পচনকারী ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ রোধ কল্পে টেনিন, গাব বা বাবলা গাছের ছালের নির্যাস, আলকাতরা বা টেনিন একত্রে মিশিয়ে তা দিয়ে প্রাকৃতিক আঁশের তৈরি জালের উপর আবরণ সৃষ্টি করা হয়।

৩. **উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ** : এ ক্ষেত্রে কপার নেপথোনেট ও আলকাতরা দিয়ে উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণে একত্রে রং করার মাধ্যমে জাল সংরক্ষণ করা হয়।

১. জীবাণু ধ্বংস করে সংরক্ষণ

ক. সূর্যালোকের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ : এটি একটি সম্পূরক পদ্ধতি। পৃথিবীর সর্বত্র মাছ ধরার কাজ চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিপরীতে অথবা বিভিন্ন ঋতুতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে তাপ অথবা শুষ্কতায় সংক্রামক অণুজীবসমূহ বাঁচতে পারে না এবং সূর্যালোক জালকে সংক্রামক অণুজীব থেকে রক্ষা করে।

সংরক্ষণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে ব্যবহারের পর জালকে প্রথমে সিদ্ধ এবং তারপর সূর্যালোকে শুষ্ক করার মাধ্যেমে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতি প্রাকৃতিক তন্তুর জন্য কার্যকর কিন্তু কৃত্রিম তন্তুর জন্য নয়। কারণ সিদ্ধ করলে কৃত্রিম তন্তু অল্প সময়ের ভিতরই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেহেতু এ পদ্ধতিতে কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না তাই এটিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিও বলা হয়।

সুবিধা : এ পদ্ধতিতে জাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন খরচ হয় না।

অসুবিধা

- অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়,
- এ পদ্ধতিতে জাল সংরক্ষণের জন্য জাল সিদ্ধ করা হয় ফলে জালের স্থায়িত্ব কমে যায়,
- এ পদ্ধতি প্রাকৃতিক আঁশের তৈরি জালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু কৃত্রিম আঁশের তৈরি জালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

খ. কপার সালফেট দ্বারা সংরক্ষণ : এ পদ্ধতিতে কপার সালফেট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক আঁশের দ্বারা তৈরি জাল সাধারণত কপার সালফেট ($\mathrm{CuSo4}$) দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বার বার জালকে কপার সালফেট দ্রবণে ভেজানো হয়। এক্ষেত্রে স্বাদু পানির জন্য ০.১% এবং লবণাক্ত পানির জন্য ০.৩% কপার সালফেট দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। কপার সালফেট দ্রবণে জালকে কয়েক ঘন্টা ডুবিয়ে রাখা হয়। সমুদ্রের পানির ক্ষেত্রে কপার সালফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কপার কার্বোনেট ($\mathrm{CuCo3}$) উৎপন্ন করে এবং পরে কপার কার্বোনেট দানাদার সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl) এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারীয় কিউপ্রাস ক্লোরাইড ($\mathrm{CuCl2}$) উৎপন্ন করে জালের উপর গুচ্ছাকারে জমা হয়। যদি উক্ত জালকে দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যালোকে রাখা হয় বা শুকানো হয় তবে ক্ষারীয় কিউপ্রাস ক্লোরাইড জালটির ক্ষতি করে জালের স্থায়িত্ব কমিয়ে দেয়। এজন্য প্রত্যেকবার ডাইং করা বা ভেজানোর পর জালকে শুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করা উচিত।

সাবধানতা

- সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে ক্ষারীয় কিউপ্রাস ক্লোরাইড জালের ক্ষতি করে তাই জালকে সব সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে;
- কোনো অবস্থাতেই দ্রবণকে উত্তপ্ত করা যাবে না।

বাংলাদেশে সচরাচর প্রচলিত জাল সংরক্ষণ পদ্ধতি : বাংলাদেশে যেভাবে জাল রঞ্জিত (Dyeing) করা হয় চলতি ভাষায় তাকে গাব দেয়া বলে। অধিকাংশ জেলে তাদের সুতার তৈরি জাল সংরক্ষণ করার জন্য গাব ফলের নির্যাস ব্যবহার করে। গাব হলো প্রাকৃতিক রঞ্জক বা সংরক্ষক যা দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই এতে খরচ কম পড়ে এবং এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা সহজতর। এ পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণ গাব ফলের নির্যাস একটা মাটির পাত্রে নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে নির্যাসকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পাতলা করা হয়। তারপর জালকে উক্ত দ্রবণে ৪-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয় এবং পরে কোন ছায়াযুক্ত স্থানে শুকানো হয়। এভাবে কয়েকবার ভিজানো এবং শুকানোর পরে জাল কালচে বাদামি রঙে রঞ্জিত হয় এবং এ সময়ে তা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভালো ফল পাওয়ার জন্য জেলেরা জাল কয়েকবার ব্যবহার করার পর তা আবার গাব দিয়ে পুনঃরঞ্জিত করে ব্যবহার করে থাকেন।

কারেন্ট জাল : মনোফিলামেন্ট (Monofilament) বা একক কৃত্রিম নাইলনের তন্তু দ্বারা তৈরি যেকোন ব্যাসের বা দৈর্ঘের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁস জালকে প্রচলিত ভাষায় কারেন্ট জাল বলে। এই জালের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মাছ আহরণের জন্য এটি যখন পানিতে পেতে রাখা হয় তখন পানির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রঙ হওয়ায় মাছ চলাচলের সময় বুঝতেই পারে না তার সামনে কোনো বাধা আছে। ফলে মাছ জালে আটকে যায়। আর একবার জালে আটকে গেলে কারেন্টে আটকানোর ন্যায় যেহেতু মাছ জাল থেকে ছুটতে পারে না তাই একে কারেন্ট জাল বলে। বাস্তবিক পক্ষে এই জালে কোনো কারেন্ট নেই। আবার কারেন্ট জাল ব্যতিত অন্যান্য গিলনেটের ক্ষেত্রে ফাঁসের আকারের সাথে সম্পর্কিত আকারের মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু কারেন্ট জালের ক্ষেত্রে ফাঁসের আকারের চেয়ে ছোট বা বড় আকারের মাছও অনেক সময় ধরা পড়ে। সরকার মাছ আহরণের ক্ষেত্রে সকল দৈর্ঘের ফাঁস বিশিষ্ট কারেন্ট জালের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।

২. মাছ ধরার ফাঁদ

i) চোঙ্গাকৃতি ফাঁদ

ক. ডুগাইর : এটি বাঁশের তৈরি চোঙ্গাকৃতি ফাঁদ। বাঁশের চিকন শলাকা ও বেত বা লতা দ্বারা এ ফাঁদ বোনা হয়। এটি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। এর ফাঁস ০.৫ সে.মি. থেকে ১.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি সাধারণত বিল সংলগ্ন স্থানে বা মাছের চলাচলের পথে পাতা হয়। এগুলো খালে বানা দিয়ে এর ফাঁকে খেজুর বা তালের ডাল পুঁতে দিয়ে ধান ক্ষেতের আইল বরাবর বা ঘাস দিয়ে আইলের মতো করে কিছু দূরে দূরে পেতে রাখা হয়। এটি দ্বারা ছোট আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, টাকি, বেলে ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

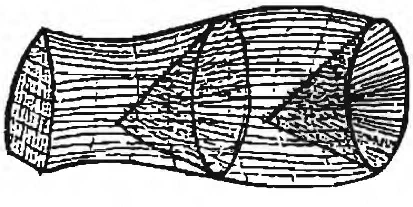

চিত্র-২৪ : ডুগাইর

খ. কৈ ডুগাইর : এটিও বাঁশের তৈরি এক ধরনের চোঙ্গাকৃতি ফাঁদ। এ ফাঁদও বাঁশের চিকন শলাকা, বেত ও লতা দ্বারা বোনা হয়। এর ফাঁসের আকার সাধারণত ১ সে.মি. থেকে ২.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাতা হয়ে থাকে। এটি দ্বারা কৈ, টাকি, বেলে, পুঁটি, ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

গ. উদরা : এটি চোঙ্গাকৃতি বাঁশের তৈরি এক ধরনের ফাঁদ। এটিও বাঁশের চিকন শলাকা বা লতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ধানক্ষেতের আইলে ও আগাছামুক্ত অগভীর পানিতে এ ফাঁদ পেতে রাখা হয়। উদরা দিয়ে চিংড়ি ও বেলে মাছ ধরা হয়।

ঘ. খাদম : এটিও চোঙ্গাকৃতি বাঁশের ফাঁদ। খাদম দেখতে অনেকটা ইউ (U) আকৃতির। এর ফাঁস সাধারণত ১.৫-২.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। বাঁশের চিকন শলাকা বা লতা দ্বারা এটি তৈরি করা হয়। ধান ক্ষেতের আইলে ও আগাছামুক্ত অগভীর পানিতে এ ফাঁদ পেতে রাখা হয়। এটিও খালের মধ্যে ব্যবহার করা যায়। এটি জুলাই থেকে জানুয়ারি এ সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের ফাঁদের সামনের দিকে ভাল্ব থাকে ফলে একবার মাছ ভিতরে ঢুকলে আর বের হতে পারে না। খাদম দিয়ে বড় আকারের রুইজাতীয় মাছ, শোল, গজার, বোয়াল ইত্যাদি ধরা হয়।

ii) বক্স ফাঁদ : এই ফাঁদগুলো দেখতে বক্সের ন্যায় বলে এই ফাঁদকে বক্স ফাঁদ বলে। এগুলো হলো–

ক. বিত্তি : এটি বর্গাকৃতির এক ধরনের ফাঁদ। এটি বাঁশের শলাকা ও লতা দ্বারা তৈরি করা হয়। এর ফাঁস সাধারণত ০.৫-১.০ সে.মি. হয়ে থাকে। এর এক পাশে তিনটি ভাল্ভ থাকে। বিত্তির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে ৩০ সে.মি., ১৫ সে.মি. এবং ২০ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি সাধারণত স্রোতযুক্ত অগভীর পানিতে ধান ক্ষেতের আইলে রাতে পেতে রাখা হয়। আর মাঝে মাঝে টোপ হিসেবে বিত্তিতে শামুক ব্যবহার করা হয়। বিত্তি দিয়ে প্রধানত টেংরা মাছ ধরা হয়। এটি সাধারণত জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পানি থাকা সাপেক্ষে প্লাবনভূমিতে ব্যবহৃত হয়।

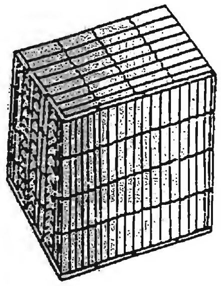
চিত্র-২৫ : বিত্তি

খ. ভাইর : এটিও বর্গাকৃতি ফাঁদ এবং বাঁশের শলাকা বা লতা দ্বারা তৈরি করা হয়। তবে যে অঞ্চলে পর্যাপ্ত লতা পাওয়া যায় না সেখানে তাল গাছের আঁশ দ্বারাও ইহা তৈরি করা যেতে পারে। এর ফাঁস ২.৫-৩.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। ভাইরের একদিকে মাত্র একটি ভাল্ব থাকে। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৮০ সে. মি., ৬০ সে. মি. এবং ৭০ সে.মি. হয়ে থাকে। খাল, বিল অথবা নদীতে বানা দিয়ে এর ফাঁকে ভাইর স্থাপন করা হয় এবং এটি দ্বারা বোয়াল, আইড় ও পরিণত আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও ইত্যাদি মাছও ধরা হয়।

গ. খৈলসুন (ঘুনি) : এটি আয়তাকার বক্স আকৃতির। এ ধরনের ফাঁদ বাঁশের চিকন শলাকা ও লতা দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্যের অংশের সামনে ও পিছনে ভাল্ব থাকে। এর ফাঁস সাধারণত ০.২-০.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি দ্বারা পুঁটি, চেলা, মলা, ঢেলা, দারকিনা, চান্দা, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

ঘ. চারো : এটিও আয়তকার বক্স আকৃতির একটি ফাঁদ। এটি বাঁশের চিকন শলাকা ও লতা দিয়ে তৈরি করা হয়। এর প্রস্থের দিকে অর্থাৎ সরু অংশে ভাল্ব থাকে। এর ফাঁস সাধারণত ১.০-১.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। চারো দিয়ে কৈ, টেংরা, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছ ধরা হয়। মাছকে আকর্ষণ করার জন্য টোপ হিসেবে চারোর মধ্যে শামুক ব্যবহার করা হয়।

ঙ রামানি : এটিও এক ধরনের বক্স আকৃতির ফাঁদ। বাঁশের চিকন শলাকা ও লতা বা বেত দ্বারা এটি তৈরি করা হয়। রামানি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। এর ফাঁস ১.৫-২.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি সাধারণত বিল সংলগ্ন খালে অথবা মাছ চলাচলের পথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খালে বানা দিয়ে এর ফাঁকে খেজুর বা তালের ডাল পুঁতে দিয়ে ধানক্ষেতের আইল বরাবর বা ঘাস দিয়ে আইলের মতো করে কিছু দূরে দূরে ইহা স্থাপন করা হয়। এটি দ্বারা শোল, টাকি, কৈ, পুঁটি ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

চ. টুবো : এটি আয়তকার বক্স আকৃতির এক ধরনের ফাঁদ। এর প্রস্থের দিকে অর্থাৎ সরু অংশে ভাল্ব বা

একমুখো প্রবেশ পথ থাকে। এর ফাঁস ০.২ সে.মি. থেকে ০.৫ সে.মি. হয়ে থাকে। এটি দ্বারা প্রধানত পুঁটি মাছ ধরা হয়।

ছ. পলো : এটি বাঁশের শলাকা ও বেত দ্বারা তৈরি এক ধরনের ফাঁদ। এর নিচের দিকের মুখ বড় এবং উপরিভাগের মুখ ছোট। এর উভয় মুখই খোলা থাকে। মাছ আহরণের ক্ষেত্রে পলোর উপরিভাগে হাত দিয়ে ধরে অগভীর পানিতে চাপ দিতে দিতে পর্যায়ক্রমে সামনের দিকে এগোনো হয়। পলোর ফাঁস ১.০-২.০ সে.মি. হয়ে থাকে। মাছ পলোতে আটকা পড়লে শব্দ বা ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। তখন পলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরা হয়। শিং, মাগুর, কৈ, শোল, টাকি, বোয়াল, রুই, কাতলা, ইত্যাদি মাছ পলোতে ধরা পড়ে।

জ. উচা : এটি ঠেলা জালের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি বাঁশের তৈরি এক ধরনের মাৎস্য শিকার সরঞ্জাম। এর মেস সাইজ ১.০-১.৫ সে.মি.। বাঁশের লম্বা হাতলের মাধ্যমে এটি অগভীর পানিতে পরিচালনা করা হয়। উচা দ্বারা ছোট চিংড়ি, বেলে, চান্দা, বজুরী, বইচা, ইত্যাদি ছোট প্রজাতির মাছ ধরা হয়।

ঝ. হোগরা : এটি বাঁশের চাটাই নির্মিত ত্রিকোণাকৃতির মাছ ধরার ফাঁদ। এর মধ্যে ডাল পালা দিয়ে অগভীর পানিতে বেশ কয়েকদিন ফেলে রাখা হলে এতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আশ্রয় নেয়। হোগরার সাহায্যে চিংড়ি, শিং, মাগুর, টেংরা. পুঁটি, কৈ, ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

৩. মাছ ধরার বড়শি

ক. দাওন বড়শি (লং লাইন) : একটি লম্বা রশিতে ০.৫-১.০ মিটার পর পর দাওন বড়শি ঝুঁলিয়ে দেয়া হয়। রশির দুইপ্রান্ত খুঁটির সাথে বাঁধা থাকে। বড়শিতে টোপ হিসেবে কেঁচো, চিংড়ি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। দাওন বড়শিতে এক সাথে ২০০-২৫০টি বড়শি ঝুলানো থাকে। এতে টাকি, শোল, গজার, টেংরা, মাগুর, কৈ ইত্যাদি মাছ ছাড়াও কখনো কখনো রুইজাতীয় মাছ ধরা পড়ে।

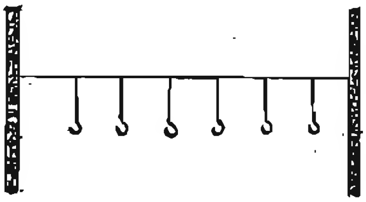

চিত্র ২৬ : দাওন বড়শি

খ. ঢ্যাপ/নল বড়শি : এ ধরনের বড়শিকে ৩০-৩৫ সে.মি. লম্বা কচুরি ডগা বা পাটকাঠি থেকে সুতা দ্বারা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এ ধরনের বড়শি অগভীর পানিতে জলজ আগাছা পরিষ্কার করে তার মাঝে একটির পর একটি স্থাপন করা হয়। সাধারণত ২০০-৩০০ ঢ্যাপ বড়শি লাইন ধরে স্থাপন করা হয় এবং বিপরীত দিক থেকে মাছ আহরণ শুরু করা হয়। ঢ্যাপ বড়শিতে মূলত টাকি মাছ ধরা পড়ে। এছাড়া এতে শিং, মাগুর, কৈ, টেংরা, পাবদা ইত্যাদি মাছও ধরা পড়ে।

গ. হাত বড়শি : বড়শি দ্বারা মাছ ধরার মধ্যে হাত বড়শিই সহজতম পদ্ধতি। এটি এক টুকরো ছোট সিসা, একটি ছিপ, একটি সিগন্যাল ফ্লোট বা পাখনা এবং হুক সহযোগে গঠিত। এতে কৃত্রিম টোপ সংযুক্ত করা হয়। পানির গভীরতার উপর নির্ভর করে সুতার সাথে ফ্লোট সংযুক্ত করে পানিতে ফেলা হয়। মাছ যখন টোপ খেতে থাকে বা কামড় দেয় তখন ফ্লোট দেখে বুঝা যায় মাছ টোপ খাওয়ায় চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে মুহূর্তে হঠাৎ করে ঝাঁকুনি দিয়ে বড়শি উত্তোলন করলে মাছ বড়শিতে আটকে যায়। তখন মাছ আহরণ করা হয়। এ ধরনের বড়শি দ্বারা মুলত রুই, মৃগেল, কালিবাউশ, কার্পিও, আইড় ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

ঘ. সেট লাইনিং : বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীরা অনেকগুলো ছিপ একত্রে ব্যবহার করে। এ

ছিপগুলো অগভীর পানিতে যেমন- নদীর কূলে, জলাশয়, মোহনায় ব্যবহার করা হয়। ছিপগুলোর নিচের অংশ মাটিতে গেঁথে দেয়া হয়। হুকে জীবিত ছোট আকারের টাকি মাছ, ব্যাঙ এবং পুঁটি জাতীয় মাছের পিঠের দিকে আটকানো থাকে যা পানি পৃষ্ঠে চলাফেরা করে। এ ধরনের বড়শি দ্বারা শোল, বোয়াল, গজার, টাকি ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে।

ঙ. চাঁচড়া : এটি বাঁশের শলাকা দ্বারা তৈরি। যা ২.৫-৩.২ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে। এটি ৩০-৩৫ সে.মি. কচুরির ডগা বা পাটকাঠি হতে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। চাঁচড়ার দুটি চোখা (সুচালো) মাথা ঘাস ফড়িংয়ের মধ্যে ঢুকানো হয়। মাছ যখন ফড়িং খেতে আসে তখন চাঁচড়ার চোখা মাথা দুটি দুইদিকে প্রসারতি হয়ে মাছের মুখে আটকে যায়। এভাবে চাঁচড়া ব্যবহার করে শুধুমাত্র কৈ মাছ ধরা হয়।

৪. কোঁচ জাতীয় উপকরণ

এই জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে মাছকে আহত করার মাধ্যমে আহরণ করা হয় বলে একে Wounding Gear বলে। মাছ আহরণে ব্যবহৃত এই জাতীয় কতগুলো সরঞ্জামের নাম নিচে দেয়া হলো–

ক. কোচ : কোচ হলো মাছকে আহত করে ধরার এক ধরণের সরঞ্জাম। এতে ২৫-৩০ সে.মি. দীর্ঘ ১৫-২০টি লোহার শলাকা ২-৩ মিটার লম্বা একটি বাঁশের মাথায় আটকানো থাকে। এটি সাধারণত রাতের বেলায় নৌকা থেকে ছুরে মেরে মাছ ধরা হয়। আবার ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যখন কোন বাতাস প্রবাহিত না হয় তখন ধান ক্ষেতে রুই, কাতলা মাছ যখন ধানের শ্যাওলা খেতে থাকে তখন কোচ দ্বারা ঐ সব মাছ আহরণ করা হয়।

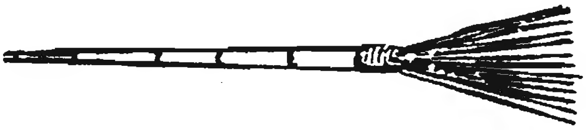

চিত্র-২৭ : কোচ

খ. জুতি : এটিও আহত করে মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ। জুতিতে প্রায় ২-৩ মিটার লম্বা বাঁশের অপেক্ষাকৃত মোটা প্রান্তে ৬০-৭০ সে.মি. দীর্ঘ ৭-৮টি বাঁশের শলাকা শক্তভাবে রশি দ্বারা আটকানো থাকে। প্রতিটি শলাকার মাথায় লোহার তৈরি বার্বযুক্ত কভার বা কালি লাগানো থাকে। এটি রাতে নৌকা থেকে ছুরে মেরে মাছ ধরা হয়।

গ. টেঁটা : এটিও মাছকে আঘাতকারী এক ধরনের যন্ত্র। এতে ২-৩ মিটার বাঁশের এক প্রান্তে ৩-৫টি লোহার বার্বযুক্ত শলাকা লাগানো থাকে। এটি নৌকা থেকে ছুড়ে মারা হয়। অনেক সময় রাতের বেলায় হ্যাজাক লাইট ঝুলিয়ে মাছকে আলোর দিকে আকৃষ্ট করে নৌকা হতে এ যন্ত্রটি ছুড়ে মারা হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, শোল, গজার, বোয়াল ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।

ঘ. আঁচড়া : এটিও মাছকে আহত করে আহরণকারী এক ধরনের যন্ত্র। এতে ৩০-৪৫ সে.মি. লম্বা লোহার একটি দণ্ড থাকে যার একটি মাথা বৃত্তাকারে বাঁকানো এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এর সঙ্গে ১.৫-২.০ মিটার লম্বা বাঁশের চিকন একটি কাঠি রশি দ্বারা আটকানো থাকে যার সাহায্যে কাদার ভিতরে যন্ত্রটাকে সামনে পিছনে টানা হয়। ফলে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকা মাছ তীক্ষ্ণভাবে বাঁকানো আংটায় আটকে যায়। পরে সেখান থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। এই যন্ত্র দ্বারা কাদার ভিতরে বসবাসকারী মাছ, যেমন- বাইম, গুচি, শিং ইত্যাদি আহরণ করা যায়।

অনুশীলনী - ১৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয় এমন একটি সরঞ্জাম নাম লিখ।

২. বেড় জাল কাকে বলে?

৩. ফাঁস জাল কাকে বলে?

৪. চাঁচড়া দ্বারা সাধারণত কোন মাছ আহরণ করা হয়?

৫. স্রোতী জাল কাকে বলে?

৬. আঁচড়া দ্বারা সাধারণত কোন জাতীয় মাছ আহরণ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কারেন্ট জাল কাকে বলে ?

২. জাল সংরক্ষণের দুইটি সুবিধা লেখ।

৩. দুইটি প্রাকৃতিক তন্তুর নাম লেখ।

৪. দুইটি কৃত্রিম তন্তুর নাম লেখ।

৫. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয় এমন দুইটি ফাঁদের নাম লেখ।

৬. Wounding Gear কাকে বলে? এর একটি উদাহরণ দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয় এমন সরঞ্জাম শ্রেণিবিন্যাস কর। বেড় জাল দ্বারা কীভাবে মাছ আহরণ করা হয় বর্ণনা কর।

২. আমাদের দেশে জাল সংরক্ষণে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা

যেসব জলাশয়ের পানির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এবং পানি নিয়ন্ত্রণে মানুষের করণীয় খুব বেশি কিছু থাকে না সেগুলোকে মুক্ত জলাশয় বলে। বন্যার পানি, নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়,হ্রদ, মোহনা ইত্যাদি মুক্ত জলাশয়ের শ্রেণিভুক্ত। মুক্ত জলাশয়ের পরিসীমা কোন পাড় বা বাঁধ দ্বারা সীমিত নয় বিধায় এসব জলাশয়কে মুক্ত জলাশয় বলে। আমাদের দেশে ৪৩.৪৭ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ জলাভূমি রয়েছে। এর মধ্যে মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাভূমি অর্থাৎ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি ইত্যাদি অবক্ষয়ের ফলে ক্রমান্বয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে অনেক মূল্যবান মৎস্য প্রজাতির অবলুপ্তিসহ সামগ্রিকভাবে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত অবক্ষয় ঘটছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের এ অবক্ষয় রোধ এবং উন্নয়নকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা;
২. প্লাবনভূমিতে পোনা মাছ মজুদ;
৩. মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন;
৪. ফিশপাস ও মৎস্যবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, এবং
৫. ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।

১. মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা : মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধভাবে মৎস্য আহরণের কারণে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। আবার অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ইতোমধ্যে ৫৪টি প্রজাতি বিপন্নতার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিলুপ্তপ্রায় এসব মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে অভয়াশ্রম তাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অভয়াশ্রম হলো কোনো জলাশয় বা তার অংশবিশেষ যেখানে মৎস্য শিকার বা আহরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকে এবং মাছ যেখানে নিরাপদে বা নির্ভয়ে বিচরণ ও প্রজনন করতে পারে।

মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধিকরণ;
- মাছকে তার সংকটময় মুহূর্তে রক্ষা করা;
- বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতিকে রক্ষা করা, ও
- জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা।

মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচন

- জলাশয়ের যেখানে ডিমওয়ালা মাছ থাকে বা মাছ ডিম ছাড়ে (সাধারণত গভীরতম অংশ) বা যে অংশ ছোট পোনার নার্সারি হিসাবে ব্যবহৃত হয় সে অংশ সারা বছরের জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত ও নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়;
- মাছের স্বাভাবিক বিচরণ স্থল, প্রজনন স্থান ইত্যাদি চিহ্নিত করে অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচন করতে হবে। স্থান নির্বাচনের সময় জলমহালের ভৌত অবস্থা, গতি-প্রকৃতি, গভীরতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে;

- নদীর গভীর অংশ কিন্তু স্রোত তুলনামূলকভাবে কম এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত;
- মাছের জৈবিক আচরণ বিশেষ করে মাছের মাইগ্রেশানের অবস্থা, পোনা মাছের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে নার্সারির অবস্থান, নৌ চলাচল বা কোনোরূপ ফেরী ঘাটের অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থান নির্বাচনের সময় বিবেচনায় আনতে হবে।

মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ

- অভয়াশ্রমের আয়তন ও সীমানা সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে;
- জলাশয়ের আয়তনের ওপর ভিত্তি করে মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। জলাশয়ের ৫-১০% অভয়াশ্রম হতে পারে;
- নদীর বেলায় অভয়াশ্রমের আকার কত হবে বা কত গুলো হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেসব মাছ যথেষ্ট চলাচল করে অভয়াশ্রম ছোট হলে তারা অভয়াশ্রমের বাইরে এলে ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আবার অভয়াশ্রম বড় হলে সেখানকার জেলেরা আর্থিক দুরবস্থায় পড়বে।

২. প্লাবন ভূমিতে পোনা মজুদ : বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মৎস্য সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত আহরণের কারণে আমাদের দেশে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। অব্যবহৃত প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। ইতোমধ্যে সরকারি ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেক মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ করে বেশ ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে সামাজিক সচেতনতার অভাবে অনেক জায়গায় ছেড়ে দেয়া পোনা ছোট অবস্থায় ধরে ফেলা হয়েছে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্ত জলাশয় হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাছের যোগান পাওয়া যেতে পারে। তবে মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আইন ভঙ্গকারীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান অসৎ লোকদের দমিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। বিপুল সংখ্যক পোনা মজুদের জন্য প্লাবনভূমি বা বড় বড় বিলের সন্নিকটে পোনা উৎপাদন নার্সারি স্থাপন করা যেতে পারে। এসব নার্সারিতে ২-৩ মাস পোনা লালন পালন করে ৪-৫ ইঞ্চি আকারে পরিণত হলে পরে বর্ষার শুরুতে এসব পোনা প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। ফলে পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমের আগে মাছগুলো যথেষ্ট বড় হবে।

৩. মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন : মাছের বংশ বিস্তার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে জলাশয় ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সারা দেশে অনেক খাল, বিল, ছোট নদী এবং এদের সংলগ্ন জলাশয়সমূহ মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব জলাশয়কে সামান্য সংস্কার করে পুনরায় মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত করা যেতে পারে।

৪. ফিশপাস ও মৎস্যবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ : বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বা পোল্ডার এবং গ্রাম পর্যায়ে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণের কারণে প্লাবন ভূমিতে মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ আজ হুমকির সম্মুখীন। ফিশপাস বা মৎস্যবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ করে বিল থেকে নদীতে এবং নদী থেকে বিলে মাছের অবাদ যাতায়াত এবং প্রজনন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে এ সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি প্লাবনভূমিতে দেশী প্রজাতির মাছের ব্যাপক বংশবিস্তার ঘটানো সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৫. ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ : প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের মধ্যে ইলিশ অন্যতম। প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ মে.টনের অধিক ইলিশ আহরিত হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক জলাশয় হতে

৩,৮৫,১৪০ মে.টন ইলিশ মাছ আহরিত হয়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে জাটকা আহরণ, অপরিকল্পিত ভাবে ডিমওয়ালা ইলিশ নিধন এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে ইলিশের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। তাই এ মৎস্য সম্পদ আজ হুমকির সম্মুখীন। প্রতি বছর অবিবেচিতভাবে আহরিত প্রায় ১৯ হাজার মে. টন জাটকা রক্ষা করা গেলে ৪-৬ মাসের মধ্যে ঐগুলো বড় হয়ে তা থেকে অতিরিক্ত ২ লক্ষ মে.টন খাবার যোগ্য ইলিশ পাওয়া যেতে পারে।

সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব : সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সমাজের অংশ গ্রহণ বুঝায়। কিন্তু ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ গ্রহণের মাত্রা, কার্যকারিতা, ক্ষমতার ভাগাভাগি, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যাপক হারে নিশ্চিত করাটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজভুক্ত লোক দ্বারা সমাজবদ্ধ লোকদের জন্য ও সমাজভুক্ত লোকের সাথে এলাকার হয়ে মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও স্থায়ীত্বশীল আহরণের নিমিত্তে যে ব্যবস্থাপনা, সেটাই সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আহরণ, বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হয়। কিছু কিছু কাজ রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষে একা সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও সংশ্লিষ্ট জনগণের সত্যিকার ও সার্বিক অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোনোটিই সহজভাবে, স্বল্প ব্যয়ে, সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সীমিত জনবল ও সহায়ক যন্ত্রপাতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষে তা রীতিমতো দুরূহ অথচ সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তা সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। নিচে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

- এতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়জনিত অপচয় রোধ হয়;
- প্রশাসনিক ও আইনের প্রায়োগিক ঝামেলা কমে যায়;
- সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে;
- স্থানীয় নেতৃত্বের সুষ্ঠু বিকাশের পথ ও ধারা সুগম হয়;
- যৌথ মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের গ্রহণ যোগ্যতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়;
- সম্পদ আহরণকারীদের এক ধরনের কতর্ব্যবোধ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়;
- মৎস্যজীবীদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সূচিত হয়;
- স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে কোন গৃহীত পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়।

অনুশীলনী-১৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে মুক্ত জলাভূমির পরিমাণ কত লক্ষ হেক্টর?

২. মৎস্য অভয়াশ্রম কাকে বলে?

৩. মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন জলাশয়ের কত ভাগ হওয়া উচিত?

৪. ফিশপাস কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

২. অভয়াশ্রমের উদ্দেশ্য কী?

৩. ফিশপাস ও মৎস্য বান্ধব অবকাঠামো এর গুরুত্ব কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মৎস্য অভয়াশ্রমের জন্য স্থান নির্বাচনে কী কী বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনা করা উচিত?

২. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কী ?

৩. মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ মাছের উৎপাদনে কী প্রভাব বিস্তার করে তা আলোচনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য, মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন

জীববৈচিত্র্য শব্দটি ইংরেজি Biodiversity শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। জীববৈচিত্র্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট স্থানের জীবের প্রকরণ ও বিভিন্নতা। এই বিভিন্নতা প্রজাতি ও পপুলেশনের বংশগতির বিভিন্নতা হতে পারে। তাছাড়া পরিবেশের পরিবর্তন তাদের আন্তঃক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট প্রকরণও হতে পারে। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি রয়েছে। এছাড়া আছে অসংখ্য বিভিন্ন প্রজাতির অণুজীব, যেগুলোকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। জীববৈচিত্র্য শুধু জীবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এদের আবাসভূমির প্রকরণ এবং বিস্তৃতিও এর অর্ন্তভুক্ত।

জলজ জীববৈচিত্র্য : জলজ জীববৈচিত্র্য বলতে জলজ পরিবেশে উপস্থিত সব প্রাণী ও উদ্ভিদ বা জীবকুলের সমৃদ্ধতা বুঝায়। যেমন- কোনো জলাশয়ের সকল জলজ প্রাণী, তথা মাছসমূহ, জলজ উদ্ভিদসমূহ, অণুজীবসমূহ মিলেই সেখানকার জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। আর সেখানে প্রত্যেকের অবস্থান বা উপস্থিতি অপরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে ভারসাম্য রক্ষা করে। আগে সাধারণত মনে করা হতো যেসব জীব বা প্রাণী মানুষের সরাসরি উপকারে লাগে কেবল সেগুলোই পরিবেশে রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে মানুষ তাঁর নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে অনুভব করেছে যে, পরিবেশে উপস্থিত সব জীবেরই একটি গুরুত্ব রয়েছে এবং একটি বিশেষ বস্তু বা প্রজাতির সর্বনিম্ন পরিমাণের উপস্থিতি সেখানে নিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যেমন- গুইসাপ সরাসরি মানুষের উপকার করে না, কিন্তু দেখা যায় গুইসাপের উপস্থিতি অন্যান্য বিষধর সাপের উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই গুই সাপের অনুপস্থিতিতে বিষধর সাপের প্রাধান্য বাড়তে বাড়তে মানুষের উপস্থিতিকে বিপন্ন করতে পারে। আবার দেখা যায় কিছু বিশেষ বৃক্ষ মশার বৃদ্ধি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কিছু জলজ আগাছা মশার জন্ম ও বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। আবার অনেক সময় নদীর গভীরতম অংশ যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ছোট মাছ বিদ্যমান থাকে সেখানে শুশুকের উপস্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ শুশুকের উপস্থিতি ছোট মাছের প্রাচুর্য্যতা নিশ্চিত করে। এমনিভাবে আমাদের জলাভূমিতে উপস্থিত প্রতিটি প্রজাতিই কোনো না কোনো স্বাভাবিক গুরুত্ব নিয়ে প্রকৃতিতে অবস্থান করছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে জীববৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

মৎস্য জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মানবসৃষ্ট কারণসমূহ : মৎস্য জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মানব সৃষ্ট কারণসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

- অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, অন্যান্য বাঁধ ও সড়ক, মহাসড়ক নির্মাণের ফলে মাছের তথা জলজ জীবের আবাসস্থল ধক্ষংস হচ্ছে;
- জলাভূমি ভরাট করে কৃষি কাজ করা;
- বিচার বিবেচনা না করে কৃষি জমিতে যথেচ্ছভাবে কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে পানি দূষণ;
- বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির অতি আহরণ;
- মৎস্য প্রজাতিসমূহের আশ্রয়স্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস করা;
- সেচের মাধ্যমে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা;
- বিভিন্ন নতুন প্রজাতির আগমনের ফলে স্থানীয় ও দেশীয় প্রজাতি সমূহ বিলুপ্ত হচ্ছে। যেমন- উচ্চ

ফলনশীল বিদেশি মাছ চাষ করার ফলে কোথাও কোথাও দেশি প্রজাতি বিলুপ্তি হচ্ছে;

- ক্রমাগতভাবে কৃত্রিম প্রজননের ফলে মূল প্রজাতির পরিবর্তন ও স্বাভাবিক জিনগত অবনতি ঘটছে;
- প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ধরে ফেলা হচ্ছে ফলে পরবর্তী মৌসুমে প্রজননক্ষম মাছ পাওয়া যাচ্ছে না;
- মাছের প্রাকৃতিক লালন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলো হতে নির্বিচারে মাছ আহরণ;
- মৎস্য সম্পদের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অনুপস্থিতি।

মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়সমূহ : মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সাথে ফিশপাশ বা মৎস্যবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ করা যাতে করে প্রজননক্ষম মাছ প্রজননের জন্য বিল বা হাওর থেকে নদীতে এবং নদী থেকে বিলে অবাধে বিচরণ করতে পারে।
- খুব বেশি প্রয়োজন না হলে জলাভূমি ভরাট করে কৃষি কাজ না করা। এছাড়াও প্রতি একক কৃষি ভূমির চেয়ে প্রতি একক জলাভূমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। এ তথ্য কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় প্রচার করা।
- কৃষি জমিতে বিচার বিবেচনা সাপেক্ষে কীটনাশক ব্যবহার করা বা জৈবিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয় এমন ওষুধ ব্যবহার করা। তবে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) মাধ্যমে রোগ বালাই প্রতিরোধ ও দমনের ব্যবস্থা নেয়া সবচেয়ে উত্তম।
- মাছের আবাসস্থল নষ্ট হয় এমন স্থান থেকে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা,
- অতি আহরণ রোধকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে মেনে চলা বা অতি আহরণের ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগণকে অবহিত করা।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে সময় উপযোগী করা এবং আইন প্রয়োগের সব ক্ষমতা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত করা।
- দূষণ প্রতিরোধকল্পে পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা। অর্থ্যাৎ কোন শিল্প স্থাপনের পূর্বেই বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।
- প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম মাছ আহরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।
- প্রজনন ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং তা সংরক্ষণ করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন করে তোলা।
- তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কালে যেন মৎস্য সম্পদের ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করা।
- পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নিধনসহ জাটকা নিধন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।
- সব অবৈধ জাল দ্বারা মাছ ধরা বন্ধ করা।

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন

মৎস্য সম্পদকে ধ্বংস বা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত আইন বা বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে তাকে মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন বলে। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, চাহিদা, প্রাপ্যতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সহনশীল পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বিধানসমূহ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো–

১. পোনা মাছ ধরা বন্ধ করা।
২. ডিমওয়ালা মাছ ধরা বন্ধ করা।
৩. মাছের চলাচলের পথে বাধাবিঘ্ন দূর করা ও
৪. মাছ আহরণের ক্ষতিকর সরঞ্জাম ব্যবহার বন্ধ করা।

মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যকে টেকসই রাখার জন্য বেশ কত গুলো আইন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যা নিচে বর্ণনা করা হলো ।

ক. দি ইস্ট বেঙ্গল প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ অ্যাক্ট, ১৯৫০ : দি ইস্ট বেঙ্গল প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ অ্যাক্ট, ১৯৫০ সাধারণভাবে এটা মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ নামে পরিচিত। নিচে এই আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো।

১. এ আইনে মাছ বলতে সকল প্রকার মিঠা পানির মাছ, সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কাছিম, শামুক এবং ব্যাঙের জীবন চক্রের সকল স্তরের ধাপকে বুঝাবে।

২. এ আইন অনুযায়ী নদ-নদী ও খাল-বিলে মাছ শিকারের জন্য মাটির সাথে সংযুক্ত বা অন্য কোনোভাবে স্থিরকৃত মাছের স্বাভাবিক চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো অবকাঠামো, যেমন- বাঁধ, পাটা বা অন্য কোন স্থায়ী স্থাপনা (ফিক্সড ইঞ্জিন) নির্মাণ করা এবং এর মাধ্যমে মৎস্য আহরণ করা যাবে না। যদি কোথাও এরূপ স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মিত হয়ে থাকে তা আইন অনুযায়ী জব্দ, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে। অবশ্য সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের স্বার্থে এরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।

৩. অভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় জলাভূমিতে বিস্ফোরক, বন্দুক বা তীর ধনুক ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৪. অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৫. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল ও বিলে সংযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা দম্পতি মাছ (Parent fish) ধরা বা ধংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত জাতের পোনা এবং মা মাছ ধরা বা ধক্ষংস করার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

৬. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি–

ক. প্রতি বছর জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নিচের আকৃতির কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া।

খ. প্রতি বছর নভেম্বর-এপ্রিল সময়ে ২৫ সেন্টিমিটারের নিচের আকৃতির ইলিশ (যা জাটকা নামে পরিচিত) ও পাঙ্গাশের পোনা।

গ. প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি-জুন সময়ে ৩০ সেন্টিমিটারের নিচের আকৃতির সিলন, বোয়াল, আইড় ধরা, বহন, পরিবহন, আদান-প্রদান, প্রদর্শন বা নিজস্ব এখতিয়ারে রাখতে পারবে না। যদি কারো কাছে বর্ণিত আকারের চেয়ে ছোট পোনা নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় তবে সমুদয় মাছ বাজেয়াপ্ত করা যাবে। এভাবে বাজেয়াপ্তকৃত মাছ নিলামে বিক্রয় করে লব্দ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। তবে

মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কারণে বা উদ্দেশ্যে মাছ ধরা, বহন, বিক্রয়, পরিবহন বা প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

৭. সরকার নির্ধারিত অভয়াশ্রম হতে বিনা অনুমতিতে যেকোন আকৃতির রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ এবং ঘনিয়া আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৮. সমুদ্র উপকূল, উপকূলীয় নদ-নদী ও মোহনা থেকে যেকোনো প্রকার চিংড়ি অথবা মাছের পোনা আহরণ নিষিদ্ধ।

৯. যে কোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে, যেকোনো প্রকার ব্যাঙ জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরা, বহন, ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান বা এখতিয়ারে রাখা নিষিদ্ধ।

১০. মাছ ধরার ক্ষেত্রে যেকোনো মেস সাইজের কারেন্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

Fixed Engine বলতে মাছ ধরার জন্য মাটির সাথে সংযুক্ত বা অন্য কোনোভাবে স্থিরীকৃত যেকোনো জাল, খাঁচা, ফাঁদ বা কৌশল বুঝায়।

আইন অমান্যকারীদের জন্য নিম্নোক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

এ আইন অমান্যকারীকে কমপক্ষে ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

চিত্র-২৮ : মৎস্য আইন অমান্যকারীর সাজা

মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগকারী

- সকল ম্যাজিস্ট্রেট,
- পুলিশ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা, ও
- মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ -এ প্রণীত বিধিমালার অধীনে সংঘটিত অপরাধ একটি আমল যোগ্য অপরাধ (Cognisable Offence)। এ আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

মৎস্য আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কৌশল অর্থাৎ অপরাধসমূহ আমলে নেওয়া

১. এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে কোন কোর্টে এই ধরনের কেস গৃহীত হলে মৎস্য কর্মকর্তা বা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের নিচে পদ মর্যাদা সম্পন্ন নহেন এমন লোকের নিকট থেকে অভিযোগ আনীত হতে হবে। অথবা সরকার কর্তৃক এতদবিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নালিশ দায়ের ছাড়া আদালত অত্র আইনের অধীনে কোন অপরাধ আমলে নিতে পারিবেন না।

২. ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্টেট কোর্টের নিচে কোনো কোর্ট এই অপরাধের বিচার পরিচালনা করতে পারবে না।

খ. পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ : আমাদের দেশে বেসরকারি মালিকানাধীন অসংখ্য ছোট বড় পুকুর শরিকদের মতান্তরের কারণে পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। এসব অকেজো ও পতিত পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের জন্য ১৯৩৯ সালে পুকুর উন্নয়ন আইন প্রণীত হয়। যা ১৯৮৬ সালের ৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত করা হয়। নিচে এ আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো-

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো পুকুর-দিঘি বা জলাশয় যে কোনো কারণে পতিত রাখা হয়েছে তাহলে উক্ত পুকুর, দিঘি বা জলাশয় মালিককে যথাযথ নোটিশ প্রদান করতঃ জলাশয় উন্নয়নের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

২. নোটিশ দেয়ার পর যদি পুকুর মালিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাছ চাষ না করেন, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুকুর মালিককে নোটিশ দিয়ে পুকুরটিকে পতিত পুকুর হিসেবে ঘোষণা দিবেন। অনুরূপ নোটিশের একটি অনুলিপি পুকুরের নিকট কোনো প্রকাশ্য স্থানে লটকাইতে হবে এবং উক্ত তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুকুরের মালিক বা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক এতদবিষয়ে কোনো আপত্তি দাখিল হলে জেলা প্রশাসক তা নিষ্পত্তি করতঃ পতিত ঘোষণা সংক্রান্ত নোটিশটি হয় বলবৎ করবেন নতুবা প্রত্যাহার করবেন।

৩. জেলা প্রশাসক ৪ ধারা মোতাবেক পতিত ঘোষিত পুকুরের দখল গ্রহণ করতঃ প্রয়োজনীয় উন্নয়ন/সংস্কার করতে পারবেন অথবা প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা আগ্রহী কোন ব্যক্তি বরাবরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা বা দখল অর্পণ করতে পারবেন। তবে পুকুরের মূল মালিক বা কোনো অংশীদার অনুরূপ সংস্কারমূলক কাজ করতে আগ্রহী হলে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

৪. এ আইনের আওতায় কোনো জলাশয় ২০ বছরের জন্য হস্তান্তর করা যাবে। তবে গ্রহীতা জলাশয় মালিককে সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

৫. হস্তান্তর গ্রহীতা মেয়াদবর্তী সময়ে সরকারের অনুমতিক্রমে মৎস্য চাষের জন্য অন্য কাউকে ইজারা দিতে পারবেন।

৬. পতিত পুকুরের সংস্কারের নিমিত্ত্ব প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুকুরের পার্শ্ববর্তী কোনো জায়গা দখল গ্রহণ করতে পারবেন।

৭. ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুকুরের দখল পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বা সংস্কার করতে ব্যর্থ হন বা গাফিলতির পরিচয় দেন, তবে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুকুরের দখল ফেরত নিতে পারবেন।

৮. প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ করার জন্য পরিত্যক্ত ঘোষিত পুকুরের হস্তান্তর সত্ত্বেও পুকুর মালিক বা তার অবর্তমানে তার ওয়ারিশগণ ঐ পুকুরের সংস্কারমূলক কাজের জন্য যে ব্যয় হয়েছে, তা যদি পরিশোধ করতে রাজি হন এবং অবশিষ্ট সংস্কারমূলক কাজ করতঃ মাছ চাষে ওয়াদাবদ্ধ হন, তবে কালেক্টর পুকুরের দখল তার বরাবরে ফেরত দিতে পারবেন।

৯. পরিত্যক্ত পুকুরের সংস্কারমূলক কাজের স্বার্থে উক্ত পুকুর সংলগ্ন যে জমির দখল নেয়া হয়। পুকুরের সংস্কারমূলক কাজের শেষে কালেক্টর উক্ত জমির দখল উহার মালিক বা ওয়ারিশগণ বরাবরে ফেরত দেবেন। তবে পুকুরের ক্ষতি হয় এমন কোনো ভাবে ঐ জমি ব্যবহার করা যাবে না।

১০. ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে পুকুর বা পুকুর সংলগ্ন জমির দখল ফেরত নিয়ে উহার মালিককে প্রদান করা হলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দখলে থাকা সময়ের জন্য কোনো খাজনা বা ভাড়া প্রদান করতে বাধ্য নয় যদি না আইনে কিছু স্পষ্ট বলা থাকে।

১১. পরিত্যক্ত পুকুরের মালিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা/ভাড়া পাইবেন।

১২. ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার দখলে থাকাকালীন সময়ে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পুকুর ব্যবহার করা যাবে না, তবে গৃহস্থালি কাজের ক্ষেত্রে এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হবে না। এই ধারা লঙ্ঘন করার শাস্তি অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানা।

১৩. ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন সময়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ সেচের জন্য পুকুরের পানি ব্যবহার করতে পারবে না। তবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতিক্রমে অনুরূপ ব্যবহার করা আইনসিদ্ধ হবে। এই ধারা লঙ্ঘন করার শাস্তি অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানা।

১৪. ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিত্যক্ত পুকুরের দখল নেয়ার পর যদি সঠিকভাবে তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তবে কালেক্টর এর দখল ফেরত নিতে পারবেন। অথবা এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এই ক্ষেত্রে ব্যয়িত খরচ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেন।

১৫. মেয়াদ শেষে পরিত্যক্ত পুকুরের দখল এর মালিক বরাবরে ফেরত দেয়া হবে। পুকুর মালিক বা তার ওয়ারিশগণ যদি উক্ত পুকুরের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ না করেন অথবা কালেক্টর যদি লক্ষ্য করেন যে, পুকুরটিতে সংস্কারের প্রয়োজন, তবে তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ করবার নির্দেশ দিয়ে পুকুর মালিক বা তার ওয়ারিশগণের উপর নোটিশ ইস্যু করবেন। যদি নোটিশ জারির ৬ মাসের মধ্যে উক্ত উন্নয়নমূলক কাজ করা না হয়, তবে কালেক্টর নিজেই উক্ত উন্নয়নমূলক কাজ করবেন অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তা করতে ক্ষমতা প্রদান করবেন।

১৬. অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির সকল প্রকার বিরোধ সরকার কর্তৃক নিস্পত্তি করা হবে।

১৭. এ আইনের আওতায় গৃহীত কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি আদালতে অভিযোগ করা যাবে না।

মৎস্য ক্ষেত্র (Fishery) : মৎস্য ক্ষেত্র বা ফিশারি বলতে কোনো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, খোলা বা বন্ধ, প্রবহমান বা স্থির জলাশয়কে বুঝাবে, যেমন- নদী, হাওড়, বাঁওড়, বিল, প্লাবনভূমি, খাল ইত্যাদি যেখানে মাছ বড় করার কর্মকাণ্ড অথবা মাছ বা জীবিত প্রাণীর সংরক্ষণ, উন্নয়ন, প্রদর্শন, প্রজনন সম্পূর্ণ করা হয়, তবে মাছের কৃত্রিম অ্যাকোয়েরিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত পুকুর বা চৌবাচ্চা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না ।

অনুশীলনী-১৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জলজ জীববৈচিত্র্য বলতে কী বুঝ?
২. ফিক্সড ইঞ্জিন বলতে কী বুঝ?
৩. সংরক্ষণ আইনে কোন সময়ে ২৩ সেন্টিমিটার এর নিচের আকৃতির কার্পজাতীয় মাছ ধরা নিষিদ্ধ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের নাম লেখ।
২. মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর প্রধান প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩. মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে ফিশারি বলতে কী বুঝায়?
৪. মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কে কে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জলজ জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মানবসৃষ্ট কারণ সমূহ বর্ণনা কর।
২. মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
৩. মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন অমান্যকারীদের জন্য কী শাস্তির বিধান প্রচলিত রয়েছে?

সপ্তদশ অধ্যায়

মাছ চাষকালে উদ্ভূত সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান

মাছ চাষকালে ব্যবস্থাপনাগত বা প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায়। এসব সমস্যার কারণ অধিকাংশই চাষি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন না। মাঠ পর্যায়ে প্রায়শ উদ্ভব হয় এমন প্রধান প্রধান সমস্যা এবং সেগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান নিচে দেয়া হলো।

প্রধান প্রধান সমস্যা

১. অক্সিজেনের অভাবে মাছের খাবি খাওয়া;
২. পানি ঘোলা থাকা;
৩. পানির উপর সবুজ শ্যাওলার স্তর পড়া;
৪. পানির উপর লাল স্তর এবং
৫. পুকুরের পানি দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

১. অক্সিজেনের অভাবে মাছের খাবি খাওয়া : মাছ পানি থেকে ফুলকার সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। কোনো কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে বেশি অক্সিজেন পাওয়ার জন্য মাছ পানির উপরিতলে চলে আসে এবং জীবন বাঁচানোর তাগিদে উপরিতলের পানি-বায়ুর সংযোগস্থলে বার বার মুখ হা এবং বন্ধ করে অক্সিজেন গ্রহণের চেষ্টা করে। একে মাছের খাবি খাওয়া বলে। বিভিন্ন কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। যেমন- পুকুরে বেশি সার প্রয়োগ, পুকুরের তলায় প্রচুর জৈব তলানি, বেশি পরিমাণে পোনা মজুদ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা দীর্ঘ সময় পুকুরের পানিতে রোদ না পড়লে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। এ সময় পুকুরের মাছ ভেসে উঠে খাবি খায় এবং পুকুরের শামুক ঝিনুক কিনারায় এসে জমা হয়। সাধারণত ভোর রাতে অক্সিজেনের তীব্র সংকট দেখা দেয়। অক্সিজেনের তীব্র সংকট এবং এটা দীর্ঘস্থায়ী হলে মাছ ব্যাপক হারে মরতে শুরু করে। অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা গেলে মৃত মাছের মুখ হা করে থাকে এবং ফুলকা ফেটে যায়। অবশ্য অক্সিজেনের অভাব বেশি তীব্র না হলে সকালে সূর্য ওঠার পর ক্রমে মাছ খাবি খাওয়া বন্ধ করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৫ মিলিগ্রাম/লিটার।

অক্সিজেনের অভাব দূর করার উপায়

- অক্সিজেনের অভাবে মাছ খাবি খেতে থাকলে বাঁশ পিটিয়ে অথবা সাঁতার কেটে পানির উপরের স্তর আন্দোলিত করে দিতে পারলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- এয়ারেটর স্থাপন, পুকুরে শ্যালো-পাম্প বসিয়ে পাম্প করে পানি পুকুরে ছড়িয়ে দিয়ে বা পাতিল দিয়ে পুকুরে ঢেউ সৃষ্টি করে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- পুকুরে নতুন পানি সরবরাহ করে খাবি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসেবে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করে হড়রা টেনে দিলে তলার বিষাক্ত গ্যাস দূরীভূত হবে। এতে পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতার আশংকা অনেক কমে যাবে। তবে চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য নিয়ম মাফিক সার প্রয়োগ করতে হবে।
- যেসব পুকুরে মাছ ঘন ঘন খাবি খায় সেগুলোতে শতাংশপ্রতি ২০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ সার পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে মাছ খাবি খাওয়ার হার কমে যায়। এ পদ্ধতিটি স্থানীয়ভাবে বহুল ব্যবহৃত।

২. পুকুরের পানি সর্বদা ঘোলা থাকা : মাটির ভৌত-রাসায়নিক প্রকৃতির কারণে পুকুরের পানি ঘোলা থাকে। সাধারণত লাল মাটি বা এঁটেল মাটির পুকুরের পানিতে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়। এ ছাড়াও উদ্ভিদ বা প্রানী প্ল্যাঙ্কটনের আধিক্যের কারণেও পুকুরের পানি ঘোলা হয়ে থাকে। ঘোলাত্বের কারণে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে পানির গভীরে কার্যকর সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। এতে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন তথা সবুজ খাদ্য কণিকার উৎপাদন কম হয়। এছাড়াও পানি ঘোলা থাকার কারণে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মাছের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন মাছ ঘোলা পানিতে বসবাস করলে ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী পদার্থ মাছের ফুলকায় জমে যায় এবং এক সময় ফুলকায় পচন ধরে। ফলে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্ন ঘটে। পরিশেষে মাছ মারা যায়।

ঘোলাত্ব প্রতিকারের উপায়

- স্বাভাবিক গভীরতায় ১০ কেজি/একর হিসেবে জিয়োলাইট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শতাংশপ্রতি ১-২ কেজি চুন বা একই মাত্রায় জিপসাম ঘোলাত্ব না কমা পর্যন্ত ১-২ মাস অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।
- নিয়মিত গোবর ব্যবহার করলে স্থায়ী ঘোলাত্ব দূর হয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি দৈনিক ১৫০-২০০ গ্রাম হারে গোবর পানিতে গুলে সারা পুকুরে ঘোলাত্ব না কমা পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনজনিত ঘোলাত্ব সৃষ্টি হলে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা প্ল্যাংকটন ভোজী মাছের সংখ্যা বাড়িয়ে জৈবিক পদ্ধতিতে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। পানি পরিবর্তন সম্ভব না হলে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে অথবা সপ্তাহে ১ দিন সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে,
- পুকুর পাড়ের নিকটবর্তী কোণার দিকে পানিতে শতাংশপ্রতি ২/৩টি খড়ের চিকন আটি বেঁধে রেখে দিয়ে পলিঘটিত ঘোলাত্ব অনেকাংশে কমানো যায়। এছাড়াও কলার পাতা পুকুরের পানিতে পরিমাণমতো রাখলে পাতায় পলি জমে এবং খুব সাবধানে এ পাতা তুলে ফেললে পানির ঘোলাত্ব অনেকটা কমে যায়,
- পুকুরের কোনায় একটি নির্দিষ্ট অংশে বানা দিয়ে কিছু কচুরিপানা অল্প কয়েক দিনের জন্য রেখে দিলে কচুরি পানার মূলে ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী পদার্থ জমে যায় এবং পুকুরের পানির ঘোলাত্ব কমে যায়।
- নতুন খননকৃত পুকুরের ক্ষেত্রে পাড়ের ঢালে দূর্বা ঘাস না থাকলেও এ ধরনের সমস্যা আসতে পারে। তাই পাড়ে দূর্বা ঘাস লাগিয়ে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।
- শতাংশপ্রতি ১ ফুট গভীরতার জন্য ১০০ গ্রাম হারে পটাশ অ্যালাম বা ফিটকিরি ব্যবহার করেও পানির ঘোলাত্ব কমানো যেতে পারে। তবে এটা যেহেতু পানির উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয় তাই এর ব্যবহার না করাই উত্তম।

৩ . পানির উপর সবুজ স্তর : পুকুরে অতিরিক্ত প্ল্যাংকটন বিশেষ করে ফাইটোপ্ল্যাংকটন জন্মানোর জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়। এ অবস্থায় বেশি দিন থাকলে প্ল্যাংকটন মরে এবং পচে গিয়ে পানির উপর সবুজ স্তর তৈরি হয়। এক সময় এগুলো পচে দুর্গন্ধ বের হয় এবং পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। পানিতে শ্যাওলার এই আধিক্য কে ব্লুম (Bloom) বলে।

শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণের উপায়

- পুকুরে শতাংশপ্রতি ০.৫-১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে। মাছের খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে।
- উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনভোজী মাছ, যেমন- সিলভার কার্প, সরপুঁটি ইত্যাদি অধিক সংখ্যক পুকুরে ছেড়ে পুকুরের সবুজ স্তর জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত শ্যাওলার ঘনত্বে শতাংশপ্রতি ১০-১২ গ্রাম তুঁতে (কপার সালফেট) কয়েক ভাগ করে পানির উপরি স্তর থেকে ১০-১৫ সে.মি. নিচে কাপড়ের পোঁটলায় বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হবে। এতে পোঁটলার তুঁতে গলে পানিতে মিশে ২-৩ দিনের মধ্যে শ্যাওলা দূর হয়ে যাবে।

৪. পানির উপর লাল স্তর : পানিতে ইউগ্লিনা জাতীয় এক ধরনের প্ল্যাংকটনের আধিক্য বেশি থাকলে অথবা পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকলে অথবা পুকুরে যদি অতিরিক্ত পচা কাদা থাকে তাহলে পানির উপর লাল সরের মত স্তর তৈরি হয়। এ ধরনের স্তর রোদের সময় লাল রং ধারণ করে। রোদ না থাকলে অথবা সকালের দিকে ধূসর বা সবুজাভ দেখায়। পুকুরে এ রকম লাল স্তর সৃষ্টি হলে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয় ও অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়। তাই পুকুরের পানিতে লাল স্তরের সৃষ্টি হলে তা তুলে ফেলতে হবে বা অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

লাল স্তর দূরীকরণের উপায়

- ধানের খড় অথবা শুকনা কলাপাতা পেঁচিয়ে দড়ি বানিয়ে ঐ দড়ি ভাসমান অবস্থায় পানির উপর দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে লাল স্তর একত্র করে এক জায়গায় এনে সহজেই স্কুপ নেট বা হাত জাল দিয়ে তুলে ফেলা যায়।
- বাতাস প্রবাহের ফলে পুকুরের এক পাশে লাল স্তর জমলে এর উপর ইউরিয়া সারের ঘন দ্রবণ স্প্রে করে লাল স্তর দূরীভূত করা যায়।
- অল্প পরিমাণ পানিতে কিছু চুন ভিজিয়ে গরম অবস্থায় লাল স্তরের উপর ছিটিয়ে দিলে লাল স্তর দূরীভূত হয়।
- শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম পটাশ অ্যালাম বা ফিটকিরি পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- কপার সালফেট বা তুঁতে প্রয়োগ করেও শ্যাওলা জাতীয় লাল স্তর দমন করা যায়। প্রতি শতাংশে ৫-১০ গ্রাম পরিমাণে তুঁতে ছোট ছোট পুঁটলিতে বেঁধে সুতলির সাহায্যে তিন ফুট দূরে দূরে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এই পুঁটলির মালা ভাসমান অবস্থায় পানির উপরের স্তর দিয়ে আস্তে আস্তে ১-২ বার পুকুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টানলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- চট জাল বা পাতলা কাপড় দিয়ে মাছ ধরার জালের মতো টেনে লাল স্তর তুলে ফেলা যায়।
- ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জলায়তনে ১-২ কেজি রসুন ভালোভাবে থেঁতলে সকালে বা বিকেলে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে ১-২ দিনের মধ্যে লাল স্তর দূর হয়ে যায়।

৫. পুকুরের পানি কমে যাওয়া : কোনো কোনো এলাকার পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা কম। ফলে পুকুরে বেশি দিন মাছচাষ উপযোগী পানি থাকে না। যেসব এলাকার মাটি বেলে প্রকৃতির এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে ঐসব এলাকার পুকুরে এ সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্র এলাকার পুকুরে এ ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। ফলে এসব এলাকার পুকুরে সারা বছর মাছচাষ করা যায় না। অনেক সময় পুকুরের পাশে নদী থাকলেও নদীতে পানি কমে গেলে পুকুরে পানি কমে যায়।

পুকুরের পানি চুয়ানো বন্ধের উপায়

- পানি চুয়ানো বন্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ধানের তুষ বা ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পুকুরে অধিক পরিমাণ গোবর, কম্পোস্ট ইত্যাদি জৈব সার দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে পুকুরের মাটির আন্তঃছিদ্র পথ বন্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে পানি চুয়ানো বন্ধ হয়ে যায় ও
- পুকুর পাড়ে ২ ফুট প্রস্থ তলদেশ বরাবর গর্ত করে তার মধ্য দিয়ে পলিথিন শিট বিছিয়ে পুনরায় মাটি চাপা এবং দুরমুজ করে মাটি শক্ত করে দিতে হবে। এভাবে পানি চুয়ানো বন্ধ করা যেতে পারে। নতুন পুকুরের ক্ষেত্রে এই কৌশল প্রযোজ্য। পুরাতন পুকুরের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ততটা গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুশীলনী-১৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছ খাবি খায় কে?
২. অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা গেলে কিভাবে বুঝা যায়?
৩. পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কোন সময় সবচেয়ে কম থাকে?
৪. পুকুরের পানি কেন ঘোলা থাকে?
৫. পানি ঘোলা থাকলে কী ধরনের অসুবিধা হয়?
৬. ঘোলাত্ব দূর করার জন্য শতাংশপ্রতি কতটুকু চুন দেয়া দরকার?
৭. ঘোলাত্ব দূর করার জন্য ব্যবহৃত গোবর সারের মাত্রা কত?
৮. পুকুরের তলায় সৃষ্টি হয় এমন একটি গ্যাসের নাম লেখ।
৯. পুকুরে গ্যাস সৃষ্টি হলে মাছ চাষে কী ধরনের অসুবিধা হয়?
১০. কীভাবে সহজে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূর করা যায়?
১২. পানির উপর সবুজ স্তর সৃষ্টি হলে মাছচাষে কী অসুবিধা হয়?
১৩. সবুজ স্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য কী মাত্রায় তুঁতে ব্যবহার করতে হবে?
১৪. কোন মাছ ছেড়ে পুকুরের সবুজ স্তর নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
১৫. পানিতে লাল স্তর থাকলে মাছচাষে কী অসুবিধা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাছ চাষকালে উদ্ভব হয় এমন ২টি সমস্যার নাম লেখ।
২. পানিতে কেন দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়?
৩. পুকুরের পানির ঘোলাত্ব নিবারণের দুইটি পদ্ধতির নাম লেখ।
৪. পুকুরের তলদেশে কেন গ্যাস সৃষ্টি হয়? গ্যাস হলে মাছ চাষের কী কী অসুবিধা হয়?
৫. পানিতে লাল স্তর কেন হয় ? মাছচাষে এর প্রভাব বর্ণনা কর।
৬. লাল স্তর নিয়ন্ত্রণে কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
৭. পুকুরের পানি কী কী কারণে দ্রুত শুকিয়ে যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুকুরে মাছ খাবি খায় কেন? এ সমস্যা প্রতিকারের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
২. কী কী কারণে মাছের বৃদ্ধি কম হয়? পুকুরের গ্যাস নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি আলোচনা কর।
৩. পুকুরের পানির ঘোলাত্ব দূরকরণের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
৪. পুকুরে কেন সবুজ স্তর তৈরি হয়? মাছচাষে এর প্রভাব কী?

ব্যবহারিক

জব নং- ১ : মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা শনাক্তকরণ ও এর চাষ পদ্ধতি অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

তেলাপিয়া মাছ ঘন ঘন প্রজনন করে। একটি পূর্ণ বয়স্ক তেলাপিয়া বছরে ৩ বারেরও অধিক বার প্রজনন করে থাকে। ফলে চাষকৃত পুকুরে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটে থাকে। পরিণতিতে খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়ে তেলাপিয়ার মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। ফলে বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয় ও উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার পোনা দেয়া ও পোনা লালন পালনে স্ত্রী তেলাপিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কারণে স্ত্রী তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার পুরুষ তেলাপিয়ার চেয়ে অনেক কম। তেলাপিয়ার এই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রজনন ঠেকানোর জন্য স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়া শনাক্তকরণ বা মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা শনাক্তকরণ প্রয়োজন।

উপকরণ

১. তেলাপিয়ার পোনা (প্রতিটি ৩৫-৪০ গ্রাম)
২. স্কুপ নেট
৩. ট্রে
৪. হাপা

কাজের ধারা

পোনা শনাক্তকরণের জন্য ৩৫-৪০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া পোনা সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত অঙ্গসমূহ বা দেহের বর্ণ পর্যবেক্ষণ করে স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়া শনাক্ত করা যেতে পারে।

পুরুষ তেলাপিয়া	স্ত্রী তেলাপিয়া
পুরুষ তেলাপিয়ার জননেন্দ্রীয় ২ ছিদ্র বিশিষ্ট, সাদা ও লম্বাটে।	স্ত্রী তেলাপিয়ার জননেন্দ্রীয় ৩ ছিদ্র বিশিষ্ট, খাটো ও লালচে রঙের।
প্রজননকালে এ ক্ষেত্রে গলার অংশের বর্ণ লালচে দেখায়।	এক্ষেত্রে ততটা লালচে বর্ণ দেখা যায় না। কিছুটা হলদেটে ভাব দেখায়।
পুরুষ মাছের রং উজ্জ্বল হয়।	স্ত্রী মাছের রং অনুজ্জ্বল হয়।

এভাবে সংগৃহীত মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়া চাষের জন্য পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে।

চিত্র-২৯ : মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা

জব নং- ২ থাই পাঙ্গাশের পোনা শনাক্তকরণ ও এর চাষ পদ্ধতি অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ক্যাট ফিশ (Cat fish)-জাতীয় মাছের মধ্যে থাই-পাঙ্গাশ অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। শক্ত গড়ন, প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচতে সক্ষম। যেকোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। থাই-পাঙ্গাশ সুস্বাদু ও বাজারে সহজলভ্য। নিচে থাই পাঙ্গাশ মাছের পোনা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যাবলি দেয়া হলো।

পোনা শনাক্তকরণ উপকরণ

১. পাঙ্গাশ মাছের পোনা
২. প্লাস্টিকের গামলা
৩. স্কুপনেট
৪. ট্রে
৫. ফোরসেপ
৬. খাতা ও পেন্সিল
৭. বালতি

পোনা শনাক্তকরণে কাজের ধারা

- থাই পাঙ্গাশ মাছের পোনার পিঠের দিকটা কালচে রঙের এবং পেটের দিক উজ্জ্বল সাদা রঙের হয়ে থাকে।
- এদের পৃষ্ঠদেশে ১টি এবং বক্ষ পাখনায় (Pectoral fin) ২টি ধারালো খাঁজ কাঁটা শক্ত কাঁটা বিদ্যমান।
- পৃষ্ঠদেশের পিছনে নরম, মাংসল এবং তৈলাক্ত একটি অঙ্গ বিদ্যমান থাকে যা Adipose ভরহ বলে পরিচিত; এটি Cat fish-জাতীয় মাছের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- এদের দেহে কোনো আঁইশ থাকে না।

শনাক্তকরণ- ইহা পাঙ্গাশের পোনা

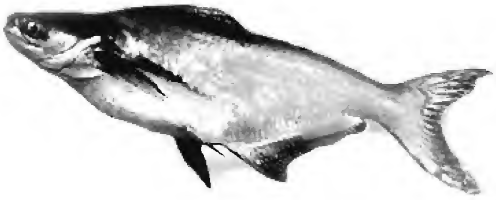

চিত্র-৩০ঃ পাঙ্গাশের পোনা

জব নং- ৩ থাই কৈ মাছের পোনা শনাক্তকরণ ও এর চাষ পদ্ধতি অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

দেশি ছোট মাছগুলোর মধ্যে কৈ মাছ অন্যতম। এক সময়ে ধানক্ষেত, বিল ও হাওড়ে প্রচুর পরিমাণে দেশি কৈ মাছ পাওয়া যেত বর্তমানে যা আর পাওয়া যায় না। তাই সম্প্রতি আমাদের দেশে দেশি কৈ মাছের অভাব পূরণের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড থেকে দ্রুত বর্ধনশীল যে কৈ মাছ আনা হয়েছে তা থাই কৈ নামে পরিচিত।

পোনা শনাক্তকরণ উপকরণ

১. ক�ৈ মাছের পোনা
২. প্লাস্টিকের গামলা
৩. স্কুপনেট
৪. ট্রে
৫. ফোরসেপ
৬. খাতা ও পেন্সিল
৭. বালতি

কাজের ধারা

- বাজার থেকে কৈ মাছ সাবধানে বালতিতে করে নিয়ে আসি।
- সংগৃহিত কৈ মাছকে ট্রেতে স্থাপন করে দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি।
- দেহের বর্ণ হালকা ফ্যাকাসে।
- দেহ মাংসল এবং চওড়া।
- দেহের উপরিভাগে ছোট ছোট কালো দাগ বিদ্যমান।
- পাখনা হালকা হলুদ রঙের।
- কানকোর পিছনে ও পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ বিদ্যমান।
- মুখ প্রশস্ত এবং ইউ (U) আকৃতির।
- কানকোর কাঁটা তুলনামূলক নরম ও খাঁচ কাটা এবং অঙ্কীয় দিকে আঁইশের সজ্জা ভি (V) আকৃতির।

শনাক্তকরণ : এটি থাই কৈ মাছের পোনা।

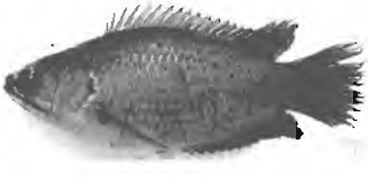

চিত্র-৩১ ঃ থাই কৈ মাছের পোনা

জব নং- ৪ ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা শনাক্তকরণ ও এর চাষ পদ্ধতি অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

আমাদের দেশে সাধারণত ৩ ধরনের কৈ মাছ পাওয়া যায়, যেমন-দেশি, থাই এবং ভিয়েতনাম কৈ। পুকুরে দেশি কৈ মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না। সে কারণে থাইল্যান্ড থেকে ২০০২ সালে থাই কৈ আমাদের দেশে আনা। এ মাছটি দ্রুত বর্ধনশীল হলেও নানাবিধ কারণে এর দ্রুত বর্ধনশীল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এছাড়া ফ্যাকাশে বর্ণের কারণে বাজারমূল্যও কম।

সমস্যা উত্তোরণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে আমাদের দেশে ভিয়েতনাম কৈ আমদানি করা হয়। গবেষণালব্ধ-ফল থেকে দেখা যায়, ভিয়েতনাম কৈ মাছ থাই কৈ অপেক্ষা প্রায় ৬০% বেশি উৎপাদনশীল। ভিয়েতনাম কৈ এর রং ও স্বাদ অনেকটাই দেশি কৈ -এর মতো এ কারণে খুব দ্রুত এ মাছটি চাষিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ফলে চাষের ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা শনাক্তকরণের উপকরণ

১. কৈ মাছের পোনা (দেশি,থাই,ভিয়েতনাম)
২. প্লাস্টিকের গামলা
৩. স্কুপনেট
৪. ট্রে
৫. ফোরসেপ
৬. খাতা ও পেন্সিল
৭. বালতি

কাজের ধারা

- বাজার থেকে কৈ মাছ সাবধানে বালতিতে করে নিয়ে আসি।
- সংগৃহীত কৈ মাছকে ট্রেতে স্থাপন করে দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি।
- দেহ মাংসল এবং চওড়া ধরনের।
- মাছের শরীরে কোনো ফোঁটা দাগ দেখা যায় না।
- পাখনা হালকা হলুদ রঙের।
- কানকোর পিছনে ও পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় কালো দাগ বিদ্যমান।

শনাক্তকরণ : এটি ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা।

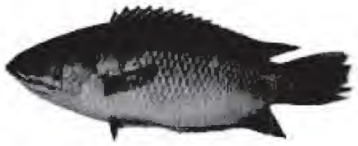

চিত্র-৩২ : ভিয়েতনাম কৈ মাছের পোনা

জব নং- ৫ শিং মাছের পোনা শনাক্তকরণ ও এর চাষ পদ্ধতি অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

শিং মাছ একটি জনপ্রিয় জিওল মাছ। পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ ভরাট ও পানিশূন্য হওয়ায় এ মাছ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া শিং মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এ মাছ সহজেই হাজা-মজা বা ভালো পুকুরে এককভাবে বা অন্যান্য চাষযোগ্য প্রজাতির সাথে মিশ্রচাষ করা যায়। নিচে শিং মাছের পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো–

শিং মাছের পোনা শনাক্তকরণের উপকরণ

১. শিং মাছের পোনা
২. প্লাস্টিকের গামলা
৩. স্কুপনেট
৪. ট্রে
৫. ফোরসেপ
৬. খাতা ও পেন্সিল
৭. বালতি

পোনা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

- সরবরাহকৃত মাছের দেহ লম্বা, সামনের দিক নলাকার, পিছনের দিক চাপা।
- দেহ আঁইশবিহীন,মাথা উপরে-নিচে চ্যাপ্টা।
- দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালছে।
- মুখে ৪ জোড়া গোঁফ বা বার্বেল বিদ্যমান।
- মাছের পিঠের দিকটা কালচে রঙের এবং পেটের দিক উজ্জ্বল সাদা রঙের।
- পৃষ্ঠদেশে ১টি এবং বক্ষ পাখনায় ২টি ধারালো খাঁজ কাঁটা বিষাক্ত শক্ত কাঁটা বিদ্যমান।
- পৃষ্ঠ পাখনা ছোট গোলাকৃতি, পায়ু পাখনা বেশ লম্বা এবং পুচ্ছ পাখনা গোলাকৃতির।

শনাক্তকরণ : এটা শিং মাছের পোনা।

চিত্র-৩৩ : শিং মাছের পোনা

জব নং- ৬ মাগুর মাছের পোনা শনাক্তকরণ ও এর চাষ পদ্ধতি অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাগুর মাছ আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় জিওল মাছ। পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ ভরাট ও পানিশূন্য হওয়ায় এ মাছ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া মাগুর মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এ মাছ সহজেই হাজা-মজা বা ভালো পুকুরে এককভাবে বা অন্যান্য চাষযোগ্য প্রজাতির সাথে মিশ্রচাষ করা যায়। নিচে মাগুর মাছের পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো–

মাগুর মাছের পোনা শনাক্তকরণের উপকরণ

১. মাগুর মাছের পোনা
২. প্লাস্টিকের গামলা
৩. স্কুপনেট
৪. ট্রে
৫. ফোরসেপ
৬. খাতা ও পেন্সিল
৭. বালতি

পোনা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

- সরবরাহকৃত মাছের দেহ লম্বা।
- দেহ আঁইশবিহীন, মাথা বেশ চ্যাপ্টা, মুখ প্রশস্ত।
- দেহের রং লালচে বাদামি বা ধূসর কালো।
- মুখে ৪ জোড়া গোঁফ বা বার্বেল বিদ্যমান।
- মাছের পিঠের দিকটা কালচে রঙের এবং পেটের দিক উজ্জ্বল সাদা রঙের।
- বক্ষ পাখনায় ২টি ধারালো খাঁজ কাঁটা শক্ত কাঁটা বিদ্যমান।
- পৃষ্ঠ পাখনা ও পায়ু পাখনা বেশ লম্বা এবং লেজের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
- পুচ্ছ পাখনা বা লেজের অংশ চাপা ও গোলাকৃতি।

শনাক্তকরণ ঃ এটা মাগুর মাছের পোনা।

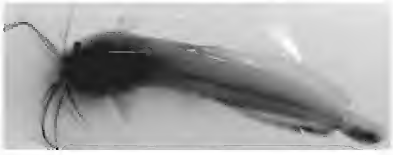

চিত্র-৩৪ ঃ মাগুর মাছের পোনা

জব নং-৭ খাঁচা তৈরিকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

আমাদের দেশে অসংখ্য নদ-নদী ও মুক্ত জলাশয় রয়েছে। যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মাছচাষ করা সম্ভব নয়। বর্ষা মৌসুমে বিশাল এলাকা বন্যাকবলিত হয় এবং ৪-৬ মাস পর্যন্ত পানি থাকে। এসব জলাশয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে খুব কম পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়। একটু চেষ্টা করলে এ ধরনের জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ করা যায়। আবার অনেকের মাছ চাষের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পুকুর বা জলাশয় না থাকার কারণে মাছচাষ করতে পারে না। অথচ বাড়ির পাশে যদি একটি প্রবহমান নদী থাকে তাহলে সে ইচ্ছা করলে খাঁচায় মাছচাষ করতে পারে।

খাঁচা তৈরির উপকরণ

১. নাইলন, টায়ার কর্ড বা পলিথিনের জাল (৩/৪ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি);
২. খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরির জাল;
৩. খাঁচার তলায় ট্রে হিসেবে ব্যবহার করার জাল;
৪. নাইলনের রশি;
৫. ১ ইঞ্চি জিআই পাইপ/৩ সুতা রড;
৬. ফ্লোট হিসেবে ব্যবহৃত ব্যারেল বা ড্রাম;
৭. অ্যাংকর বা গেরাপি

কাজের ধারা

- প্রথমে ১ ইঞ্চি জিআই পাইপ দ্বারা আয়তাকার (২০ ফুট x ১০ ফুট) ফ্রেম তৈরি করা হয়। মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে দেয়া হয়।
- অতঃপর দুই ফ্রেমের মাঝে ৩টি ড্রাম সারিবদ্ধ ভাবে স্থাপন করা হয়।
- এরপরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরাপি অথবা নোঙর দ্বারা খাঁচাগুলোর ড্রামগুলো নির্দিষ্ট স্থানে আটকানো হয়।
- অতঃপর প্রতিটি ফ্রেমের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বে তৈরিকৃত জাল সেট করা হয় এবং রশির সাহায্যে ফ্রেমের সাথে বেঁধে দেয়া হয়।
- অতঃপর খাঁচা তৈরির পরে শ্যাওলা জমার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করে পরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মজুদ করা হয়।
- পরিশেষে ব্যবহারিক খাতায় অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করি।

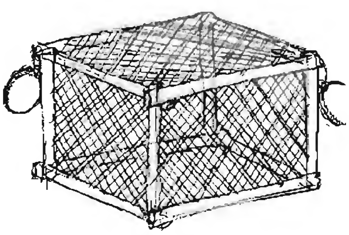

চিত্র-৩৫ : খাঁচা তৈরিকরণ

জব নং- ৮ পেন তৈরিকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কোনো উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক থেকে বাঁশ, বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোনো উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত ঘেরের মধ্যে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন বা ঘেরে মাছচাষ বলে। এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদের যেমন- সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তেমনি বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য পেনে মাছ চাষের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

পেন তৈরির উপকরণ

১. বাঁশ বা গাছের লম্বা, সোজা ডাল
২. মুলি বাঁশের ধারী বা চাটাই
৩. টায়ার কর্ড বা গিট বিহীন পলিথিন জাল (ফাঁস ১০ মি. মি.)
৪. দা
৫. মুগুড়
৬. কোদাল
৭. টুকরি
৮. পেরেক
৯. হাতুড়ি
১০. নারিকেলের কয়ের বা সিনথেটিক রশি
১১. জি আই তার

কাজের ধারা

১. বছরে ৬-৮ মাস পেনে মাছচাষ উপযোগী পানি থাকে এমন একটি জলাশয় নির্বাচন করি।
২. অতঃপর পেন তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে জলাশয়ের সন্নিকটে যাই।
৩. সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করে পানির সম্ভাব্য গভীরতার উপর ভিত্তি তরে সেই অনুযায়ী বাঁশ/গাছের ডাল ১০-১৫ ফুট অন্তর অন্তর সারিবদ্ধভাবে পুঁতে দেই।
৪. অতঃপর খুঁটির সাথে জিআই তার দিয়ে মুলি বাঁশের বেড়া বা চাটাই আটকে দেই। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে বেড়ার তলদেশে যেন কোনো ফাঁকা স্থান না থাকে।
৫. এরপর বেড়ার সাথে গিঁটবিহীন জাল খুব ভালোভাবে আটকে দেই।
৬. অতঃপর বর্ষা মৌসুমের পানির জন্য অপেক্ষা করি। পানি আসার পরে ঘের প্রস্তুত করে ঘেরে পোনা মজুদ করি।
৭. ব্যবহারিক খাতায় অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করি।

চিত্র-৩৬ : পেনে মাছচাষ

জব নং- ৯ অ্যাকোয়েরিয়ামে পালন যোগ্য বিভিন্ন প্রজাতির বাহারি মাছ শনাক্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

সৌন্দর্য বোধের কথাটি মাথায় রেখেই মাছের প্রজাতি নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা হয়, তাই দেশী-বিদেশী বাহারি রঙে শোভিত চকচকে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মাছ গুলিই অ্যাকোয়েরিয়ামে স্থান করে নিয়েছে। নিম্নে এমন সংখ্যক কিছু দেশী এবং বিদেশী মাছের নাম দেয়া হলো।

দেশী মাছ	বিদেশী মাছ
খলিসা, পুঁটি, গুতুম, বউ বা রানী মাছ, বাইম, বেলে, চিংড়ি, পটকা, শিং, মাগুর, কৈ ইত্যাদি।	সোর্ড টেইল, অ্যানজেল,গোরামী, ব্ল্যাক মলি, গোল্ড ফিস, সার্ক, জেব্রাফিস, রেইনবো, গাপ্পি, ফাইটিং ফিস ইত্যাদি।

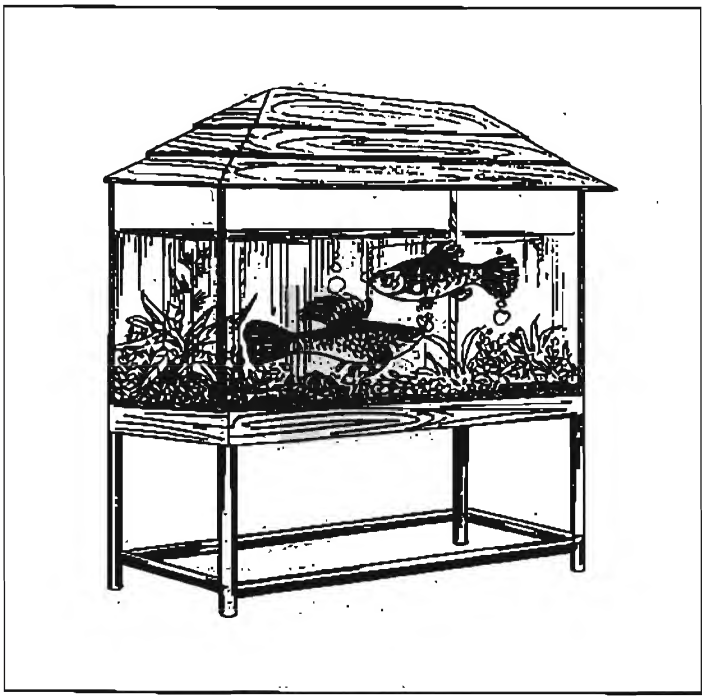

চিত্র-৩৭ : অ্যাকোয়েরিয়াম ও পালনযোগ্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছ

জব নং-১০ অ্যাকোয়েরিয়াম তৈরিকরণ এবং সাজানো।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অ্যাকোয়েরিয়াম হচ্ছে কাঁচ ও কাঠের তৈরি কৃত্রিম জলাধার যেখানে বিভিন্ন ধরনের বর্ণালি মাছ প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে লালন করা হয়। বর্তমানে অ্যাকোয়েরিয়াম শুধুমাত্র শখের বিষয়বস্তুই নয়। এটা জীবন ও জীবিকা নির্বাহের অবলম্বনও হতে পারে। অ্যাকোয়েরিয়াম তৈরির সকল উপকরণ সরাসরি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় অথবা মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করেও নেয়া যায়।

উপকরণ ঃ ১. কাঁচ- ৫-৬ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট স্বচ্ছ কাঁচ ৫ খণ্ড 4'x2' মাপের - ১টি, 4'x১.৫' মাপের - ২টি ও ২'x১.৫' মাপের - ২টি

২. ১' চওড়া লোহার এঙ্গেল বার ৪টি ৪' দৈর্ঘ্যের - ২টি, ২' দৈর্ঘ্যের - ২টি

৩. কাচ জোড়া লাগানোর আঠা

৪. ১" ব্যাসের ২.৫' দৈর্ঘ্যের জিআই পাইপ ৪টি

৫. পরিমাণ মতো লোহার চিকন রড

৬. ৬" পাস বিশিষ্ট কেরোসিন কাঠ

৭. ২ ফুট দৈর্ঘ্যের ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট ১টি

৮. সাদা এনামেল পেইন্ট ১ কৌটা (ছোট)

৯. নুড়ি পাথর, কোরাল, ঝিনুক

১০. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলজ উদ্ভিদ

১১. এরেটর, ডুবুরী, ছিদ্রযুক্ত পাথর

১২. ওয়েল্ডিং মেশিন, করাত, হাতুড়ি, বাটাল, রানদা, হ্যাকস ব্লেড, পেরেক (১ ইঞ্চি)

কাজের ধারা

১. ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট প্রস্থ এবং ১.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অ্যাকোয়েরিয়াম তৈরির জন্য বাজার হতে ৫-৬ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট নির্দিষ্ট মাপের ৫ খন্ড স্বচ্ছ কাঁচ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত কাচগুলো মাপ অনুযায়ী কাঁচ জোড়া লাগানো আঠা দিয়ে জোড়া লাগাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এক্ষেত্রে ৪'x২' মাপের কাচটি যেন তলায় স্থাপন করা হয়।

২. এবার সংগৃহীত জিআই পাইপ দিয়ে ওয়েল্ডিং মেশিনের সাহাযে ২.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অ্যাকোয়েরিয়ামের মাপ অনুযায়ী স্ট্যান্ড তৈরি করতে হবে ।

৩. অতঃপর ১২ ইঞ্চি পুরুত্ব বিশিষ্ট ৬" পাশের কেরোসিন কাঠ করাত দিয়ে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কেটে রানদা দিয়ে মসৃণ করতে হবে। অতঃপর ধাপে ধাপে নকশা আকৃতির চৌচালা ঢাকনা তৈরি করতে হবে। ঢাকনার একপাশে অ্যাকোয়েরিয়াম এর মাছকে খাবার দেয়ার এবং অন্যান্য কাজ সম্পাদন করার জন্য উন্মুক্ত করা যায় এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঢাকনার ভিতরের অন্য পাশে ২ ফুট দৈর্ঘ্যের ফ্লোরোসেন্ট টিউব স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মরিচা না পড়ার জন্য এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্ট্যান্ডকে সাদা রং করতে হবে এবং কাঠের ঢাকনির বাহিরের অংশে সাদা রং করতে হবে।

৫. এবার স্ট্যান্ডের উপর কাঁচের তৈরি অ্যাকোয়েরিয়ামটি স্থাপন করে অ্যাকোয়েরিয়ামের তলদেশে ২" পুরুত্ব নুড়ি পাথর বসাতে হবে। এরপর কৃত্রিম জলজ উদ্ভিদ এবং কোরাল, ঝিনুক প্রভৃতি পাথরের উপরে রেখে দিতে হবে। এখন জলাশয়ের প্রাকৃতিক ছবি সম্বলিত, পানি রোধক একটি পেপার অ্যাকোয়েরিয়ামের পিছনে কাচের ভিতরের দিকে লাগিয়ে দিতে হবে। যা অ্যাকোয়েরিয়ামের সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়তা করে। বিদ্যুৎ চালিত একটি এরেটর মেশিন অ্যাকোয়েরিয়ামের বাইরে স্থাপন করতে হবে। এর সঙ্গে একাধিক পাইপের মাধ্যমে ডুবুরি, ছিদ্রযুক্ত পাথর প্রভৃতির সংযোগ স্থাপন করতে হবে। অতঃপর পানিতে অক্সিজেনের জন্য এরেটর চালু করতে হবে। পরিশেষে অ্যাকোয়েরিয়ামের উপর কাঠের ঢাকনাটি লাগাতে হবে।

জব নং- ১১ জাল তৈরির পদ্ধতি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

জাল হলো মাছ ধরার প্রধান উপকরণ। এটি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু দ্বারা তৈরি করা হয়। পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয় হতে মৎস্য আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুতার তৈরি যে সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তাকে জাল বলে। আমাদের দেশে মৎস্য আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। জাল তৈরির সময় জালটি দ্বারা কী ধরনের মাছ ধরা হবে এবং কোথায় তা ব্যবহার করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে জালটির ফাঁস নির্ধারণ করা হয়। আমাদের দেশের জেলেরা প্রায় সকলেই হাতে জাল তৈরি করে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জাল তৈরিতে যেসব উপকরণ প্রয়োজন হয় তা হলো–

১. সুতা
২. নির্দিষ্ট মাপের বাঁশের কাঠি বা চটি
৩. রশি
৪. বিভিন্ন মাপের লোহার ওজন (Beads)

জাল তৈরি ঃ জাল তৈরির সময় প্রথমেই একটি রশি কোনো একটি খুঁটিতে বাঁধতে হবে। অতঃপর রশিটি হতে নির্দিষ্ট আকারের বাঁশের কাঠি নিয়ে নির্দিষ্ট ফাঁস বিশিষ্ট একটি গিঁট দেয়া হয়। অতঃপর ঐ একই মাপেই ঐ কাঠির উপর দিয়ে বার বার ঘুরিয়ে গিঁট দিতে হবে। এভাবে পরপর গিঁট দেওয়ার পর একটি সময় পরে আবার কাঠিটি খুলে নিচের দিকে আর একটি নতুন গিঁট দিয়ে পুনরায় অপর একটি সারি গিট তৈরি করতে হবে। হাতে জাল তৈরির নিয়ম সব জালের ক্ষেত্রেই প্রায়ই একই রকম। তাই নিচে ঝাঁকি জাল তৈরির কৌশল বর্ণনা করা হলো।

প্রথমেই একটি রশি দিয়ে যে ঘরে বা স্থানে বসে জালটি তৈরি করা হবে সে ঘরে বা স্থানে একটি খুঁটিতে রশিটি বেঁধে নিতে হবে। তারপর নাইলন সুতা একটি বাঁশের তৈরি মাকুর মধ্যে পূর্ণ করে ঐ সুতা দ্বারা একটি বাঁশের বা কাঠের তৈরি নির্দিষ্ট মাপের ফাঁস বিশিষ্ট একটি কাঠি বা চটি নিয়ে তার উপর দিয়ে মাকু বা শলাকাটি ঘুরায়ে একটি গিঁট তৈরি করতে হবে। একই নিয়মে আরো অনেকগুলো গিট তৈরি করতে হবে। অতঃপর কাঠি থেকে সুতার গিঁটগুলো খুলে ফেলতে হবে এবং পরে আবার গিঁটের দিকে আরেকটি ফাঁস বাড়ায়ে একই নিয়মে ফাঁস তৈরি করতে হবে। এরূপ নিচের দিকে কয়েকটি সারির ফাঁস বাড়ানোর পর ১টি সারি বরাবর কয়েকটি ফাঁস পর পর ১টি ফাঁস থেকে ২টি ফাঁস তোলা হয় ফলে ঐ সারিতে ফাঁসের সংখ্যা বেড়ে যায়। এভাবে নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পরপর ১টি সারির ১টি ফাঁস থেকে ২টি ফাঁস তৈরি করা হয়। এতে জাল উপরের বা চুড়ার তুলনায় নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে ছড়াতে থাকে। ফলে জালটি গোলাকার আকার ধারণ করে। জালটি যে দৈর্ঘ্যের করা হবে ঐ নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হলে ঐ সারি বরাবর মোটা নাইলন সুতা দিয়ে নিচের দিকে ৩/৪টি সারি ঘর তোলা হয়। এ মোটা সুতার সারিতে পরবর্তী ওজন সম্বলিত সুতাটি বাঁধা হয়। অতঃপর এ সারি থেকে পার্শ্বে ঘর সংখ্যা না বাড়িয়ে নিচের দিকে ২৪ ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে লোহার ছোট ছোট ওজনের কাঠি একটি ঘর পরপর বেঁধে অতঃপর ৭/৮ টি ধাতব ওজন সম্বলিত কাঠি মোটা সুতার সারি বরাবর বেঁধে অনেকগুলো পকেট তৈরি করা হয়। ঐ পকেটগুলোতেই মাছ আহরণ কালে আটকে পড়ে। অতঃপর চুড়ায় একটি লম্বা শক্ত রশি লাগানো হয়। জালটি ব্যবহারের সময় অর্থাৎ জালটি নিক্ষেপ করলে যেন জালটি হাতের নাগাল থেকে চলে না যায় তার জন্য চুড়ায় এ লম্বা নাইলনের রশিটি লাগানো হয়।

সাবধানতা

- জাল তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জালের গিঁটটি ভালোভাবে হয়।
- সুতা যেন পেঁচিয়ে না যায় সে বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে।

জব নং- ১২ গাব দিয়ে জাল সংরক্ষণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অধিকাংশ জেলে তাদের সুতার তৈরি জাল সংরক্ষণ করার জন্য গাব ফলের নির্যাস ব্যবহার করে। আর গাব হলো প্রাকৃতিক রঞ্জক বা সংরক্ষক যা দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতে খরচ কম পড়ে এবং এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা সহজতর।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. গাব
২. সুতার তৈরি জাল
৩. মাটির চারি বা হাফ ড্রাম
৪. পানি

কাজের ধারা

এ পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণ গাব ফলের নির্যাস একটা মাটির পাত্রে নিয়ে তাতে পরিমাণমতো পানি মিশিয়ে নির্যাসকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পাতলা করা হয়। তারপর জালকে উক্ত দ্রবণে ৪-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয় এবং পরে কোনো ছায়াযুক্ত স্থানে শুকানো হয়। এভাবে কয়েকবার ভিজানো এবং শুকানোর পরে জাল কালচে বাদামি রঙে রঞ্জিত হয় এবং এ সময়ে তা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভালো ফল পাওয়ার জন্য জেলেরা জাল কয়েকবার ব্যবহার করার পর তা আবার গাব দিয়ে পুনঃরঞ্জিত করে ব্যবহার করে থাকেন।

জব নং- ১৫ : বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বরফের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ একটি স্বল্পকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বরফ ব্যবহার করে মাছের দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে শূন্য ডিগ্রি কিংবা তার কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়। এতে ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয় ফলে মাছের পচন ক্রিয়া বিলম্বিত হয় তথা মাছের গুণাগুণ ভাল থাকে।

উপকরণ

১. যেকোনো প্রজাতির টাটকা বা তাজা মাছ
২. বরফ
৩. বাঁশের ঝুড়ি
৪. হোগলার মাদুর অথবা চট
৫. রশি

কাজের ধারা

- প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ (ঝুড়ির আকার অনুযায়ী) টাটকা বা তাজা মাছ সংগ্রহ করতে হবে।
- মাছের ওজনের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ গুঁড়া অথবা ব্লক বরফ সংগ্রহ করে ঝুড়িতে বরফ এবং মাছ স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। ঋতু ভেদে মাছ ও বরফের অনুপাত কম বেশি হবে। গ্রীষ্মকালে বরফ এবং মাছের অনুপাত হবে ১ঃ১ এবং শীতকালীন সময়ে বরফ এবং মাছের অনুপাত হবে ১ঃ২।
- যদি ব্লক বরফ হয় তবে ব্যবহারের পূর্বে হাতুড়ি কিংবা কাঠের টুকরার সাহায্যে চটের ব্যাগের মধ্যে রেখে গুঁড়া করে নিতে হবে।
- ঝুড়িটি পরিষ্কার পানিতে ধোয়ার পর প্রথমে ঝুড়ির ভিতরের চারিদিকে চটের একটি আস্তরণ দিতে হবে। অতঃপর ঝুড়ির তলায় ২ ইঞ্চি পুরু বরফের একটি স্তর দিতে হবে।

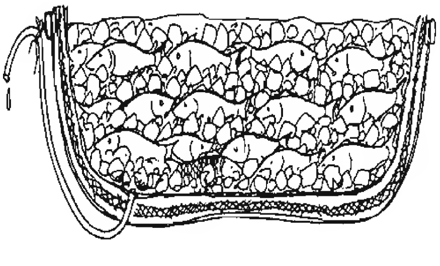

চিত্র-৩৮ : মাছের ঝুড়িতে স্তরে স্তরে বরফ ও মাছ সাজানো

- তারপর এক স্তর মাছ এবং এক স্তর বরফ এভাবে সাজিয়ে ঝুড়ি ভর্তি করতে হবে।
- ঝুড়ি পূর্ণ হবার পর এক স্তর বরফ দিয়ে তার উপর চটের টুকরা দিয়ে চেপে সেলাই করে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।
- দূরবর্তী বাজারে পরিবহনের জন্য মাছসহ ঝুড়ি সরাসরি কিংবা একটি কাঠের বাক্সে ভিতরে রেখে পরিবহন করা যেতে পারে।
- অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

জব নং-১৬ : মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিকরণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন খাদ্য মাছের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের খাদ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। তাই আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়ার জন্য মাছকে সম্পূরক খাদ্য দেয়া হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, ফিশমিল ইত্যাদি,
২. প্লাস্টিকের গামলা ২টি, মগ ১টি,
৩. ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা।

কাজের ধারা

১। এক কেজি খাদ্য তৈরি করার জন্য ৪০০ গ্রাম চালের কুঁড়া, ২০০ গ্রাম গমের ভুসি, ২৫০ গ্রাম সরিষার খৈল ও ১৫০ গ্রাম ফিশমিল ওজন করে পৃথক করে রাখি।

২। সরিষার খৈল ও ফিশমিল দ্বিগুণ পরিমাণ পানিতে একটা গামলায় ১০-১২ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখি।

৩। এবারে ভেজা খৈল ও ফিলমিলের সাথে কুঁড়া ও ভুসি মিশিয়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেশাই।

৪। মিশ্রিত খাদ্যের মন্ড হাতের তালু দিয়ে ছোট ছোট বল আকৃতির বানাই। এসব বল খাদ্যদানি বা ফিডিং ট্রেতে করে পুকুরে প্রয়োগ করি। অতিরিক্ত পরিমাণ বল আকৃতির খাদ্য রোদে শুকিয়ে রেখে ৭ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

৫। গৃহীত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখি। প্রয়োজনীয় ছবি ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করি।

চিত্র-৩৯ : মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিকরণ

জব নং- ১৭ : রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করে মাছ সংরক্ষণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি। আমাদের দেশে মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত পদ্ধতি। তবে সব ধরনের মাছ এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায় না। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সূর্যালোকে বাতাসের মাধ্যমে মাছ থেকে পানি ও জলীয় অংশ হ্রাস করণকে শুঁটকিকরণ বলে। আমাদের দেশে শীত মৌসুমে সূর্যালোকে শুকিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়।

উপকরণ

১. ছোট অথবা কম চর্বিযুক্ত যেকোনো প্রজাতির বড় মাছ;
২. ধারালো ছুরি কিংবা দা;
৩. ছোট মাছের ক্ষেত্রে বাঁশের চাটাই কিংবা মাদুর;
৪. বড় মাছের ক্ষেত্রে রশি;
৫. সংরক্ষণের জন্য পলিথিন ব্যাগ।

কাজের ধারা

ছোট মাছ শুঁটকিকরণ

- প্রথমে ১ কেজি পরিমাণ তাজা বা টাটকা ছোট মাছ (চেলা, পুঁটি, মলা, চান্দা ইত্যাদি) সংগ্রহ করি;
- মাছগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে চাটাই কিংবা মাদুরের উপর বিছিয়ে রোদে শুকাতে দিই;
- পাখি কিংবা অন্যান্য প্রাণির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য মাছগুলোকে এক টুকরা জাল দিয়ে ঢেকে দেই;
- ৩-৫ দিন রোদে শুকানোর পর শুঁটকি মাছগুলোকে পলিথিন ব্যাগে ভালোভাবে মুখ বেঁধে সংরক্ষণ করি।

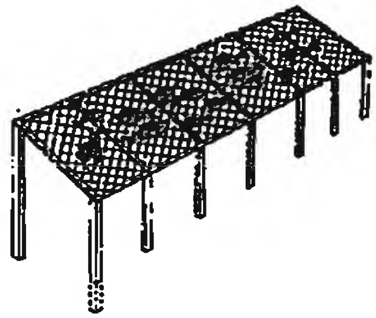

চিত্র-৪০ : বাঁশের মাচার উপর ছোট মাছ

বড় মাছ শুঁটকিকরণ

- বড় মাছ শুঁটকি করার জন্য ০.৫-১.০ কেজি ওজনের শোল, গজার অথবা টাকি জাতীয় ২/৩ টি মাছ সংগ্রহ করতে হবে।
- তারপর ধারালো ছুরি কিংবা দা-এর সাহায্যে আঁইশ, ফুলকা, পাখনা ও নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিতে হবে।
- মাছগুলোকে মাথা থেকে লেজের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর এমনভাবে কাটতে হবে যাতে লেজের অংশ সংযুক্ত থাকে।
- প্রয়োজনবোধে বড় ফালিগুলোকে মাঝ বরাবর ছুরি দিয়ে পুনরায় ফালি করতে হবে।
- এবার পরিষ্কার পানিতে মাছগুলোকে ধোয়ার পর রশির সাহায্যে রোদে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রেও পাখি কিংবা অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ রোধকল্পে মাছগুলোকে জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ৫-৭ দিন রোদে শুকানোর পর শুঁটকিগুলোকে পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।

জব নং- ১৮ : মৎস্য বাজার পরির্দশন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মৎস্যবাজার হলো এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে সরবরাহকৃত মাছ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। মৎস্যবাজার প্রধানত দুই প্রকার- পাইকারি ও খুচরা বাজার। দেশের শহরগুলোতে বা বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্র গুলোতে পাইকারি ও খুচরা বাজার পাশাপাশি থাকে। যাহোক মৎস্য বাজার পরিদর্শনের জন্য এমন একটি কেন্দ্র নির্বাচন করতে হবে যেখানে পাইকারি ও খুচরা বাজার পাশাপাশি রয়েছে।

পাইকারী বাজার পরিদর্শনকালে করণীয়

একটি পাইকারি বাজার পরিদর্শনকালে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

১. বাজারের অবস্থান;
২. বাজারের আয়তন;
৩. বাজারের প্রকৃতি-পাকা/কাঁচা, ছাউনি/ছাউনিবিহীন;
৪. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা;
৫. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;
৬. মাছ সংরক্ষণ ব্যবস্থা;
৭. আড়তদারদের নির্দিষ্ট বসার স্থান আছে কী না?
৮. পরিবহন/প্যাকিং সুবিধা;
৯. বিদ্যুৎ ব্যবস্থা;
১০. কাদের মাধ্যমে বিক্রয় হয়- আড়তদার/কমিশন এজেন্ট;
১১. বাজার পরিচালনার জন্য কোনো সমিতি আছে কী না?
১২. কোন কোন এলাকা বা উৎস থেকে মাছ সরবরাহ করা হয়?
১৩. কোন কোন প্রজাতির মাছ বেশি বিক্রয় করা হয়?
১৪. মাছ কীভাবে পরিবহন করা হয়?
১৫. পরিবহনকালে মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফ ব্যবহার করা হয় কী না?
১৬. কীভাবে মাছ বিক্রি হয়? নিলাম/নির্দিষ্ট দামে, ওজনে/সংখ্যায় ?
১৭. চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম আছে কী না?
১৮. বাজার পরিদর্শনকালে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ বিষয় পর্যবেক্ষণ করে থাকলে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খুচরা বাজার পরিদর্শনকালে করণীয়

খুচরা বাজার পরিদর্শনকালে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

১. বাজারের আয়তন; ২. বাজারের প্রকৃতি- পাকা/কাঁচা, ছাউনি/ ছাউনি বিহীন;
৩. বাজারে স্টলের/পাটাতনের সংখ্যা; ৪. স্টলে পাটাতনের উচ্চতা;
৫. এক সারির পাটাতন থেকে অন্য সারি পাটাতনের দূরত্ব;
৬. জিওল মাছ রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে কী না? ৭. স্টলে প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা আছে কী না?
৮. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা; ৯. বরফ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কী না?
১০. দৈনিক কী পরিমাণ মাছ বিক্রি হয়? ১১. ডাস্টবিন বা ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান আছে কী না?
১.২ মৎস্য আইনে নির্ধারিত আকারের চেয়ে ছোট মাছ বিক্রি হয় কী না?

মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সংগৃহীত তথ্যসমূহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

আলম, মুহম্মদ সাইফুল ২০০৮। বন, মৎস্য ও পশু পাখি বিষয়ক আইন, বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী ২৬, বাংলা বাজার, ঢাকা।

ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল ১৯৮৫। মাছের চাষ ও ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসলাম, ড. মোঃ আনোয়ারুল এবং ড. মোঃ সামছুল আলম ১৯৯৭। মাছের চাষ ও ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ওহাব, ড. মোঃ আব্দুল এবং মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৯৯৭। মাছের খাদ্য ও পুষ্টি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

চৌধুরী, ড. বজলুর রশিদ এবং মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৯৯৭। মাছের রোগ ও প্রতিকার। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

দাস, বিষ্ণু ১৯৯৭। মাৎস্য ও মাৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা (১ম - ৪র্থ খন্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নুরুজ্জামান, ড. এ. কে. এম. ১৯৯২। বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ। আল আফছার প্রেস, ২৬৪ মালিবাগ, ঢাকা।

নুরুজ্জামান, ড. এ. কে. এম. ১৯৯৪। মাছ ও মাছ চাষ। আল আফছার প্রেস, ২৬৪ মালিবাগ, ঢাকা।

পাল ও সুশান্ত কুমার ২০০৮। চিংড়ি পরিবেশ বান্ধব চাষ প্রযুক্তি। আর্থ-সামাজিক ও মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা। মনিকা প্রকাশিকা, গুরুদাসপুর, নাটোর।

বড়ুয়া, ড. পি. কে. ১৯৯৮। থাই পাংগাস মাছের চাষ ম্যানুয়েল। বিজনেস অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস সেন্টার (বাসক) ধানমণ্ডি, ঢাকা।

ভূঁইয়া, মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৯৯৭। মৎস্য খামার ও পুকুর তৈরির কলাকৌশল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মাছউদ, এ.আর. ১৯৯৯। মাৎস্য আইন। অনুপম জ্ঞান ভাণ্ডার। ঢাকা - ১০০০।

সিদ্দিকী, কামাল এবং সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ১৯৯৬। মৎস্য (পুকুরে মাছ চাষ ম্যানুয়েল)

সরকার, মোহাম্মদ তারেক ২০০৭। থাই কৈ চাষ ব্যবস্থাপনা। ফিশটেক (বিডি) লিঃ। ঢাকা - ১২৩০।

হোসেন, ড. খন্দকার মোশাররফ ২০০৪। প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ। ড. মোশাররফ ফাউন্ডেশন লিঃ।

হোসেন, ড. মোঃ এরশাদ এবং শাহ্ আলম সরকার ১৯৯৭। মাৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ। বাংলাদেশ উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

খাঁচায় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল, জুন ২০০৯। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

প্লাবন ভুমিতে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, জুন ২০০৪। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে মিঠা পানিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ চাষ ১৯৯৮। ব্যবহারিক নির্দেশিকা।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮। বাংলাদেশের মাছের ক্ষতরোগ। (সম্প্রসারণ পুস্তিকা নং- ৪)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯২। পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ। (সম্প্রসারণ পুস্তিকা নং- ৯)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩। মৌসুমী পুকুরে নাইলোটিকার চাষ প্রযুক্তি। (প্রচার পত্র নং- ১)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩। পুকুরে রাজপুঁটির চাষ প্রযুক্তি।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩। মাছের সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার। (সম্প্রসারণ প্রচার পত্র নং- ৬)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩। পুকুরে পাঙ্গাশ মাছচাষের কলাকৌশল। (সম্প্রসারণ প্রচার পত্র নং- ৯)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩। মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি। (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫। মাছচাষে উন্নত কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা। (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল)।

মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৭। উন্নত মানের মাছের পোনা উৎপাদন কৌশল। (সম্পসারণ পুস্তিকা)।

মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৪। মৎস্য সপ্তাহ স্মরণিকা, মৎস্য ভবন, পার্ক এভিনিউ, রমনা, ঢাকা

মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৫। মৎস্য সপ্তাহ স্মরণিকা, মৎস্য ভবন, পার্ক এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।

মনোসেক্স তেলাপিয়া ও পাঙ্গাশ চাষ প্রশিক্ষণ মডিউল, জুন ২০০৯। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষ

ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য